আফগানিস্তানে আমার দেখা আল্লাহর নিদর্শন

শাইখ ড. আবদুল্লাহ আয্যাম রহ.

THE SIGNS OF AR-RAHMAAN IN THE JIHAD OF AFGHANISTAN

আফগানিস্তানে আমার দেখা আল্লাহর নিদর্শন

শহীদ শায়খ ড. আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ.

আফগানিস্তানে আমার দেখা আল্লাহর নিদর্শন

آيات الرحمن في جهاد الافغان

মুফতী সাঈদ হুসাইন
অনূদিত

আবাবিল প্রকাশন
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

মুজাহিদীনের পরিচালনা পরিষদের প্রধান

উস্তাদ সাইয়াফের অভিব্যক্তি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম জাতিকে দুটি বিশেষ শ্রেণিতে বিভক্ত করেননি– একটি বণিক ও ধনী সম্প্রদায়, যার মধ্যে হযরত আবু বকর রা., হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা., হযরত সাদ ইবনে মুয়াজ রা. প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম অন্তর্ভুক্ত, যাঁরা সর্বাত্মকভাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহায্য করতেন, আর দ্বিতীয় দরিদ্র শ্রেণির সাহাবায়ে কেরাম, যেমন– হযরত বেলাল রা., হযরত আম্মার রা., হযরত সুহাইব রা. প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম, যাঁরা জীবন দান করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে যুদ্ধে অবস্থান করতেন। বস্তুত সকল প্রকারের সাহাবায়ে কেরামই যুদ্ধের ময়দানে অংশগ্রহণ করেছেন। এবং এ ক্ষেত্রে সকল সাহাবায়ে কেরামই ছিলেন এক ও অভিন্ন।

যারা জিহাদের ময়দানে আল্লাহ প্রদত্ত এসব অলৌকিকতায় সন্দেহ পোষণ করেন, আমি তাদের দোষারোপ করছি না; বরং তাদের বস্তুবাদী চিন্তাভাবনা জিহাদের সঠিক মর্ম উপলব্ধি করা থেকে বিরত রেখেছে।

যে ব্যক্তি নিরবচ্ছিন্নভাবে চেষ্টা করবে, উদ্যমী হবে তিনিই কেবল জিহাদের সঠিক মর্ম অনুধাবন করতে পারবেন। চাক্ষুষ দেখা আর শোনা কথা সমান হতে পারে না। যারা আল্লাহ প্রদত্ত অলৌকিকতাকে অস্বীকার করে, জিহাদের পুণ্য ভূমিতে তাদের আমন্ত্রণ, সেখানে তারা দেখতে পাবেন আল্লাহ তায়ালা কুদরতিভাবে যুদ্ধের দায়িত্ব পরিচালনা করছেন।

বর্তমানে অনেক মুসলিম লেখক, যারা লেখার উপজীব্য হিসেবে অধিক কল্পনা, ভিত্তিহীন গল্প, আর ভৌতিক রহস্যকে বেছে নিয়েছেন, আমি তাদেরকে আমন্ত্রণ জানাব, কল্পনার চেয়েও অতিবাস্তব, শক্তিশালী ও শিক্ষণীয় ইতিহাস রচনা করার, যা রক্তবিন্দু ত্যাগের দ্বারা সূচিত হয়।

আফগানিস্তানের বর্তমান বিষয়টি শুধু একটি সম্প্রদায়ের নিজস্ব বিষয় নয়; বরং এটি সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে ইসলামিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। আমি মুসলিমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, এই জিহাদের সূচনা আমরা করেছিলাম গুটিকয়েক রিভলবারের দ্বারা, আমাদের কাছে একটি রাইফেলও ছিল না। যুদ্ধের সূচনালগ্নে রাশিয়ান বাহিনীর বিশাল ট্যাংক বহরের মোকাবিলায় আফগান জাতি ব্যবহার করেছে নুড়ি পাথর ও ছোট ছোট শিলাখণ্ড। আজ আমাদের উপলব্ধি–

১. আফগান জাতি স্পষ্ট ও ঈমানি চেতনায় নিজেদের প্রস্তুত করেছে যে আল্লাহ তায়ালা রাশিয়ার (বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও যৌথবাহিনী) চেয়ে অধিক শক্তিশালী।

২. আল্লাহ তায়ালা কখনো পরাভূত বা পরাজিত হন না।

৩. শিগগিরই মহান আল্লাহ তায়ালার সাহায্যে আমরা রাশিয়াকে (যৌথবাহিনী) পরাজিত করতে সক্ষম হব।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের সৌন্দর্য উপভোগ করতে যারা সময় ব্যয় করছেন, তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেই হাদিস, যাতে তিনি বলেছেন, 'আমার উম্মতের ভ্রমন হলো জিহাদ'। একই সাথে তাদেরকেও সতর্ক করতে চাই, যারা এই হাদিসের অপব্যাখ্যা করে জিহাদ থেকে বিরত থাকে– 'যে ব্যক্তি জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারেনি অথবা অস্ত্র দিয়েও সাহায্য করতে পারেনি, কিংবা তার পক্ষ হতে কাউকে পাঠাতেও পারেনি, সে যেন যুদ্ধে গমনকারীর পরিবার-পরিজনের সঙ্গে উত্তম আচরণ করে এবং তাদের দেখাশোনা করে। নতুবা কিয়ামতের আগেই আল্লাহ তায়ালা তার ওপর বিপদ পতিত করবেন'। আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আরো

একটি হাদিস স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তিনি ইরশাদ করেন, 'আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় (জিহাদে) গমন করা নিজ বাসস্থানে ৭০ বছরের নফল ইবাদতের চেয়েও উত্তম।'

মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করি, তিনি যেন লেখকের চেষ্টাকে কবুল করেন এবং এটিকে তার নাজাতের কারণ বানিয়ে দেন। আমরা সেই আল্লাহ তায়ালারই প্রশংসা করি, যিনি ব্যতীত প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য আর কেউ নেই, এবং যিনি একমাত্র গুনাহ মার্জনাকারী, যার কাছে সকলকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

বিনীত

আব্দু রাব্বির রাসুল আস-সাইয়াফ

সূ চি প ত্র

অলৌকিক মুজিজা ও কারামত / ১৫
অলিগণের কারামত রসূল সা.-এরই মুজিজা / ১৭
নবীজি সা.-এর মুজিজাসমূহের কিছু নমুনা / ১৮
অন্যান্য অলৌকিকতা / ১৯
আরো কিছু উদাহরণ / ২৩
সুরাকা বিন মালিকের ঘটনা / ২৩
মুমিনদের সাহায্যের জন্য আসমান থেকে ফেরেশতা অবতরণ / ২৪
খেজুরগাছের গুঁড়ির কান্না / ২৬
হযরত জাবির রা.-এর পিতার ঋণ পরিশোধ / ২৬
নবীজি সা. -এর আহ্বানে একগুচ্ছ খেজুরের সাড়া দেওয়া / ২৭
হযরত আবু হুরাইয়া রা.-এর খেজুরের থলে / ২৮
কুয়ায় পতিত ব্যক্তিদের প্রতি নবীজি সা.-এর উক্তি / ২৯
আল্লাহ প্রদত্ত নূর / ৩০
রত আবু কাতাদা রা.-কে নবীজি সা.-এর একটি খেজুরের শাখা প্রদান / ৩১
তাহলিল ও তাকবিরের আওয়াজেও শত্রুর আসন চূর্ণবিচূর্ণ হয় / ৩২
আবু বকর রা.-এর কারামত / ৩২
হযরত আবু কিরসাফা রা. / ৩৩
হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর জানাজা ও একটি পাখি / ৩৩
হযরত ওমর রা. কর্তৃক জিনকে পরাজিত করা / ৩৪
নবীজির আগমন সম্পর্কে অবলা গরুর সুসংবাদ প্রদান / ৩৪
মৃত্যুর পরে কথা বলা / ৩৪
উহুদের শহীদরা / ৩৫
নবীদের নূরানী মৃতদেহ সুরক্ষিত থাকে / ৩৫
কবর থেকে মেশকের ঘ্রাণ / ৩৬
ভিমরুল দিয়ে হযরত আসিন রা.-এর মৃতদেহ সুরক্ষা / ৩৬
নবীজির গোলাম হযরত সাফিনাহ রা. / ৩৬
নবীজি সা. -এর আগমন সম্পর্কে একটি নেকড়ে বাঘের সংবাদ প্রদান / ৩৭
পানির অনুগত হওয়া / ৩৮
টাইগ্রিস নদী পার হওয়া / ৩৮
গায়েবি সাহায্য / ৩৯

আবু উবাইদা রা.-এর সৈন্যবাহিনী / ৩৯
হাতের স্পর্শে সুস্থ হওয়া / ৪১
হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর অলৌকিকতা / ৪২
তাপ ও ঠাণ্ডা থেকে নিরাপদ / ৪২
বৃদ্ধ বয়সেও তারুণ্যের প্রভাব / ৪৩
হযরত হুসাইন রা.-এর অলৌকিকতা / ৪৩
হযরত উসমান রা.-এর অলৌকিকতা / ৪৩
অলৌকিকতা হলো বরকতের কারণ / ৪৪
আফগান জিহাদের অলৌকিকতা / ৪৪
অধিকাংশ শহীদের শরীর বিকৃত না হওয়া / ৪৫
আফগানিস্তানের শহীদরা / ৪৫
বাবার সঙ্গে শহীদি সন্তানের হাত মেলানো / ৪৬
শহীদ ওমর ইয়াকুব ও তাঁর অস্ত্র / ৪৭
আলখাল্লা জড়ানো সাইয়েদ শাহ / ৪৭
মুজাহিদীনের দোয়া / ৪৮
পাখির বেষ্টনী / ৪৮
চারদিক থেকে আগুনের পরিবেষ্টন / ৪৯
ফেরেশতাদের গায়েবি অশ্ববাহিনী / ৪৯
অস্ত্র ভাণ্ডারের শেষ / ৫২
শরীরের ওপর দিয়ে ট্যাংক অতিক্রম করার পরও জীবিত থাকা / ৫২
কাঁকড়া-বিছার দ্বারা মুজাহিদদের সুরক্ষা / ৫২
একটি শিশু ও দিয়াশলাই / ৫২
সাপ-বিচ্ছু মুজাহিদদের আক্রমণ করে না / ৫৩
হাতের মেহেদি মোছার আগেই শহীদি নারী / ৫৩
বোমা অবিস্ফোরিত রয়ে গেছে / ৫৩
এক গর্বিত মায়ের শহীদি সন্তান / ৫৪
বুলেটও তাদের শরীরকে ছিদ্র করেনি / ৫৪
শহীদের শরীর থেকে আলোর বিচ্ছুরণ / ৫৫
আগুন থেকে অস্ত্রাগার নিরাপদ / ৫৬
ছোট একটি দল বৃহৎ দলের ওপর জয়লাভ করা / ৫৬
উত্তর কাবুলে যুদ্ধ / ৫৬
তন্দ্রাচ্ছন্নতা ও একগুচ্ছ ফুল / ৫৭
আরসালানের ওপর তন্দ্রার প্রভাব / ৫৮
আখতার মুহাম্মদের শরীরের ওপর দিয়ে ট্যাংক চালানোর পরও
তাঁর মৃত্যু হলো না / ৫৯

চোখে বুলেট বিদ্ধ হয়েছে কিন্তু কোনোরূপ ক্ষতি হয়নি / ৬০
চৌদ্দটি বোমা নিক্ষেপের পরও মুজাহিদ অক্ষত ছিলেন / ৬০
বুলেট তাদের শরীরকে বিদ্ধ করেনি / ৬০
তাঁবুতে আগুন কিন্তু অবস্থানকারী নিরাপদ / ৬০
আমার জামা পুড়েছিল / ৬০
মাইনের ওপর দিয়ে গাড়ি পার হওয়া / ৬১
শহীদদের কারামত / ৬১
ঘ্রাণ দ্বারা শহীদকে সনাক্ত করা / ৬২
দুই মাইলের অধিক দূরত্ব থেকে শহীদের ঘ্রাণ অনুভূত হওয়া / ৬২
এক শহীদের মায়ের হাতে আতরের ঘ্রাণ তিন মাস পর্যন্ত ছিল / ৬২
শহীদের অস্ত্র দিতে বাধা দেওয়া / ৬৩
শহীদের মুখে হাসি / ৬৩
শহীদ হামিদুল্লাহর হাসি / ৬৪
শহীদের শরীর বিকৃত হয় না / ৬৪
শহীদি মাতার স্তন্যপায়ী শহীদ সন্তান / ৬৫
মুজাহিদদের দোয়া ও আল্লাহ তায়ালার সাহায্য / ৬৫
পাথর থেকে পানির ঝর্ণা / ৬৫
অনুর্বর ভূমি থেকে পানির নির্গমন / ৬৭
কুয়াশার কাণ্ড / ৬৭
শহীদদের পরিবারের সুরক্ষা / ৬৮
মেঘের দ্বারা মুজাহিদদের সুরক্ষা / ৬৮
শত্রুবাহিনীর ট্যাংক ধ্বংস করা / ৬৮
শরীয়তের দৃষ্টিতে জিহাদের হুকুম / ৬৯
কয়েক লাইনে আফগান জিহাদের বাস্তবতা / ৭১
আমার এ বইটি রচনাকালে আফগান যুদ্ধের কিছু নমুনা / ৭৩
লেখক কর্তৃক সাধারণ মুসলমানদের প্রতি সদয় নিবেদন / ৭৪
আফগান জাতির কিছু ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য / ৭৯
তৃষ্ণার্ত মায়ের কান্নার রোল / ৮২
বইতে উল্লিখিত কারামতের গ্রহণযোগ্যতা / ৮৩
উলামায়ে কেরামের মতামত / ৮৩
বইটি পাঠের পর প্রথম অভিব্যক্তি / ৮৪
একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় / ৮৬
অতিগুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের আলোচনা / ৮৬
উপসংহার / ৮৮
যৌথবাহিনী কর্তৃক মুসলিম নারীদের ওপর পাশবিক নির্যাতন / ৮৯

ইরাকে যৌথবাহিনীর পৈশাচিকতা / ৯২
জিহাদের বিরুদ্ধে তথ্যসন্ত্রাস / ৯৩
বিংশ শতাব্দির মুজিজা / ৯৩
শহীদের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মর্যাদাবলি / ৯৪
বিষাক্ত এক কালনাগিনী ব্রিটেন / ৯৫
সবার দৃষ্টি এখন আফগানিস্তানের প্রতি / ৯৭
আফগানিস্তান নিয়ে বিষাক্ত কালনাগিনীর ষড়যন্ত্র / ৯৮
আশ্চর্য এক কারামত এক মুঠি ধূলি নিক্ষেপে কয়েকশত ট্যাংক ধ্বংশ / ৯৯
খোরাসানের জিহাদে আল্লাহর নিদর্শন / ১০১
মুজাহিদদের সাহায্যে মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া / ১০৪
একজন আফগানি আলেমে দীনের ঈমান জাগানো বিবরণ :
গ্রেপ্তার হওয়া থেকে গুপ্ত কারাগার পর্যন্ত / ১০৪
মার্কিনদের বন্দিশালায় বিশাল সুসংবাদ / ১০৭
এক আহত সঙ্গীর ওপর আল্লাহর রহমত / ১০৮
আফগানদের সঙ্গে আমার পরিচয় / ১০৯
রাশিয়া পরাজিত / ১১০
এক রাশিয়ান সৈন্যের স্বীকারোক্তি : আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে
রাশিয়ান সৈন্যের কাপড় নষ্ট / ১১৩
ফরাসি সাংবাদিকের চোখে যুদ্ধের ময়দানে অদৃশ্য ট্যাংক / ১১৩
আফগান জনগণের ট্র্যাজেডি / ১১৪
উত্তর আফগানিস্তানে আমার দেখা আল্লাহর কিছু সাহায্য / ১১৪
গুণ আফগানদের চিরসঙ্গী / ১১৬
আফগান যুবকদের থেকে আমি যা শিখেছি / ১১৬
আফগানিস্তান থেকে ফিলিস্তিন / ১১৮
কামনা আমার শাহাদাত / ১১৮
এক মুজাহিদ ভাইয়ের কারামত / ১১৯
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা কী চায় / ১২১
ইসরায়েল ধ্বংসের জন্য দুই হাজার মুজাহিদ যথেষ্ট / ১২২
আফগান জিহাদে আল্লাহর সাহায্যের নমুনা / ১২৩
এ যুদ্ধ কেবল আকিদা ও দীনকেন্দ্রিক যুদ্ধ / ১২৪
আল্লাহর সাহায্যে আফগানিস্তানের কমিউনিস্টদের পরিণাম / ১২৪
মসজিদুল আকসা পুনরুদ্ধারই মূল উদ্দেশ্য / ১২৫
জিহাদের প্রভাব / ১২৫
জিহাদভীতি / ১২৬
হেরেমে অবস্থানের চেয়ে জিহাদের পথে থাকা উত্তম / ১২৮

জিহাদের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানো / ১২৮
আফগানদের প্রতিরোধযুদ্ধসমূহ / ১৩০
আফগান মহিলাদের জরায়ু কর্তন / ১৩০
আন্তর্জাতিক মিডিয়ার খবরদারি / ১৩১
ইবাদত হয়ে গেল রাজনৈতিক অপরাধ / ১৩২
অবাক করা সাহায্য : রাখে আল্লাহ মারে কে / ১৩২
মিন্দরিসে আল্লাহর আশ্চর্যময় সাহায্য / ১৩৩
আফগান নেতৃবৃন্দের প্রতি আল্লাহর সাহায্য / ১৩৪
আফগানবাসীর অগ্নিপরীক্ষা / ১৩৮
রুশ সেনাদের নির্মমতায় আল্লাহর সাহায্যের বাস্তব নমুনা / ১৩৯
মরা লাশও কান্না করে / ১৫৭
এক সেনাপতি বোকা বনে যাওয়ার ঘটনা / ১৫৮

মার্কিন অত্যাচারের রক্তাক্ত দাস্তান

এক আইরিশ সাংবাদিকের হৃদয় কাঁপানো তথ্য / ১৬০
The Martyrs in Reality / ১৬৮
The Fine Examples / ১৭২
From the speeches of Dr. Abdullah Azzam (Rah.) / ১৭৭
শহীদ ড. আবদুল্লাহ আয্যাম রহ.-এর রক্তাক্ষরে লিখিত
ঐতিহাসিক অসিয়তনামা / ১৭৮
এক নজরে শহীদ শায়খ ড. আবদুল্লাহ আযযাম রহ. / ১৮৯

অলৌকিক মুজিজা ও কারামত

১. মুজিজা ও কারামত উভয়ই অলৌকিক বিষয়।

২. অলৌকিকতা সাধারণত নবীদের দ্বারা সংঘটিত হয়। কখনো কখনো আউলিয়ায়ে কেরাম ও নেককার ব্যক্তিদের দ্বারাও প্রকাশ পায়। আবার কখনো কখনো অনুরূপ বিষয় পাপি, মুশরিক ও কাফেরদের থেকেও প্রকাশ পায়।

৩. নবী আ.গণের মাধ্যমে যে অলৌকিক বিষয় প্রকাশিত হয় তাকে মুজিজা বলে, আর আউলিয়া কেরামের দ্বারা যা প্রকাশিত হয় তাকে কারামত বলে। এভাবে যদি কোনো কাফের বা পাপি ব্যক্তির দ্বারা অলৌকিকতা প্রকশ পায় তবে সেটি হবে শয়তানের কাজ।

কিছু মুজিজার মতো অলৌকিকতা যেমন আকস্মিক খাবারের উপস্থিতি, এটি আউলিয়া কেরামের দ্বারাও হতে পারে। কিন্তু পার্থক্য হলো, আউলিয়াগণ নবুওয়াতের দাবি করেন না, তারা নবীগণের অনুসারী হওয়ার দাবি করেন। তবে নবীদের দ্বারা এমন কিছু সংঘটিত হয়, যা ওলিদের দ্বারা সম্ভব নয়। যেমন কুরআন হলো নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অন্যতম মুজিজা। এটি আল্লাহ তায়ালার অন্য কোনো সৃষ্টির দ্বারা প্রকাশিত হবে না।

ইমাম নববী রহ. উল্লেখ করেন, 'আমরা জানি মুতাজিলা নামক সম্প্রদায় কারামতকে অস্বীকার করে। যদিও এটি কখনো আউলিয়া কেরামের নিজস্ব ক্ষমতা ও ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সংঘটিত হয় না।'

উলামায়ে কেরাম ব্যাখ্যা করেন। 'মুজিজা ও কারামত কোনোটিই এমন বিষয় নয় যে নবী বা অলি ইচ্ছা করলেই তা প্রকাশিত হবে। এই অলৌকিকতা তখনই হবে, যখন আল্লাহ তায়ালা তার একক সত্তাকে প্রমাণস্বরূপ প্রকাশের ইচ্ছা করবেন। এখানে মানুষের ইচ্ছাশক্তির কোনো মূল্য নেই।'

৪. কারামত প্রকাশের দ্বারা ব্যক্তি কখনোই অন্যদের তুলনায় উৎকৃষ্ট, তা বোঝা

যায় না। কখনো কখনো কারামত মানুষের মর্যাদাকে অধঃপতিত করে। কারণ এর দ্বারা তার মধ্যে খ্যাতি ও দাম্ভিকতা প্রবেশ করতে পারে। সে কারণে আউলিয়া কেরামের দ্বারা যদি কখনো কারামত প্রকাশিত হতো, তৎক্ষণাৎ তাঁরা আল্লাহর কাছে ইসতিগফার করতেন, যেভাবে ইসতিগফার করা হয় গুনাহের কারণে। *[মাজমুউল ফাতাওয়া]*

৫. আল্লাহ তায়ালা কারামত প্রদান করেন আউলিয়া কেরামের কঠিন পরিস্থিতি থেকে মুক্তি আর শত্রুদের কাছে আল্লাহর দীনের কার্যকারিতা প্রকাশ করতে।

৬. আল্লাহর অলি তাঁরাই, যাঁরা স্বচ্ছ ঈমান ও তাকওয়ার অধিকারী, যদিও তাঁরা আল্লাহ প্রদত্ত কাশফ, আধ্যাত্মিক শক্তি অথবা কারামতের বাহক না হন।

৭. ইলম ও আমলই মানুষকে শয়তানের প্ররোচনা থেকে বিরত রেখে আল্লাহর বন্ধুতে পরিণত করে। কারামত তাদের জন্য, যারা কুরআন ও হাদিসের আনুগত্য করে, নতুবা যারা কুরআন ও হাদিসের পথ থেকে বিচ্যুত, তাদের জন্য এটি হবে শয়তানের কর্ম।

আবু ইয়াজিদ বোস্তামি রহ. বলেন, যদি তুমি কোনো মানুষকে দেখ আকাশে উড়ছে অথবা পানির ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, তবু তার কথা পালনযোগ্য নয়, যদি না শরিয়তের আদিষ্ট বিষয় পালন করে, আর নিষিদ্ধ কর্ম থেকে বিরত থাকে।

ইমাম শাফেয়ি রহ.-কে উদ্দেশ করে ইউনুস ইবনে আবদুল আলা রহ. বলেন, আমাদের বন্ধু লাইস ইবনে সাদ কী বলেছে, তুমি কি তা জান? সে বলেছে, যদি তুমি কোনো ব্যক্তিকে দেখ পানির উপরিভাগ দিয়ে নিজের ইচ্ছামতো হেঁটে চলে যাচ্ছে, তবু তাকে বিশ্বাস করো না।

ইমাম শাফেয়ি রহ. বললেন, লাইস এ বিষয় সম্পর্কে উত্তম জ্ঞান অর্জন করেছেন। তিনি বলেন, যদি তুমি কাউকে কোনো অবলম্বন ব্যতীত ইচ্ছামতো আকাশে উড়তে দেখ, তবু ওই ব্যক্তিকে বিশ্বাস করো না।

হযরত জুনাইদ বাগদাদি রহ. বলেন– আমাদের বিশেষ জ্ঞান কুরআন ও হাদিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআন অধ্যয়ন করে না, বা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন যাপন করে না, তাদের জন্য সমীচীন নয় আমাদের বিশেষ জ্ঞানের বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করে।

৮. সাহাবা রা.-এর যুগের তুলনায় পরবর্তী সময়ে বেশি কারামত প্রকাশিত হয়েছে। এর কারণ হলো, কারামতের উদ্দেশ্যই হলো মানুষের ঈমানকে মজবুত

করা, আর আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি করা। সাহাবায়ে কেরাম রা. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধিক সম্পর্কের কারণে তাঁদের ঈমান ছিল অতি মজবুত, ফলে কারামত প্রকাশের প্রয়োজন হয়নি। ইমাম আহমদ রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হয়, সাহাবীদের সময়ের তুলনায় পরবর্তী সময়ে কারামত কেন বেশি প্রকাশিত হয়েছে? উত্তরে তিনি বলেন, তাঁদের ঈমান ছিল মজবুত।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সান্নিধ্যে থাকার কারণে সাহাবায়ে কেরাম রা. দীনের সঠিক জ্ঞান ও মহান আল্লাহর সঙ্গে গভীর বন্ধন তৈরি করেছিলেন। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ঈমান দুর্বল হতে থাকে। ফলে আল্লাহ তায়ালা মানুষের ঈমানের শক্তিকে বৃদ্ধির জন্য কারামতের প্রকাশ ঘটান। এ বিষয়টি অতি স্পষ্ট যে আফগান জিহাদে এত বিপুলসংখ্যক কারামত প্রকাশিত হয়েছে, যা সাহাবাদের যুগের তুলনায় অধিক। এতে আশ্চর্যবোধ করার কোনো কারণ নেই।

৯. সাধারণত দেখা যায়, সাধারণ ব্যক্তিদের তুলনায় উলামায়ে কেরামের দ্বারাই কারামত বেশি প্রকাশ পায়। ইমাম নববী রহ.কে এ বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, সাধারণ আবেদগণের তুলনায় উলামায়ে কেরামের মধ্যে ইখলাস (আন্তরিকতা) বেশি পাওয়া যায়, যা কারামত প্রকাশিত হওয়ার মূল উপাদান।

১০. কারামত ও মুজিজার একমাত্র পার্থক্য হলো, মুজিজা নবুওতের দলিল বহন করে। মিথ্যা নবুওতের দাবিদার কোনো ব্যক্তির দ্বারা মুজিজা প্রকাশিত হওয়া সম্ভব নয়। কখনো কখনো অলৌকিকতাকে মানুষ জাদুও মনে করে। কিন্তু কারামত ও জাদুর মধ্যে পার্থক্য হলো– আউলিয়ায়ে কেরাম কারামত প্রকাশ করে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পূর্ণ অনুসরণ ও আনুগত্যের দ্বারা, জাদুকরের মধ্যে এ গুণাবলি কখনোই পাওয়া যায় না।

অলিগণের কারামত রসূল সা.-এরই মুজিজা

প্রকৃত আউলিয়া কেরাম তাঁরাই, যাঁরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সকল আদর্শ অনুসরণ করেন, নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকেন ও শরিয়তের সব বিধান অনুযায়ী জীবন যাপনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখেন। এঁরা এমনই বান্দা, যাঁদের আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের দ্বারা সাহায্য করেন এবং আল্লাহ তায়ালার বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা তাঁদের ধন্য করেন। তাঁদের সম্মান বৃদ্ধির জন্যই

আল্লাহ তায়ালা তাঁদের দ্বারা কারামত প্রকাশ করেন। তাঁদের কারামত হয় দীনের প্রয়োজনে নতুবা মুসলিমদের ঈমানি চেতনাকে বৃদ্ধি করতে, যেমনভাবে আম্বিয়া আ.-এর মুজিজাসমূহ সংঘটিত হয়েছিল ওই উদ্দেশ্যকে সফল করতে। অলিগণের কারামত অর্জিত হয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণের বরকতে। সুতরাং অলিগণের কারামত প্রকৃতপক্ষে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুজিজারই অন্তর্গত।

নবীজি সা.-এর মুজিজাসমূহের কিছু নমুনা

১. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতের ইশারায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া। *[বুখারী ও মুসলিম।]*

২. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতের মধ্যে থেকে ছোট নুড়ি পাথরের তাসবিহ পাঠ করা। *[তিবরানি, বাজ্জার]*

৩. গাছের গুঁড়ির কন্না, যার বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

৪. মেরাজের রাতে বাইতুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে সবাইকে বর্ণনা করা। হাদিস শরিফে এসেছে–

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَمَّا كَذَّبَتْنِي قُرَيْشٌ قُمْتُ فِي الْحِجْرِ فَجَلَّى اللّٰهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ

হযরত জাবের রা. হতে বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যখন কুরাইশগণ (কাফেররা) মেরাজকে অস্বীকার করল, মহান আল্লাহ তায়ালা তখন বাইতুল মুকাদ্দাসকে আমার সম্মুখে তুলে ধরলেন। আমি দেখে দেখে মানুষকে তা বর্ণনা করতে লাগলাম।' *[বুখারী ও মুসলিম।]*

৫. বহু পূর্বে ঘটে যাওয়া ঘটনা কিংবা অনাগত ভবিষ্যতের বিভিন্ন বর্ণনা, যা আল্লাহর মাধ্যমে অবগত হয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ করেছেন।

৬. মহান আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত কিতাব বহন করা।

৭. বিভিন্ন সময় অলৌকিকভাবে খাবার ও পানির মধ্যে বরকত হওয়া। খন্দকের

যুদ্ধের সময় সামান্য খাবারই সব যোদ্ধার জন্য যথেষ্ট হয়েছিল, যে খাবার কিছুই হ্রাস পায়নি। অনুরূপভাবে, খায়বারের যুদ্ধে এক মশক পানি সব সৈন্যের পিপাসা মিটিয়েছিল।

৮. শুষ্ক স্থানে বা বিরান কূপে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আঙুলের স্পর্শে পানির স্রোত প্রবাহিত হওয়ার অসংখ্য ঘটনা আছে, যা উপস্থিত সবার জন্য যথেষ্ট হয়েছিল। বিশেষত হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় এমনই এক শুকনো কূপ হতে তাঁর হাতের স্পর্শে পানি প্রবাহিত হয়েছিল, যা উপস্থিত সবার তৃষ্ণা মিটিয়েছিল। এ সময় সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতি ছিল ১৪ অথবা ১৫শ'র অধিক। *[বুখারী ও মুসলিম।]*

৯. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতের দ্বারা হযরত আবু কাতাবা রা.-এর চক্ষুগোলক থেকে বের হয়ে আসা চক্ষুকে আবার ভেতরে ঢুকিয়ে দেন। ফলে আগের তুলনায় তাঁর চোখের জ্যোতি অধিক বৃদ্ধি পায়। *[তিবরানি।]*

১০. একবার কাব বিন আশরাফ নামক এক ইহুদিকে হত্যা করার জন্য নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামাহ রা.কে প্রেরণ করেন। এ সময় আহত হয়ে তাঁর পা ভেঙে যায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দেন, তাঁর পা আগের মতো সুস্থ হয়ে যায়। *[বুখারী]*

১১. একবার সামান্যতম খাবার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় ১৩০ জন সাহাবার মধ্যে বণ্টন করলেন, কিন্তু খাবারের পরিমাণ আগের মতোই থেকে যায়। *[বুখারী ও মুসলিম।]*

১২. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অলৌকিকভাবে হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর রা.-এর সব ঋণ পরিশোধ করিয়ে দেন। তৎকালীন সময়ে ঋণের পরিমাণ ছিল ৩০ ওসক (প্রায় ২৭০ কেজি খেজুর), যার বিস্তারিত বর্ণনা সামনে আসবে।

অন্যান্য অলৌকিকতা

সাহাবায়ে কেরাম, তাবেইন এবং পরবর্তী সময়ে সংঘটিত অলৌকিকতার পরিমাণ এত অধিক যে, তার পরিপূর্ণ বর্ণনা উপস্থাপন যেমন কষ্টসাধ্য, তদ্রূপ তার সংখ্যা গণনা করাও দুঃসাধ্য। সেগুলো হতে নিচে কিছু উল্লেখ করা হলো–

১. একবার হযরত উসাইদ বিন হুদাইর রা. সুরা কাহাফ তেলাওয়াত করছিলেন। এসময় তিনি তাঁর মাথার ওপর মেঘ সদৃশ কিছু হালকা আলোর

আভা অনুভব করলেন। তাঁর কুরআন তেলাওয়াত চলা পর্যন্ত এটি ছিল, পরে অদৃশ্য হয়ে যায়। এরা হলো আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রেরিত ফেরেশতা। *[বুখারী ও মুসলিম।]*

২. একবার হযরত সালমান ও আবু দারদা রা. এক সঙ্গে খাবার খাচ্ছিলেন। তখন প্লেট ও খাবার উভয়ই তাসবিহ পাঠ করছিল।

৩. একবার হযরত আবু বকর রা. তিনজন অতিথিকে নিয়ে খানা খাচ্ছিলেন। তিনি ও তাঁর স্ত্রী দেখলেন, যতবারই পাত্র থেকে খাবার উঠাচ্ছিলেন ততবারই পাত্রের নিচে পূর্বের তুলনায় অধিক পরিমাণ খাবার মজুদ পাচ্ছেন। তিনি উপস্থিত সবার অনুমতি নিয়ে খাবার পাত্রটি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে নিয়ে গেলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিরাটসংখ্যক উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামকে খানা খাওয়ালেন। *[বুখারি ও মুসলিম।]*

৪. হযরত খুবাইব বিন আদি রা. যখন মক্কা মুকাররমায় কাফেরদের কাছে বন্দি ছিলেন, তখন অলৌকিকভাবে তাঁর কাছে আঙ্গুর ফলের উপস্থিতি পেলেন, অথচ মক্কা মুকাররমায় সেই সময় আঙ্গুরের মৌসুম নয়। *[বুখারী, আবু হুরায়রা সূত্রে বর্ণিত।]*

৫. হযরত আমের বিন ফুহাইরা রা. শহীদ হওয়ার পর অলৌকিকভাবে তাঁর শরীর আকাশে উঠে যায়, কাফেররা কোথাও তাঁর শরীরের চিহ্ন খুঁজে পায়নি। ঊর্ধ্বগমনের দৃশ্যটি হযরত আমির বিন তুফাইল রা. প্রত্যক্ষ করেন।

৬. হযরত উম্মে আয়মান রা. হিযরতের উদ্দেশ্য সফর করছিলেন। এ সময় তাঁর কাছে না ছিল কোনো সম্বল, না ছিল পানি। তিনি রোজাদার ছিলেন। ইফতারের সময় নিকটবর্তী হলে তিনি শূন্যের ওপর একটি অপরিচিত আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি মাথা ওপরে তুলে দেখলেন, এক কলস পানি শূন্যে ভাসমান। তিনি তৃপ্তির সহিত পানি পান করলেন। জীবনের পরবর্তী সময়গুলোতে তিনি কখনো পিপাসা অনুভব করেননি।

৭. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আজাদ করা গোলাম হযরত সাফিনা রা. একবার একটি সিংহকে উদ্দেশ করে বলেন, তিনি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতিনিধি। সিংহটি সুরক্ষার স্বার্থে তাঁকে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। *[হাকিম।]*

৮. যখনই হযরত বারা ইবনে মালেক রা. আল্লাহ তায়ালার কাছে অনুনয়-বিনয়সহ দোয়া করতেন, তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তায়ালা তাঁর দোয়া কবুল করতেন। মুসলমানরা যুদ্ধের ময়দানে যখনই কঠিনতম অবস্থায় উপনীত হতো, হযরত

বারা রা.কে অনুরোধ করতেন দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য পাওয়ার জন্য। এতে শত্রুর মোকাবিলায় মুসলমানরা জয়লাভ করত। কাদিসিয়ার যুদ্ধের সময় তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সহিত আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, যাতে তিনি শাহাদাতবরণ করতে পারেন। সেই যুদ্ধেই তিনি শহীদ হন।

৯. একবার হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা. শত্রুদের একটি দুর্গ ঘিরে ফেলেন। বন্দিরা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাল, যদি না তিনি বিষ পান করেন। হযরত খালেদ রা. বিষ পান করেন কিন্তু আল্লাহর রহমতে তিনি নিরাপদ ছিলেন।

১০. হযরত সাদ ইবনে আবি ওক্কাস রা. মুসতাজাবুদ দাওয়াহ (যার দোয়া সাথে সাথে কবুল করা হয়) ছিলেন। তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি পারস্য ও ইরাকযুদ্ধে জয়লাভ করেন।

১১. হযরত ওমর রা. কোনো এক যুদ্ধে হযরত সারিয়া রা.-এর নেতৃত্বে একদল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। কোনো একপর্যায়ে হযরত ওমর রা. মদীনা মুনাওয়ারা মসজিদে জুমার খুতবা দিচ্ছিলেন। খুতবা চলাকালীন তিনি উচ্চ আওয়াজে বললেন– يَا سَارِيَةُ الْجَبَلَ يَا سَارِيَةُ الْجَبَلَ 'হে সারিয়া, পাহাড়ের দিকে দেখ! পাহাড়ের দিকে দেখ!' যখন সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ হতে ফিরে এল, হযরত সারিয়া রা. বললেন, আমিরুল মুমিনীন! যখন চতুর্দিক থেকে শত্রুরা আমাদের ওপর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, হঠাৎ আমরা শুনতে পেলাম কেউ একজন চিৎকার করে বলছে, হে সারিয়া, পাহাড়ের দিকে দেখ! এরপর আমরা পাহাড়ে আরোহণ করে শত্রুবাহিনীর সঙ্গে তীব্র লড়াই করে আল্লাহর রহমতে জয়লাভ করি। *[বায়হাকি।]*

১২. হযরত জুনাইরা রা.-কে ইসলাম গ্রহণের কারণে অমানবিক ও পাশবিক নির্যাতন করা হয়েছিল, তবু তিনি ধর্ম ত্যাগ করেননি। নির্যাতনের কারণে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছিলেন। মুশরিকরা বলতে লাগল, 'লাত ও উজ্জা (দুটি মূর্তির নাম) তার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিয়েছে।' উত্তরে তিনি আল্লাহর শপথ করে বললেন, কখনোই নয়। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তায়ালা তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন।

১৩. ওরওয়া বিনতে হিকাম একবার হযরত সাদ বিন জায়েদ রা.-এর বিরুদ্ধে গিয়া অভিযোগ পেশ করল যে, তিনি ওরওয়ার জমি জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছেন। এ কথা শুনে তিনি ওরওয়াকে অভিশাপ দিলেন। হে আল্লাহ, যদি সে (ওরওয়া) মিথ্যাবাদী হয় তবে তার দৃষ্টি অন্ধ করে দাও, আর তার জমিনেই তার মৃত্যুর কারণ ঘটাও। এতে সে অন্ধ হয়ে যায় এবং একাকী নিজের জমিনের

ওপর দিয়ে হাঁটার সময় একটি গর্তে পড়ে তার মৃত্যু হয়।

১৪. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহরাইনের গভর্নর হিসেবে হযরত আলা ইবনে হাজরামি রা.কে নিযুক্ত করেছিলেন। যখন তিনি দোয়া করতেন, তখন আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করে বলতেন, হে আল্লাহ, সবচেয়ে জ্ঞানী, মহান, দয়াময়, দাতা! এভাবে দোয়ার কারণে তাঁর দোয়া কবুল হতো। একবার বাহরাইনে পানির প্রচণ্ড অভাব হয়। তাঁর দোয়ার বরকতে আল্লাহ তায়ালা পানির অভাব পূর্ণ করেন।

একবার যখন মুসলিমরা ঘোড়াসহ খরস্রোতা নদী পার হতে পারছিলেন না, তখন তিনি দোয়া করেন। দোয়ার বরকতে সব মুসলিম ঘোড়াসহ নদী পার হলেন কিন্তু তাদের ঘোড়ার একটি পশমও সিক্ত হয়নি। তিনি সবসময় দোয়া করতেন, যাতে তাঁর মৃত্যুর পর কেউ তাঁর শরীর দেখতে না পায়। তাঁর মৃত্যুর পর যথারীতি তাঁকে কবরে দাফন করা হয় কিন্তু পরবর্তী সময়ে কবরে তাঁর লাশ পাওয়া যায়নি।

অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল হযরত আবু মুসলিম খাওলানি ও তাঁর সৈন্যবাহিনীর বেলায়। এসময় তারা টাইগ্রিস নদীর খরস্রোতা ও গভীর পানির পথ পাড়ি দিয়েছিলেন। নদীর ওপারে পৌঁছে সঙ্গীদের উদ্দেশ করে বললেন, তোমাদের কেউ কি পানির মধ্যে কোনো জিনিস হারিয়ে ফেলেছ? হারিয়ে থাকলে আমাকে অবগত করো, আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে তা পাওয়ার জন্য দোয়া করব। একজন বলল, আমার ঘোড়ার মুখের বনুনি পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি বললেন, আমাকে অনুসরণ করো! সে তাঁকে অনুসরণ করল এবং পানির মধ্যে সেই বস্তুটি পাওয়া গেল।

১৫. মিথ্যা নবুওয়তের দাবিদার আসওয়াদ আনাসি একদা হযরত আবু মুসলিম খাওলানিকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি বিশ্বাস করো যে আমি আল্লাহর রাসুল? উত্তরে তিনি বলেন, কখনোই না। পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি এই সাক্ষ্য দেবে যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল? উত্তরে তিনি বলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। তৎক্ষণাৎ আসওয়াদ তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করে। আল্লাহ তায়ালার কী অপার কুদরত, উপস্থিত সবাই দেখল, তিনি আগুনের মধ্যে শান্তির সঙ্গে নামাজে দাঁড়িয়ে আছেন।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইন্তিকালের পর যখন হযরত আবু মুসলিম খাওলানি রা. মদীনায় আগমন করেন, তখন তাঁকে হযরত ওমর রা. ও হযরত আবু বকর রা.-এর মধ্যস্থানে বসিয়ে ওমর রা. বলেন–

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُمِتْنِي حَتَّى أَرَى مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فُعِلَ بِهِ كَمَا فُعِلَ بِإِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللهِ.

'সব প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতের মধ্যে ওই ব্যক্তিকে জীবিত রেখেছেন, যিনি হযরত ইবরাহিম আ.-এর অনুরূপ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।'

আরো কিছু উদাহরণ

সুরাকা বিন মালিকের ঘটনা

এক দীর্ঘ হাদীসে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. হিজরত রজনীর বর্ণনা দেন। সেখানে সুরাকা বিন মালিকের ঘটনা উঠে আসে–

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: وَاتَّبَعَنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ فَقُلْتُ أُتِينَا يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: {لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا} فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْتَطَمَتْ بِهِ فَرَسُهُ إِلَى بَطْنِهَا، أُرَى فِي جَلَدٍ مِنَ الْأَرْضِ شَكَّ زُهَيْرٌ فَقَالَ إِنِّي أُرَاكُمَا قَدْ دَعَوْتُمَا عَلَيَّ فَادْعُوا لِي، فَاللهُ لَكُمَا أَنْ أَرُدَّ عَنْكُمَا الطَّلَبَ. فَدَعَا لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَجَا. متفق عليه

হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা. থেকে বর্ণিত, হিজরতের সময় সুরাকা আমাদের অনুসরণ করে। আমি বললাম, হে রাসুলুল্লাহ! সুরাকা আসছে। নবীজি বললেন, ভয় করো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। অতঃপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন, সুরাকার ঘোড়ার পা মাটির মধ্যে ডুবে গেল। সে চিৎকার করে বলতে লাগল, আমি দেখেছি তোমরা দুজন আমাকে অভিশাপ দিয়েছ। দয়া করে আমার জন্য দোয়া করো। আল্লাহর কসম, যারা তোমাদের অনুসন্ধান করছে, আমি তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাব। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়ার বরকতে সুরাকা বিপদ মুক্ত হলো। *[বুখারী, হাদীস নং ৩৬১৫, মুসলিম।]*

মুমিনদের সাহায্যের জন্য আসমান থেকে ফেরেশতা অবতরণ

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন–

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ هَذَا جِبْرِيلُ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاةُ الْحَرْبِ.

বদরের যুদ্ধের দিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ওই যে জিবরাইল, যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হয়ে যে ঘোড়ার পিঠের ওপর লাগাম টেনে আছে। *[বুখারী, হাদীস নং ৩৯৯৫।]*

অন্য এক হাদিসে হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. বর্ণনা করেন–

عَنْ سَعْدٍ قَالَ رَأَيْتُ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ شِمَالِهِ يَوْمَ أُحُدٍ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابُ بَيَاضٍ مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ يَعْنِي جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ عَلَيْهِمَا السَّلَام.

উহুদের যুদ্ধের দিন আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ডান ও বাম পাশে যুদ্ধের সাজে সজ্জিত অতীব সুন্দর দুজন যোদ্ধাকে দেখতে পেলাম। এরূপ সুন্দর ব্যক্তি আমি আগেও দেখিনি, পরেও দেখিনি। তাঁরা ছিলেন হযরত জিবরাইল ও মিকাইল আ.। *[বুখারী, মুসলিম, হাদীস নং ১১৬৮]*

অন্য এক হাদিসে এসেছে–

عَنْ عَبْدِ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَ الْعَبَّاسَ بِعَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم فِيْ حَاجَةٍ فَوَجَدَ مَعَهُ رَجُلاً فَرَجَعَ وَلَمْ يُكَلِّمْهُ. فَقَالَ: رَأَيْتَهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ذَاكَ جِبْرِيْلُ. أَمَا إِنَّهُ لَنْ يَمُوْتَ حَتَّى يَذْهَبَ بَصَرَهُ وَيُؤْتَى عِلْمًا. روى أحمد والطبراني

হযরত আব্বাস রা. একদা তাঁর সন্তান আবদুল্লাহ রা.কে কোনো এক প্রয়োজনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি (আবদুল্লাহ)

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে দেখলেন। এতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে কথা না বলেই ফিরে এলেন। আব্বাস রা. জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আব্বাস রা. বললেন, তিনিই জিবরাইল আ.। যে তাঁকে (জিবরাইলকে) একবার দেখে, মৃত্যু পর্যন্ত তার দৃষ্টিশক্তি লোপ পায় না এবং সে গভীর জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়।

এ কথা প্রসিদ্ধ যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে সব সাহাবার মধ্যে حبر الامة বা উম্মতের সবচেয়ে বড় জ্ঞানী বলা হয়। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর দৃষ্টিশক্তি সামান্য পরিমাণও লোপ পায়নি। ফলে তাঁর বাবার ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়।

হযরত সাহল রা. তাঁর পুত্র আবু উবামাহ রা.কে বললেন–

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ قَالَ، قَالَ لِي أَبِي: يَا بُنَيَّ! لَقَدْ رَأَيْتَنَا يَوْمَ بَدْرٍ وَإِنَّ أَحَدَنَا يُشِيرُ بِسَيْفِهِ إِلَى رَأْسِ الْمُشْرِكِ فَيَقَعُ رَأْسُهُ عَنْ جَسَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ. دلائل النبوة للبيهقي

হে আমার পুত্র! তুমি বদরের ময়দানে আমাদেরকে দেখেছ। আমাদের তরবারি মুশরিকদের জন্য নির্ধারিত ছিল। আমাদের তরবারি মুশরিকদের মাথার কাছে পৌঁছার আগেই তাদের মাথা দ্বিখণ্ডিত হয়ে জমিনের ওপর পতিত হতো। *[দালায়িলুন নাবুওয়াহ ৩:৪২]*

এক হাদীসে হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন–

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَكْتُبُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَامِ، وَلَحِقَ بِالْمُشْرِكِينَ، فَمَاتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الأَرْضَ لَا تَقْبَلُهُ. قَالَ أَنَسٌ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو طَلْحَةَ أَنَّهُ أَتَى الأَرْضَ الَّتِي مَاتَ فِيهَا، فَوَجَدَهُ مَنْبُوذًا. قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: مَا شَأْنُ هَذَا؟ فَقَالُوا: قَدْ دَفَنَّاهُ مِرَارًا، فَلَمْ تَقْبَلْهُ الأَرْضُ.

এক ব্যক্তি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অহি লেখক ছিল। অতঃপর সে মুরতাদ হয়ে (স্বধর্মত্যাগী,

নাউজুবিল্লাহ) মুশরিকদের দলভুক্ত হয়ে গেল।* সে মারা গেলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, পৃথিবী তার মৃতদেহ গ্রহণ করবে না। আনাস রা. বলেন, আমরা অনেকবার চেষ্টা করেছি তাকে কবরস্থ করার; কিন্তু জমিন তাকে গ্রহণ করেনি (কবরে রাখামাত্র তার শরীর উপরে উঠে যায়)। *[বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হাদীস নং ৫৮৯৮]*

খেজুরগাছের গুঁড়ির কান্না

عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ جِذْعٌ يَقُومُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا وُضِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ سَمِعْنَا لِلْجِذْعِ مِثْلَ أَصْوَاتِ الْعِشَارِ حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার নামাজের খুতবার সময় শুকনো খেজুরগাছের একটি গুঁড়ির সঙ্গে হেলান দিতেন। যখন মিম্বর তৈরি করা হয় এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমবারের মতো তাতে আরোহণ করেন, তখন গাছের গুঁড়িটি শিশুর মতো ক্রন্দন করতে থাকে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ওপর হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিলেন। এতে তার কান্না থেমে যায়। *[বুখারী, হাদীস নং ৯১৮]*

হযরত জাবির রা.-এর পিতার ঋণ পরিশোধ

عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَاهُ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ فَلَمَّا حَضَرَ جِزَازُ النَّخْلِ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ

---

* বিভিন্ন হাদীস হতে জানা যায়, সুরা বাকারা ও আলে ইমরানে রাসুল সা. তাকে غَفُوْرًا رَحِيْمًا লিখতে বলেন, কিন্তু সে লেখে عَلِيْمًا حَكِيْمًا। রাসুল সা. তাকে সতর্ক করে দেয়ার পরও সে তার স্থানে অনড় থাকে।

وَالِدِي قَدْ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ دَيْنًا كَثِيرًا وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ فَقَالَ اذْهَبْ فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْرٍ عَلَى نَاحِيَةٍ فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعَوْتُهُ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ كَأَنَّهُمْ أُغْرُوا بِي تِلْكَ السَّاعَةَ فَلَمَّا رَأَى مَا يَصْنَعُونَ أَطَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيْدَرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِي أَصْحَابَكَ فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّى اللَّهُ عَنْ وَالِدِي أَمَانَتَهُ وَأَنَا أَرْضَى أَنْ يُؤَدِّيَ اللَّهُ أَمَانَةَ وَالِدِي وَلَا أَرْجِعَ إِلَى أَخَوَاتِي بِتَمْرَةٍ فَسَلَّمَ اللَّهُ الْبَيَادِرَ كُلَّهَا وَحَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْبَيْدَرِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهَا لَمْ تَنْقُصْ تَمْرَةً وَاحِدَةً

হযরত জাবির রা. বর্ণনা করেন, আমার পিতা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন এবং বিরাট ঋণের বোঝা রেখে যান। এ ঋণ পরিশোধের মতো সামর্থ্য আমার ছিল না; আমার কাছে পিতার রেখে যাওয়া অল্প কিছু খেজুর ছিল। ঋণ পরিশোধের সময় হলে আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে গিয়ে আমার অবস্থা তুলে ধরি। তিনি আমাকে বললেন, খেজুরগুলো পৃথক পৃথক স্থানে স্তূপ করে রাখ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব থেকে বড় খেজুরের স্তূপের চারদিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করলেন, অতঃপর এক স্থানে বসে গেলেন। তিনি বললেন, পাওনাদারদের ডাক। এরপর একের পর এক পাওনাদার তাদের ঋণের পরিমাণ হিসাব করে বড় স্তূপ থেকে খেজুর নিচ্ছিল। আমি খুবই সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হচ্ছিলাম যে, আজ সব পাওনা পরিশোধ হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ তায়ালার অসীম কৃপা, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে স্তূপের কাছে বসেছিলেন, সেই স্তূপের একটি খেজুরও হ্রাস পায়নি। *[বুখারী, হাদীস নং ৪০৫৩]*

নবীজি সা.-এর আহবানে একগুচ্ছ খেজুরের সাড়া দেওয়া

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: بِمَ أَعْرِفُ أَنَّكَ نَبِيٌّ؟ قَالَ: إِنْ دَعَوْتُ هَذَا الْعِذْقَ مِنْ هَذِهِ النَّخْلَةِ

أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ ؟ فدعاه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ يَنْزِلُ مِنَ النَّخْلَةِ حَتَّى سَقَطَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ ارْجِعْ فَعَادَ فَأَسْلَمَ الأَعْرَابِيُّ.

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, একদা এক বেদুইন এসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, 'কীভাবে বুঝবো যে, আপনি নবী?' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– 'এই খেজুর গাছটির ঐ খেজুর-গুচ্ছকে যদি আমি এখানে ডেকে আনি তাহলে কি তুমি সাক্ষ দেবে যে আমি আল্লাহর রাসূল?' অতঃপর তিনি গাছে ঝুলন্ত খেজুরের একটি গুচ্ছকে কাছে ডাকলেন। তৎক্ষণাৎ খেজুরগুচ্ছ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতের মধ্যে চলে আসে। (কিছুক্ষণ হাতে ধারণের পর) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ফিরে যাও। খেজুরগুচ্ছ নিজ স্থানে ফিরে গেল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই মুজিজা দেখে ঐ বেদুইন ইসলাম গ্রহণ করল। *[তিরমিযি, হাদিস নং ৩৭০৮]*

হযরত আবু হুরাইয়া রা.-এর খেজুরের থলে

عن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِتَمَرَاتٍ، فَقُلت: يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ فَضَمَّهُنَّ، ثُمَّ دَعَا لِي فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ، فَقَالَ لِي: خُذْهُنَّ فَاجْعَلْهُنَّ فِي مِزْوَدِكَ هَذَا أَوْفِي هَذَا الْمِزْوَدِ كُلَّمَا أَرَدْتَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا فَأَدْخِلْ فِيهِ يَدَكَ فَخُذْهُ وَلاَ تَنْثُرْهُ نَثْرًا، فَقَدْ حَمَلْتُ مِنْ ذَلِكَ التَّمْرِ كَذَا، وَكَذَا مِنْ وَسْقٍ فِي سَبِيلِ اللهِ وَكُنَّا نَأْكُلُ مِنْهُ وَنُطْعِمُ، وَكَانَ لاَ يُفَارِقُ حِقْوِي حَتَّى كَانَ يَوْمُ قَتْلِ عُثْمَانَ فَإِنَّهُ انْقَطَعَ. وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَة :فَأَكَلْتُ مِنْهُ زَمَنَ النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَزَمَنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رضي الله عَنْهُمْ. فَلَمَّا قُتِلَ عُثمان انْتَهَبَ

مَا فِي يَدِيْ وَانْتَهَبَ مَا فِي المزود. أَلَا أُخْبِرُكُمْ كَمْ أَكَلْتُ مِنْهُ؟ أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْ وَسَقٍ.

আবু হুরাইয়া রা. বর্ণনা করেন, আমি সামান্য কিছু খেজুর নিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, দোয়া করুন আল্লাহ তায়ালা যেন এই খেজুরে বরকত দান করেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতের মুঠোয় খেজুর নিয়ে দোয়া করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, এই খেজুরগুলোকে তোমার গোপন থলের মধ্যে রেখে দাও। যখনই তোমার প্রয়োজন হবে এর থেকে খেজুর বের করবে, কিন্তু কখনোই গণনা করবে না। আবু হুরাইয়া রা. বলেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সেই দোয়ার সময় থেকে উসমান রা.-এর যুগ পর্যন্ত এই থলে থেকে আমি খেজুর খেয়েছি। যখন উসমান রা. শহীদ হলেন, তখন খেজুরের ব্যাগটি খালি হয়ে যায়। কত পরিমাণ খেজুর আমি ভক্ষণ করেছি তার সংখ্যা নির্দিষ্ট নয়। তবে সম্ভবত ২০০ ওসাক বা ৮০০ কেজির অধিক পরিমাণ হবে। *[তিরমিযি, হাদীস নং ২৯২৮]*

কুয়ায় পতিত ব্যক্তিদের প্রতি নবীজি সা.-এর উক্তি

বদরের যুদ্ধের পরে একটি বিরান কূপে কাফেরদের মৃতদেহ ফেলে দেওয়া হয়। কোনো এক-সময় সেই কূপের পাশ দিয়ে গমনের সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত বক্তিদের উদ্দেশে বলেন, হে অমুকে ছেলে অমুক, হে অমুকের ছেলে অমুক! তোমরা কি আল্লাহর কৃত ওয়াদা সত্য পাওনি? নবীজি জানান, তারা জানিয়েছে, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছেন তা বাস্তবায়িত হয়েছে। ওমর রা. জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আত্মা ব্যতীত মৃত শরীর কীভাবে আপনার সাথে কথা বলবে? উত্তরে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওমর! তুমি তাদের চেয়ে উত্তম শ্রবণকারী নও। তারাও তোমার মতো শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু উত্তর দিতে পারে না। উলামায়ে কেরাম উল্লেখ করেছেন, এটি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি মুজিজা। সাধারণ রীতি হলো, মৃত ব্যক্তিরাও শুনতে পায়, কিন্তু উত্তর দিতে পারে না। এখানে মৃত ব্যক্তি কর্তৃক উত্তর প্রদান ছিল

রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুজিজা। আল্লাহ্ তায়ালাই সবচেয়ে ভালো জানেন। *[বুখারী, মুসলিম ও মিরকাত শরহে মিশকাত]*

আল্লাহ প্রদত্ত নূর

হযরত আবু সাইদ খুদরি রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ بَيْنَمَا هُوَ لَيْلَةً يَقْرَأُ فِي مِرْبَدِهِ إِذْ جَالَتْ فَرَسُهُ فَقَرَأَ ثُمَّ جَالَتْ أُخْرَى فَقَرَأَ ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا قَالَ أُسَيْدٌ فَخَشِيتُ أَنْ تَطَأَ يَحْيَى فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فَوْقَ رَأْسِي فِيهَا أَمْثَالُ السُّرُجِ عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا قَالَ فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَيْنَمَا أَنَا الْبَارِحَةَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ أَقْرَأُ فِي مِرْبَدِي إِذْ جَالَتْ فَرَسِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأْ ابْنَ حُضَيْرٍ قَالَ فَقَرَأْتُ ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأْ ابْنَ حُضَيْرٍ قَالَ فَقَرَأْتُ ثُمَّ جَالَتْ أَيْضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأْ ابْنَ حُضَيْرٍ قَالَ فَانْصَرَفْتُ وَكَانَ يَحْيَى قَرِيبًا مِنْهَا خَشِيتُ أَنْ تَطَأَهُ فَرَأَيْتُ مِثْلَ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ السُّرُجِ عَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ كَانَتْ تَسْتَمِعُ لَكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ مَا تَسْتَتِرُ مِنْهُمْ.

একদা সন্ধ্যায় হযরত উসাইদ বিন হুদাইর রা. তাঁর পশুর খোঁয়াড়ের পাশে বসে কুরআন তেলাওয়াত করছিলেন। খোঁয়াড়ে রাখা ঘোড়াটি বিক্ষিপ্তভাবে এদিক-সেদিক আবর্তন করছিল। এ অবস্থা দেখেও তিনি তেলাওয়াত চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এরপর তিনি বলেন– হঠাৎ আমি চিন্তা করলাম, ঘোড়া দড়ি ছিঁড়ে বাইরে বেরিয়ে গেলে আমার সন্তান ইয়াহইয়া পদপিষ্ট হতে পারে। আমি তেলাওয়াত বন্ধ করে খোঁয়াড়ে ঢুকে দেখতে পেলাম, ঘোড়ার উপরিভাগে মেঘসদৃশ আলোকময় কিছু ওপরে উঠে যাচ্ছে, যা দেখে ঘোড়া ভীত

হয়েছে। আমি সকালে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টি অবগত করলাম। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা ছিল ফেরেশতা, তোমার কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণ করছিল। যদি তুমি তোমার পড়া চালিয়ে যেতে তাহলে আশপাশের মানুষও খালি চোখে সকালবেলায় তাদের দেখতে পেত। *[বুখারী ও মুসলিম, হাদীস নং ২১১৬]*

হযরত আনাস বিন মালিক রা. বর্ণনা করেন–

عَنْ أَنَسٌ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ يُضِيئَانِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ. (وفي رواية و هما عباد بن بشر وأسيد بن حضير رضي الله عنهما)

এক রাতে হযরত উসাইদ বিন হুদাইর রা. ও আব্বাদ বিন বিশার রা. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে উপস্থিত ছিলেন। যখন তাঁরা দরবার থেকে প্রস্থান করলেন, তখন চারদিক ছিল ভীষণ অন্ধকার। হঠাৎ ওপর থেকে আলোর বিচ্ছুরণ তাঁদের চারপাশ আলোকিত করে দিল। তাঁরা একে অন্যের থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার পরও বাড়ি পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত সেই আলো তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে ছিল। *[বুখারী, হাদীস নং ৪৬৫ ও ৩৬৩৯, মুসলিম]*

হযরত আবু কাতাদা রা.-কে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি খেজুরের শাখা প্রদান

একবার এশার নামাজের পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু কাতাদা রা.-কে একটি খেজুরের শাখা হাতে দিয়ে বললেন, তুমি এটি রাখ, শিঘ্রই তোমার সামনে ও পেছনের ১০ দূরত্ব পর্যন্ত এই শাখা থেকে আলো নির্গত হবে। [উক্ত হাদিসে ১০-এর দ্বারা হাত বা গজ বা অন্য কী উদ্দেশ্য, তা পাওয়া যায়নি]

তাহলিল ও তাকবিরের আওয়াজেও শত্রুর আসন চূর্ণবিচূর্ণ হয়

হযরত হিসাম বিন আস বলেন, যখন আমাদের রোম সম্রাটের কাছে কালেমার দাওয়াত দিয়ে পাঠানো হয়, আমরা বারবার সম্রাটকে বলি, আপনি পড়ুন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার', কিন্তু সে দাওয়াত গ্রহণ করে না। আমরা একদিকে তাহলিল (ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা) অপরদিকে তাকবির (আল্লাহু আকবার বলা) দিয়ে যাচ্ছিলাম। একপর্যায়ে তার সিংহাসন ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালাই উত্তম জানেন। *[বায়হাকি, ইবনে কাসির, হায়াতুস সাহাবা]*

হযরত হামজা বিন আমর আল আসলামি রা. বলেন– 'একদা আমরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে এক ময়দানে ছিলাম। গভীর অন্ধকারময় রাতে একপর্যায়ে আমরা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। হঠাৎ আমার তর্জনি আঙুলের সম্মুখ থেকে আলো বিচ্ছুরিত হতে লাগল, সেই আলোয় সবাই আমরা একত্র হলাম।' উল্লেখ্য, হযরত হামজা রা. প্রচুর রোজা রাখতেন। *[বুখারী, আল বিদায়া ওয়ান-নিহায়া]*

আবু বকর রা.-এর কারামত

قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ لِعَائِشَةَ فِيْ مَرَضِ مَوْتِهِ: إِنَّمَا هُمَا أَخَوَانِ وَأُخْتَانِ فَتَعَجَّبَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا. لِأَنَّ لَهَا أَخَوَانَ وَأُخْتٌ وَاحِدَةٌ؟ فَأَشَارَ أَبُوْ بَكْرٍ إِلَى حَمَلِ زَوْجَتِهِ بِنْتُ خَارِجَةَ. فَقَالَ: أُرَاهَا تَحْمِلُ بِنْتًا. فَكَانَتْ كَذَلِكَ.

হযরত আবু বকর রা. মৃত্যু শয্যায় তাঁর মেয়ে হযরত আয়েশা রা.কে তাঁর অপর দুই ভাই ও দুই বোনের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। এতে আয়েশা রা. বিস্মিত হলেন। কেননা তাঁর দুই ভাই ও এক বোন রয়েছে (মুহাম্মাদ বিন আবু বকর, আব্দুর রহমান বিন আবু বকর ও আসমা বিনতে আবু বকর রা.)। আবু বকর রা. তাঁর স্ত্রী 'বিনতে খারিজা'-এর গর্ভের দিকে ইশারা করে বললেন, আমি দেখতে পাচ্ছি, সে কন্যা সন্তান বহন করছে। অতঃপর যখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হল, তদ্রূপই পাওয়া গেল। *[মুয়াত্তায়ে মালেক]*

হযরত আবু কিরসাফা রা.

عَنْ عَزَّةُ بِنْتُ عِيَاضِ بن أَبِي قِرْصَافَةَ قَالَتْ: أَسَرَ الرُّومُ ابْنًا لأَبِي قِرْصَافَةَ. فَكَانَ أَبُو قِرْصَافَةَ إِذَا كَانَ وَقْتُ كُلِّ صَلاةٍ صَعِدَ سُوَرَ عَسْقَلانَ. وَنَادَى: يَا فُلانُ الصَّلاةَ. فَسَمِعَهُ وَهُوَ فِي بَلَدِ الرُّومِ. رواه الطبراني. ورجاله ثقات.

হযরত আবু কিরসাফা রা.-এর এক ছেলেকে রোমানরা বন্দি করলো। যখন নামাজের সময় হতো তখন আবু কিরসাফা রা. আসকালান শহরের উঁচু দেয়ালের ওপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিতেন, 'হে অমুক, নামাজের সময় হয়েছে।' সুদূর রোমে বসে তাঁর সন্তান বাবার এ ঘোষণা শুনতে পেতেন। *[তিবরানী]*

হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর জানাজা ও একটি পাখি

عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ، قَالَ: مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ. فَشَهِدْتُ جَنَازَتَهُ. فَجَاءَ طَيْرٌ أَبْيَضُ لَمْ يُرَ عَلَى خِلْقَتِهِ حَتَّى دَخَلَ فِي نَعْشِهِ. ثُمَّ لَمْ يُرَ خَارِجًا مِنْهُ. فَلَمَّا دُفِنَ تُلِيَتْ هَذِهِ الآيَةُ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ. لَمْ نَدْرِ مَنْ تَلاهَا:

يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ○ ارْجِعِيْ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً○ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ○ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ○ الفجر

হযরত সাইদ ইবনে জুবাইর রা. বর্ণনা করেন, হযরত ইবনে আব্বাস রা. তায়েফে ইন্তেকাল করেন। তাঁর জানাজার সময় সাদা রঙের একটি চমৎকার ও অদ্ভুত প্রজাতির পাখি উপস্থিত হল। এমন পাখি আগে কখনো দেখা যায়নি। জানাজা শেষে হঠাৎ পাখিটি তাঁর কাফনের ভেতরে প্রবেশ করে। কিন্তু কেউ সেটিকে আর বের হতে দেখেনি। যখন তাঁকে দাফন করা হয়, কবরের পাশ থেকে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত তেলাওয়াতের আওয়াজ ভেসে আসে। কিন্তু কেউ বুঝতে পারে না কে তেলাওয়াত করছে। আয়াতটি ছিল–

হে প্রশান্তচিত্ত, তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে আস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো। *[ফজর ৮৯ : ২৭-২৮, তিবরানী]*

হযরত ওমর রা. কর্তৃক জিনকে পরাজিত করা

ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেন, একটি জিন হযরত ওমর রা.-এর সঙ্গে তিনবার কুস্তিতে অংশগ্রহণ করে। প্রতিবারই তিনি তাকে পরাজিত করেন। অতঃপর জিন জিজ্ঞেস করল, তুমি কি আয়াতুল কুরসি পড়? ওমর রা. উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। জিন বলল, যে ঘরে নিয়মিত আয়াতুল কুরসি তেলাওয়াত করা হয়, সেই ঘর থেকে শয়তান বায়ু নির্গত করতে করতে অতি দ্রুত পলায়ন করে, সকাল পর্যন্ত ওই ঘরে সে প্রবেশ করতে পারে না। *[তিবরানী]*

নবীজির আগমন সম্পর্কে অবলা গরুর সুসংবাদ প্রদান

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ أَسُوقُ لِآلٍ لَنَا بَقَرَةً. قَالَ: فَسَمِعْتُ مِنْ جَوْفِهَا: يَا آلَ ذُرَيْحٍ، قَوْلٌ فَصِيحٌ، رَجُلٌ يَصِيحُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ. قَالَ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ. فَوَجَدْنَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ خَرَجَ بِمَكَّةَ.

ইবনে আব্বাস রা. বর্ণনা করেন, আমি পশুপাল চরানোর কাজে একদা ব্যস্ত ছিলাম, হঠাৎ একটি গরুর পেট থেকে অত্যন্ত স্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসছিল– 'হে জুরাইহ পরিবার, একজন সত্য নবীর আগমন হয়েছে, যিনি বলেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু।' পরবর্তী সময়ে আমরা মক্কায় এসে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পেলাম, যিনি নবুওতের সত্য দাবি করেছেন। *[মুসনাদে আহমাদ]*

মৃত্যুর পরে কথা বলা

সাইদ বিন মুসাইয়াব রা. বর্ণনা করেন, হযরত উসমান রা.-এর খেলাফতকালে জায়িদ বিন খারিজাহ মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃতদেহ কাপড় দ্বারা আবৃত ছিল। উপস্থিত মানুষ তার বক্ষ থেকে অপরিচিত শব্দের প্রতিধ্বনি শুনতে পেল। সে

বলতে লাগল, 'কুরআন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর নাজিল হয়েছে। আবু বকর রা. সত্য বলেছেন, ওমর রা. সত্য বলেছেন। উসমান রা. সত্য বলেছেন।' সাদ রা. বলেন, এ ঘটনার কিছুদিন পর বনি খিতমাহ (একটি গোত্রের নাম) গোত্রের এক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে এবং তাঁরও বক্ষ থেকে অনুরূপ আওয়াজ ধ্বনিত হয়। *[দালাইলুন নাবুওয়াহ, আল বিদায়া ওয়াননিহায়া]*

উহুদের শহীদরা

হযরত জাবির রা. বর্ণনা করেন, হযরত মুয়াবিয়া রা. একটি খাল খনন করেন, যার পাশ দিয়ে উহুদের শহীদদের লাশ দাফন করা ছিল। আমরা খননের সুবিধার জন্য ৪০ বছর পর শহীদদের লাশ উত্তোলন করে অন্যত্র দাফন করলাম। এতো দিনের ব্যবধানেও তাঁদের মৃতদেহগুলো ছিল সতেজ, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ছিল সজীব। আরেক বর্ণনায় পাওয়া যায়, খাল খননের সময় লোহার আঘাত গিয়ে লাগে হযরত হামজা রা.-এর দাফনকৃত মৃত শরীরে। এতো সময়ের ব্যবধানেও শরীর থেকে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়া শুরু হয়। [ফাতহুল বারী]

উহুদ যুদ্ধের শহীদ হযরত আমর বিন জামুহ ও আবদুল্লাহ বিন আমর রা.কে একত্রে একটি কবরে দাফন করা হয়। একবার বন্যার পানি তাঁদের কবরকে উম্মুক্ত করে দিলে লোকেরা তাঁদের লাশগুলো অন্যত্র দাফনের ব্যবস্থা করেন। তারা দেখলেন, এত সময়ের ব্যবধানেও মৃতদেহের কোনো পরিবর্তন হয়নি। মনে হয় যেন গতকাল দাফন করা হয়েছে। অথচ কবর উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছিল উহুদ যুদ্ধের ৪৬ বছর পর।

নবীদের নূরানী মৃতদেহ সুরক্ষিত থাকে

عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ. قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِمْ.

হযরত আউস বিন আউস রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা জমিনের জন্য নবীদের মৃতদেহকে বিগলিত করা হারাম করে দিয়েছেন। *[আবু দাউদ]*

কবর থেকে মেশকের ঘ্রাণ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ شَرْحَبِيْل قَالَ: اِقْتَبَضَ إِنْسَانٌ مِنْ تُرَابِ قَبْرِ سَعْدِ بْنُ مُعَاذٍ، فَفَتَحَهَا فَإِذَا هِيَ مِسْكٌ، قَالَ رَسُوْلُ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُبْحَانَ الله! سُبْحَانَ الله! حَتّٰى عَرَفَ ذٰلِكَ فِيْ وَجْهِه.

মুহাম্মাদ ইবনে শারহাবিল রা. বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হযরত সাদ বিন মুয়াজ রা.-এর কবর থেকে এক মুষ্টি মাটি নিল। যখন তার হাতের মুষ্টি উম্মুক্ত করল তখন দেখল মাটিগুলো মেশক আম্বরে পরিণত হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ!' মুগ্ধতার আভা তাঁর চেহারায় ভাস্বর হয়ে উঠল। *[কানজুল উম্মাল।]*

ভিমরুল দিয়ে হযরত আসিন রা.-এর মৃতদেহ সুরক্ষা

হযরত আসিম বিন সাবিত বিন আফলাহ মিনতি সহকারে দোয়া করতেন, তিনি যেন কোনো মুশরিককে স্পর্শ না করেন এবং কোন মুশরিকও যেন তাঁকে স্পর্শ না করে। তিনি শহীদ হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা একদল ভিমরুল পাঠিয়ে দেন, যারা তাঁর শবদেহের ওপর চক্কর দিচ্ছিল, মুশরিকদের থেকে তাঁকে রক্ষা করার জন্য। *[বুখারী, মুসলিম, সুনানুল কুবরা।]*

নবীজির গোলাম হযরত সাফিনাহ রা.

عَنْ مُحَمَّدِ بن الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ سَفِينَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: رَكِبْتُ الْبَحْرَ، فَانْكَسَرَتْ سَفِينَتِي الَّتِي كُنْتُ فِيهَا، فَرَكِبْتُ لَوْحًا مِنْ أَلْوَاحِهَا، فَطَرَحَنِي اللَّوْحُ فِي أَجَمَةٍ فِيهَا الأَسَدُ، فَأَقْبَلَ يُرِيدُنِي، فَقُلْتُ: يَا أَبَا الْحَارِثِ، أَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَطَأْطَأَ رَأْسَهُ، وَأَقْبَلَ إِلَيَّ، فَدَفَعَنِي بِمَنْكِبِهِ حَتَّى أَخْرَجَنِي مِنَ الأَجَمَةِ، وَوَضَعَنِي عَلَى الطَّرِيقِ، وَهَمْهَمَ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُوَدِّعُنِي، فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ عَهْدِي بِهِ.

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদ করা গোলাম হযরত সাফিনাহ রা. বর্ণনা করেন, একবার নৌপথের যাত্রায় আমার নৌকাটি ভেঙ্গে যায়। আমি ভাঙ্গা নৌকার একটি কাঠখণ্ডে আরোহন করি। কাঠখণ্ডটি আমাকে জঙ্গলের কিনারে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সেখানে নামার পর একটি সিংহ আমার নিকটবর্তী হয়। আমি তাকে লক্ষ্য করে বললাম, আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গোলাম। তৎক্ষণাৎ সে মাথা অবনত করে আমার নিকটবর্তী হলো। সে তার কাঁধ দ্বারা আমাকে মৃদুভাবে স্পর্শ করল। এভাবে স্পর্শ করতে করতে সে পথ দেখিয়ে জঙ্গলের বাইরে নিয়ে গেল। রাস্তায় উঠিয়ে দিয়ে আনত নেত্রে আমার দিকে চেয়ে থাকল। আমি বুঝতে পারলাম, এখন সে আমাকে রেখে চলে যাবে।

নবীজি সা.-এর আগমন সম্পর্কে একটি নেকড়ে বাঘের সংবাদ প্রদান

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: عَدَا الذِّئْبُ عَلَى شَاةٍ فَأَخَذَهَا. فَطَلَبَهُ الرَّاعِي فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ فَأَقْعَى الذِّئْبُ عَلَى ذَنَبِهِ. فَقَالَ: أَلَا تَتَّقِي اللهَ تَنْزِعُ مِنِّي رِزْقًا سَاقَهُ اللهُ إِلَيَّ. فَقَالَ: يَا عَجَبِي ذِئْبٌ مُقْعٍ عَلَى ذَنَبِهِ يُكَلِّمُنِي كَلَامَ الإِنْسِ. فَقَالَ الذِّئْبُ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَعْجَبَ مِنْ ذَلِكَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم بِيَثْرِبَ يُخْبِرُ النَّاسَ بِأَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ. قَالَ: فَأَقْبَلَ الرَّاعِي يَسُوقُ غَنَمَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَدِينَةَ. فَزَوَاهَا إِلَى زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَاهَا، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنُودِيَ بِالصَّلَاةُ جَامِعَةٌ. ثُمَّ خَرَجَ. فَقَالَ لِلأَعْرَابِيِّ: أَخْبِرْهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: صَدَقَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحمد بِيَدِهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُكَلِّمَ السِّبَاعُ الإِنْسَ، وَيُكَلِّمَ الرَّجُلَ [illegible] نَعْلِهِ، وَيُخْبِرَهُ فَخِذُهُ بِمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ.

হযরত আবু সাঈদ খুদরি রা. বর্ণনা করেন, একটি নেকড়ে বাঘ একজন মেষপালককে বলেছে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদিনায় আগমন করেছেন। এবং পূর্ববর্তী কিছু মৃত ব্যক্তির ব্যাপারেও নেকড়েটি সংবাদ দিয়েছে। *[মুসনাদে আহমাদ, তহাবী, সহিহ ইবনে হিব্বান]*

পানির অনুগত হওয়া

হযরত আবু হুরাইয়া রা. বর্ণনা করেন, আলা আল-হাজরামি রা. এর নেতৃত্বে আমরা একবার বাহরাইন সফর করছিলাম। দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে আমরা ভীষণ তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ি। এমন কি আমরা জীবনের ব্যাপারেও আশঙ্কা করতে লাগলাম। সামনে আর কত পথ বাকি আছে তাও আমাদের জানা ছিল না। এ অবস্থায় আলা আল-হাজরামি রা. দুই রাকাত নামাজ পড়ে দোয়া করলেন—

يَا حَلِيْمُ. يَا عَلِيْمُ. يَا عَلِيُّ. يَا عَظِيْمُ. اسْقِنَا

হে আল্লাহ, সবচেয়ে জ্ঞানী, দয়াময়, দাতা, দয়ালু, তুমি আমাদেরকে পানি পান করাও।

তাঁর দোয়ার বরকতে নিরস মরুভূমি পানিতে সিক্ত হয়ে যায়। যে স্থানে দাঁড়িয়ে তিনি দোয়া করছিলেন, তার থেকে দীর্ঘ দূরত্বে ছিল সমুদ্রপাড়। হঠাৎ দেখা গেল বহুদূর থেকে পানির স্রোত এগিয়ে আসছে, কিন্তু সে পানি মাটি স্পর্শ করছে না, কোনো গবাদি পশু বা ঘোড়াগুলোকেও ডুবিয়ে দিচ্ছে না। যেনো পাখির ঝাঁকের মতো উড়ে আসছে। নির্দিষ্ট স্থানে এসে পানির ধারায় ভূমি সিক্ত হয়ে গেল।

টাইগ্রিস নদী পার হওয়া

আবু হুরায়রা রা. বলেন, বাহরাইন সফরে আমরা যখন টাইগ্রিস নদীর উপকণ্ঠে পৌঁছলাম, তখন নদীতে ছিল তীব্র স্রোত। আমরা নদী পার হওয়ার মতো কোনো নৌযান পেলাম না। এ সময় দলনেতা আলা আল-হাজরামি রা. দুই রাকাত নামাজ পড়ে দোয়া করলেন—

يَا حَلِيْمُ. يَا عَلِيْمُ. يَا عَلِيُّ. يَا عَظِيْمُ. أَجِزْنَا

হে আল্লাহ, সবচেয়ে জ্ঞানী, দয়াময়, দাতা, দয়ালু, তুমি আমাদেরকে এই সমস্যা হতে মুক্তি দাও।

এরপর তিনি তাঁর ঘোড়ার লাগম ধরে বললেন, বিসমিল্লাহ্ বলে এগিয়ে চলো। হযরত আবু হুরাইরা রা. বলেন, আমরা পানির উপর দিয়ে হেঁটে গেলাম। আল্লাহর কসম! আমাদের কারো পা কিংবা চতুষ্পদ জন্তুগুলোর পায়ের খুর একটুও সিক্ত হয়নি। এ সময় আমাদের বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল চার হাজার। বাহরাইনবাসী এ দৃশ্য দেখে চিৎকার করে বলতে লাগলো– 'পাগলের দল এসে গেছে!' (নাউজুবিল্লাহ)।

বাহরাইন বিজয়ের পর হাজরামি রা. এখানে আরো এক বছর অবস্থান করার পর ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকাল ও দাফনের পর সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই তাঁর কবর উম্মুক্ত হয়ে যায়, কিন্তু তাঁর মৃতদেহ সেখানে পাওয়া যায়নি। *[বায়হাকি, তিবরানি, আল-বিদায়াহ, শরহে উসুলে ইতিকাদি আহলুস সুন্নাহ, কারামাতু আউলিয়াইল্লাহ।]*

গায়েবি সাহায্য

হযরত আবু হুরাইয়া রা. বর্ণনা করেন, একজন সাহাবি তাঁর পরিবার নিয়ে মদিনায় আগমন করলেন। তাঁদের ছিল তীব্র খাবার সংকট। সাহাবি খাবারের সন্ধানে মরুভূমির দিকে গমন করলেন। তাঁর স্বামীর এই অসহায় অবস্থা দেখে তৎক্ষণাৎ স্ত্রী একটি পাত্র ও পানি রাখার মশক নিয়ে বিনয়ের সঙ্গে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ, আমাদের সাহায্য করো! দোয়া সমাপ্ত হতেই দেখা গেল পানির পাত্রটি পানি দ্বারা ভরপুর হয়ে গেছে আর খাবারের পাত্রটিও সুস্বাদু খাবার দ্বারা ভরে গেছে। আমি (আবু হুরাইয়া) নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবগত করলাম। তিনি বললেন, মহিলা যদি খাবারের পাত্রটি উম্মুক্ত না করত, তবে কিয়ামত পর্যন্ত পাত্র থেকে খাবার হ্রাস পেত না। *[মুসনাদে আহমাদ, তিবরানি, হায়াতুস সাহাবাহ।]*

আবু উবাইদা রা.-এর সৈন্যবাহিনী

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَمَّرَ عَلَيْنَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ نَتَلَقَّى عِيرًا لِقُرَيْشٍ، وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ، فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً. قَالَ. فَقُلْنَا: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا ؟ قَالَ: نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِيُّ ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ، وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِيِّنَا الْخَبَطَ

ثُمَّ نَبُلُّهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ. وَانْطَلَقْنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ فَرُفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْمِ فَأَتَيْنَاهُ فَإِذَا هِيَ دَابَّةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرَ. فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: مَيْتَةٌ. ثُمَّ قَالَ: لاَ. بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ فَكُلُوا. قَالَ فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثَلاَثُ مِائَةٍ حَتَّى سَمِنَّا . وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَيْنِهِ بِالْقِلاَلِ الدُّهْنَ، وَنَقْطَعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالثَّوْرِ. وَلَقَدْ أَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ مِنَّا ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ، وَأَخَذَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلاَعِهِ فَأَقَامَهَا ثُمَّ رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا. وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ. فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ. أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ: هُوَ رِزْقٌ أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ. فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟ فَتُطْعِمُونَا. قَالَ: فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ. فَأَكَلَهُ.

হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ রা. বর্ণনা করেন: নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু উবাইদা রা.কে আমির নিযুক্ত করে আমাদেরকে এক যুদ্ধে প্রেরণ করেন। একটি কুরাইশ বসতির উদ্দেশ্যে আমাদেরকে প্রেরণ করা হয়। খাদ্য হিসেবে আমাদের নিকট ছিল মাত্র এক ব্যাগ খেজুর, অন্য কিছুই ছিল না। কাফেলার প্রত্যেকের জন্য আবু উবাইদা রা. মাত্র একটি করে খেজুর বরাদ্দ করলেন। আমরা শিশুদের মতো অল্প অল্প লোকমায় খেজুর খেয়ে পানি পান করলাম। এই সামান্য খাবার আমাদের সারা দিনের জন্য যথেষ্ট হয়েছিল। আমরা লাঠি দিয়ে গাছ থেকে ফল পাড়তাম এবং তা ভক্ষণ করে দিন পার করতাম। (সফরের চতুর্থ দিন) আমরা সমুদ্রের পারে অবস্থানকালে সেখানে একটি বিরাট মাছ পাই। জাবের রা. বলেন, সেখানে আমরা এক মাস অবস্থান করি এবং সবাই মিলে তৃপ্তি সহকারে এ মাছ দ্বারাই আহার করি। আমাদের বাহিনীতে সদস্য সংখ্যা ছিল তিনশত জন। মাছটি এতই বড় ছিল যে, আবু উবাইদা রা.সহ প্রায়

১৩ জন সাহাবি মাছটির চোখের কোটরে বসেছিলাম। আমাদের সবচেয়ে দীর্ঘদেহি উটটিও মাছটির কলিজার চেয়ে নিচু ছিল।

আমরা মদিনায় ফিরে এসে রাসূল সা.কে ঘটনা অবগত করালে তিনি বলেন, এরই নাম রিজিক। এর পর তিনি আমাদের থেকে নিয়ে সে মাছের অংশ বিশেষ ভক্ষণ করেন। *[বুখারী, মুসলিম, তিবরানী, ইবনে মাজাহ।]*

হাতের স্পর্শে সুস্থ হওয়া

عَنْ ذَيَّالُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ، سَمِعْتُ جَدِّي حَنْظَلَةَ بْنَ حُذَيْمٍ يَقُوْلُ: وَفَدْتُ مَعَ جَدِّي حُذَيْمٍ (وفى روايات إسمه حَنِيْفَة) إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ لِي بَنِيْنَ ذَوِي لِحًى، وَغَيْرَهُمْ، وَهٰذَا أَصْغَرُهُمْ، فَأَدْنَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم، وَمَسَحَ رَأْسِيْ، وَقَالَ: بَارَكَ اللهُ فِيْكَ. قَالَ الذَّيَّالُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ حَنْظَلَةَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْوَارِمِ وَجْهُهُ، وَالشَّاةِ الْوَارِمِ ضَرْعُهَا، فَيَقُوْلُ: بِسْمِ اللهِ عَلَى مَوْضَعِ كَفِّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم، فَيَمْسَحُهُ، فَيَذْهَبُ الْوَرَمُ.

হানজালা বিন হুজাইম রা. বলেন, এক প্রতিনিধি দলের সঙ্গী হয়ে আমি আমার দাদার সাথে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট গিয়েছিলাম। (আমাকে দেখিয়ে) দাদা বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমার নানা বয়সী উত্তরসূরী রয়েছে, তাদের মধ্যে এ হল সর্বকনিষ্ঠ। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর কাছে টেনে নিলেন এবং মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন– আল্লাহ তায়ালা তোমার জীবনে বরকত করুন।

বর্ণনাকারী জাইয়াল বিন উবাইদ (হানজালা রা.-এর নাতি) বলেন, আমি হানজালা রা.কে দেখেছি, মুখমণ্ডল ফুলে ওঠা ব্যক্তি কিংবা ওলান ফুলে ওঠা বকরির গায়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্পর্শ পাওয়া বরকতময় হাত দ্বারা বিসমিল্লাহ বলে

স্পর্শ করতেন। আল্লাহর অসীম রহমতে রোগ ভাল হয়ে যেতো। *[মুজামুল আওসাত]*

হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.-এর অলৌকিকতা

এক ব্যক্তি এক বোতল মদ নিয়ে হযরত খালিদ রা.-এর কাছে এল। খালিদ রা. দোয়া করলেন 'হে আল্লাহ, এটিকে মধুতে পরিণত করো।' বাস্তবিকই বোতলটি খুলে দেখা গেল তাতে মধু রয়েছে।

আরেকটি ঘটনা: এক ব্যক্তি হযরত খালিদ রা.-এর পাশ দিয়ে এক বোতল মদ নিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিল। তিনি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার হাতে কী? লোকটি উত্তরে বলল, ভিনেগার (এক প্রকার আচার বা সস)। খালিদ রা. বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা এটিকে ভিনেগার বানিয়ে দিয়েছেন। বোতলটি উন্মুক্ত করে দেখা গেল, ভেতরে মদের পরিবর্তে আছে ভিনেগার।

তাপ ও ঠাণ্ডা থেকে নিরাপদ

قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَن رَسُوْلَ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ يَوْمَ خَيْبَر: لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، يَفْتَحُ اللهُ لَهُ. لَيْسَ بِفَرَّارٍ. فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَدَعَانِي. فَأَتَيْتُهُ. وَأَنَا أَرْمَدُ لاَ أُبصِرُ شَيْئًا. فَتَفَلَ فِي عَيْنِي وَقَالَ: اللَّهُمَّ أكْفِهِ أَلَمَ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ. فَمَا آذَانِي حَرٌّ وَلاَ بَرْدٌ بَعْدُ.

হযরত আলী রা. বলেন: খায়বারযুদ্ধের দিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেন, আজ আমি ইসলামের পতাকা এমন এক ব্যক্তির হাতে তুলে দেব, যিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালবাসেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলও তাকে ভালোবাসেন। যাকে আল্লাহ তায়ালা জয়লাভ করাবেন এবং যিনি যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করবেন না। আলী রা. বলেন, এরপর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডাকলেন এবং আমার হাতে পতাকা তুলে দিলেন। আমি তখন চোখের যন্ত্রণায় ভুগছিলাম। স্পষ্টভাবে চোখ তুলতে পারছিলাম না। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আমার এ অবস্থা দেখে তাঁর মুখের লালা আমার চোখে লাগিয়ে দিলেন এবং দোয়া করলেন, হে আল্লাহ, তাকে তাপ ও ঠাণ্ডা উভয় থেকে হেফাজত করো। এরপর কখনও তাপ বা ঠাণ্ডা আমাকে কষ্ট দেয়নি। *[মুসনাদে আহমাদ, ইবনে মাজা, তিবরানি, বায়হাকি।]*

বৃদ্ধ বয়সেও তারুণ্যের প্রভাব

জায়িদ আল আনসারী বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন, আমার নিকটবর্তী হও। তাঁর নিকটবর্তী হলে বরকতময় হাত দ্বারা আমার মাথা স্পর্শ করেন এবং বলেন, 'হে আল্লাহ, তাকে সর্বদা তারুণ্যদীপ্ত রাখো এবং তার তারুণ্যকে চিরস্থায়ী করে দাও।' ফলে দেখা যায়, তার বয়স ১০০ বছর পার হয়ে যাওয়ার পরও মাথার সামান্য কিছু চুল শুভ্র হয়েছিল মাত্র। তার চেহারায় সর্বদা ঔজ্জ্বল্য লেগে থাকতো, কখনো বিবর্ণ হতো না। এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দোয়ার বরকতে এরূপ থাকে। *[মুসনাদে আহমাদ]*

হযরত হুসাইন রা.-এর অলৌকিকতা

হযরত হুসাইন রা.-এর কবরের পাশ দিয়ে গমনের সময় এক ব্যক্তি কবরের কাছে প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করল। তারপর থেকে তার পরিবারে অসুস্থতা, দরিদ্রতা ও অভাব নেমে এল। এমনকি পরিবারের অনেক সদস্য মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল।

হযরত উসমান রা.-এর অলৌকিকতা

عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُثْمَانَ أَصْبَحَ يُحَدِّثُ النَّاسَ. قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ. فَقَالَ: يَا عُثْمَانُ أَفْطِرْ عِنْدَنَا. فَأَصْبَحَ صَائِماً وَقُتِلَ مِنْ يَوْمِهِ.

হযরত ইবনে উমর রা. বর্ণনা করেন: একদা সকালে উসমান রা. বললেন, আমি গত রাতে স্বপ্নে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি। তিনি বললেন, হে উসমান, তুমি

আমার সঙ্গে ইফতার করবে। সেই দিনই তিনি শহীদ হন, তখনো তিনি ছিলেন রোজাদার। *[হাকেম, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা।]*

অলৌকিকতা হলো বরকতের কারণ

ইমাম বুখারি রহ. হযরত ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণনা করেন, আমরা (সাহাবিরা) এই সব অলৌকিকতাকে বর্ণনা করি বরকতের জন্য। তিনি বলেন, আমি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি তাঁর আঙুলের অগ্রভাগ দিয়ে পানির ফোয়ারা গড়িয়ে পড়ছে এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খাবার খাচ্ছিলেন তখন খাবার তাসবিহ পাঠ করছিল।

সাহাবায়ে কেরামের এইসব বর্ণনা একদিকে অত্যন্ত আশা ও ভালোবাসার, অন্যদিকে ছিল মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি গভীর ভয় ও মহব্বতের। সত্যিকার কারামত মুমিনের জন্য বরকতের কারণ হয়। নতুবা ভিত্তিহীন বা দুর্বল অলৌকিকতা বর্ণনা ঈমানের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর, যার অনুসরণ মুমিনের সফলতার পথে অন্তরায় তৈরি করে।

উপসংহারঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আকিদা হলো, আউলিয়া কেরাম থেকে কারামত প্রকাশিত হতে পারে। যে কারামতকে অস্বীকার করবে, তার উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। যদিও কারামত ও মুজিজার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য বিদ্যমান। কিছু সাধারণ পার্থক্য হল–

১. মুজিজা হলো উম্মতের দলিল, কারামত নয়।

২. নবীর ইচ্ছা অনুযায়ী মুজিজা ঘটতে পারে, কিন্তু কারামত সংঘটিত হওয়ার জন্য আউলিয়া কেরামের ইচ্ছার কোনো সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ ইচ্ছা করলেই কারামত প্রকাশিত হবে না।

৩. আউলিয়া কেরাম সব সময় কারামত গোপন রাখতে চান, পক্ষান্তরে মুজিজা এমন, যা প্রকাশিতব্য।

আফগান জিহাদের অলৌকিকতা

আফগান জিহাদের যে ঘটনাগুলো আমি বর্ণনা করতে যাচ্ছি, তা প্রকৃতপক্ষে সচরাচর দৃষ্টিগোচর হওয়া অলৌকিকতা ও কল্পনার চেয়েও বেশি বাস্তব। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজ কানেই এগুলো শ্রবণ করেছি এবং নিজ হাতেই তা

রচনা করেছি, যা আমি যুদ্ধে উপস্থিত মুজাহিদদের কাছ থেকে প্রাপ্ত হয়েছি। এত অধিকসংখ্যক মুজাহিদ এগুলো বর্ণনা করেছেন, যাতে বর্ণনাগুলো ভিত্তিহীন সাব্যস্ত করার বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই। আমি বিপুলসংখ্যক বাস্তব ঘটনা শ্রবণ করেছি। কিন্তু সব উল্লেখ করার দৃঢ় সাহস বা সংকল্প কোনোটিই আমার হয়নি। আল্লাহ তায়ালা উত্তমগুলোকে আমাদের জন্য সৌভাগ্যের কারণ বানিয়ে দিন, যেন অন্তর প্রশান্তি লাভ করে।

অধিকাংশ শহীদের শরীর বিকৃত না হওয়া

প্রচুর সংখ্যক শহীদের মৃতদেহ বিকৃত না হওয়ার বর্ণনা এত অধিক যে, বিষয়টি তাওয়াতুর পর্যায়ভুক্ত হয়ে গেছে। অর্থাৎ এত বিপুলসংখ্যক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন, যা ভিত্তিহীন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। হানাফি ও শাফেয়ি উভয় মাজহাবেই শহীদের মৃতদেহ বিকৃত না হওয়ার সমর্থন রয়েছে। শাফেয়ি মাজহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব 'নিহায়াতুল মুহতাজ'-এ উল্লেখ করা হয়েছে, 'যখন কোনো সাধারণ মানুষ কোনো ভূমিতে মৃত্যুবরণ করে এবং সেখানেই তাকে দাফন করা হয়, তবে সময়ের ব্যবধানে মৃতদেহ পরিবর্তিত হয়ে যায়। কিন্তু কোনো নবী বা শহীদের মৃতদেহকে মাটি কখনোই ক্ষয় করতে পারে না।'

হানাফি মাজহাবের প্রসিদ্ধ ফকিহ ইবনে আবেদিন রহ. তাঁর পুস্তক 'কিতাবুল জিহাদে' উল্লেখ করেন, 'একজন শহীদের শরীরকে ক্ষয় করা বা মাটিতে মিশিয়ে ফেলা মাটির জন্য নিষিদ্ধ।'

কিন্তু এ সম্পর্কিত কোনো মারফু হাদিস আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি, তা সত্ত্বেও হযরত হামজা রা.-এর শাহাদাত ও তার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ বহন করে।

আফগানিস্তানের শহীদরা

ওমর হানিফ, যিনি জারমা শহরের একজন সেনাপতি ছিলেন, তিনি নাসরুল্লাহ মানসুরের (ইসলামী বিপ্লবী সংস্থার নেতা) ভাষায় আমাকে বর্ণনা করেন–

১. আমি একজন শহীদকেও এমন দেখিনি, যাঁর শরীর পরিবর্তিত হয়েছে বা বিকৃতি ঘটেছে।

২. আমি এমন কোনো শহীদকেও দেখিনি, যাঁর শরীর কোনো হিংস্র কুকুর স্পর্শ করেছে, যদিও তাঁর শরীর শত্রুবাহিনীর কাছে ছিন্নভিন্ন অবস্থায় পড়েছিল।

৩. আমি নিজেই দীর্ঘ তিন বা চার বছর পর ১২ জন শহীদের কবর উন্মুক্ত করেছি। তাঁদের শরীরে কোনো পরিবর্তন দেখতে পাইনি।

৪. আমি এক বছর পর একজন শহীদের কবর খনন করে দেখেছি, তাঁর ক্ষতচিহ্ন দিয়ে তাজা রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে।

একজন ইমাম আমাকে বলেছেন– আমি শহীদ আব্দুল মাজিদ মুহাম্মদকে তার শাহাদাতের তিন মাস পরে দেখেছি। সে আগের মতোই ছিল এবং তার শরীর থেকে মেশকের ঘ্রাণ বের হচ্ছিল।

হাজি আবদুল মাজিদ আমাকে বর্ণনা করেন– আমি লাইকি শহরের ইমামকে শাহাদাতের সাত মাস পরে দেখেছি, তিনি আগের মতোই ছিলেন। শুধু নাকের উপরিভাগ কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছিল।

শাইখ মুয়াজিন (জিহাদি সংগঠনের মজলিসে সূরার সদস্য) আমাকে বলেন– শহীদ নেসার আহমাদকে শাহাদাতের সাত মাস পর কবর থেকে উত্তোলন করা হয়। তিনিও অপরিবর্তিত ছিলেন।

আবদুল জব্বার নিয়াজি আমাকে বলেন– আমি চারজন শহীদকে তাঁদের শাহাদাতের চার মাস পর দেখেছি। তিনজন আগের মতোই ছিলেন, শুধু হাতের নখ ও মাথার চুল বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু চতুর্থজনকে দেখে আমি উদ্বিগ্ন হলাম। কারণ তাঁর চেহারার কিছু অংশ বিকৃত হয়ে গিয়েছিল।

বাবার সঙ্গে শহীদি সন্তানের হাত মেলানো

১৯৮০ সালে ওমর হানিফ আমাকে বর্ণনা করেন, বিপুলসংখ্যক রাশিয়ান বাহিনীর একটি দল যুদ্ধের ময়দানে উপস্থিত হয়, যাদের কাছে ছিল ৭০টি ভারী ট্যাংক, যাকে ১২টি যুদ্ধবিমান ওপর থেকে পাহারা দিচ্ছিল। অন্যদিকে মুজাহিদরা সংখ্যায় ছিল মাত্র ১১৫ জন। একপর্যায়ে তীব্র লড়াই শুরু হলো। ঘটনাক্রমে শত্রুবাহিনী পরাজিত হলো। আমরা ১৩টি ট্যাংক ধ্বংস করলাম। সেই যুদ্ধে আমাদের মধ্যে মাত্র চারজন শহীদ হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল ইবনে জান্নাতে জাল। যুদ্ধের ময়দানেই আমরা তাকে সমাধিস্থ করলাম। তিনদিন পর কবর থেকে উত্তোলন করে তার বাবার কাছে হস্তান্তর করি, যাতে বাড়ির আঙ্গিনায় তাকে পুনরায় দাফন করা যায়। তার বাবা শহীদ সন্তানের মৃতদেহকে উদ্দেশ করে বলেন, 'হে আমার প্রিয় সন্তান, যদি তুমি প্রকৃতই একজন শহীদ হও তবে আমাকে একটি নিদর্শন দেখাও।' হঠাৎ সে তার ডান হাত উত্তোলন করে বাবাকে সালাম দিল এবং মুসাহাফা করল।

প্রায় ১৫ মিনিট সে তার বাবার হাত ধরে রাখলো। এরপর স্বীয় হাত নিচে নামিয়ে শরীরের ক্ষত চিহ্নের ওপর রাখল। তার বাবা বলেন, 'আমি সেই হাতের কোমলতা এখনো অনুভব করি।' ওমর হানিফ বলেন, এই ঘটনা আমি নিজ চোখে দেখেছি।

মাওলানা আরসালান আমাকে বলেন, আবদুল বাসির নামে একজন ছাত্র আমাদের সঙ্গে থাকা অবস্থায় শহীদ হন। তখন ছিল চারদিকে ভীষণ অন্ধকার। ফতুল্লাহ (একজন মুজাহিদ) ও আমি তার শরীর খুঁজতে লাগলাম। সে আমাকে বলল, অনেক লাশের ভিড়ে যখনই আমি একজন শহীদের মৃতদেহের নিকটবর্তী হলাম, হঠাৎ বাতাসে ঘ্রাণ অনুভব করলাম। ঘ্রাণ অনুসরণ করতে করতে এক নির্জন প্রান্তে পৌঁছে দেখি সেই শহীদের মৃতদেহ। ঘন অন্ধকারে তার শরীর হতে আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। এ আলো আসছিল তাঁর শরীর থেকে গড়িয়ে পড়া তাজা রক্ত হতে।

শহীদ ওমর ইয়াকুব ও তাঁর অস্ত্র

ওমর হানিফ আমাকে বর্ণনা করেন, ওমর ইয়াকুব নামে একজন মুজাহিদ ছিলেন। জিহাদের প্রতি ছিল তাঁর প্রবল আকর্ষণ। তিনি শহীদ হওয়ার পর আমরা যখন তাঁর মৃতদেহের কাছে যাই তখনও তিনি ডান হাত দিয়ে অস্ত্র উঁচু করে ধরে রেখেছিলেন। আমরা তাঁর হাত থেকে অস্ত্র সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আমরা তাঁকে উদ্দেশ করে বললাম, হে ইয়াকুব, আমরা তোমার ভাই। তৎক্ষণাৎ তাঁর হাত থেকে অস্ত্র পড়ে গেল।

আলখাল্লা জড়ানো সাইয়েদ শাহ

ওমর হানিফ আমাকে বর্ণনা করেন, আমাদের মুজাহিদের মধ্যে একজন হাফেজে কুরআন ছিলেন। নাম সাইয়েদ শাহ। তিনি সর্বদা ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন। প্রায়ই তাঁর স্বপ্ন সত্যি হতো এবং তিনি অনেক কারামাতেরও অধিকারী ছিলেন। একবার তিনি জানালেন, তাঁর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পূরণ হতে যাচ্ছে। একপর্যায়ে তিনি শহীদ হন। দীর্ঘ আড়াই বছর পর আমরা তাঁর কবর জিয়ারত করতে যাই।

এ সময় নুরুল হক নামে তাঁর অন্য এক ভাই আমাদের সাথে ছিলেন। আমরা সাইয়েদ শাহের কবর উন্মুক্ত করলাম এবং তাঁকে আগের অবস্থায়ই পেলাম।

শুধু দাড়ি বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি নিজেই তাঁকে পুনরায় দফন করলাম। সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো, তাঁর শরীরে একটি কালো রঙের রেশমি আলখাল্লা জড়ানো দেখতে পেলাম, যা এত সুন্দর যে, এর আগে কখনো আমি অনুরূপ আলখাল্লা পৃথিবীতে দেখিনি। আমি এটি স্পর্শ করেছিলাম, যার থেকে মেশক-আম্বরের চেয়ে অধিক সুঘ্রাণ নির্গত হচ্ছিল।

মুজাহিদীনের দোয়া

আফগানিস্তানের এক বিখ্যাত মুজাহিদ মাওলানা আরসালান। তিনি রাশিয়ান বাহিনীর মধ্যে এত ভীতির সঞ্চার করেছিলেন যে, রাশিয়ান বাহিনী সর্বদা তাঁর ব্যাপারে সৈন্যদেরকে সতর্ক করতো। তারা সৈন্যদের বলত, তিনি (আরসালান) মানুষের গোশত পর্যন্ত ভক্ষণ করেন। এই মাওলানা আরসালান আমাকে বলেছেন, একবার এক খণ্ডযুদ্ধে আমাদের কাছে মাত্র একটি রকেট লাঞ্চার ও একটি ট্যাংকবিধ্বংসী গোলা ছিল। আমরা নামাজ আদায় করে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করলাম, যেনো একটি রকেটই শত্রুবাহিনীর ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। আমরা সম্মুখপথে ২০০টি ট্যাংক এবং একদল সৈন্য দেখলাম, যারা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। আমরা আল্লাহর নাম নিয়ে রকেটে আগুন জ্বালিয়ে বিস্ফোরক ভর্তি রকেটটি তীব্র গতিতে নিক্ষেপ করলাম। আল্লাহর রহমতে শত্রুবাহিনীর ৮৫টি ট্যাংক ও একটি অস্ত্রবাহী গাড়ি ধ্বংস হয়ে গেল। শত্রুরা পরাজিত হলো এবং আমরা অনেককে বন্দি করলাম। আমি (লেখক) সেই যুবককে দেখেছি যে রকেটটিতে আগুন জ্বালিয়েছিল।

পাখির বেষ্টনী

মাওলানা আরসালান আমাকে বলেন, একবার যুদ্ধের ময়দানে নিরাপদ স্থানে পৌঁছার আগেই রাশিয়ান বাহিনী আমাদের আক্রমণ করল। এই আকস্মিক আক্রমণে আমরা ভাবনাতুর হয়ে পড়লাম। ঘটনাক্রমে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা এসে আমাদের মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছিল। ফলে শত্রুবাহিনীর বিমান আমাদের ওপর আক্রমণ করতে পারছিল না। পাখিদের এই অভূতপূর্ব সাহায্যে আমরা নিজেদের প্রস্তুত করে শত্রুবাহিনীর বিমানকে ভূপাতিত করলাম।

মাওলানা জালাল উদ্দিন হক্কানি (একজন বিখ্যাত মুজাহিদ) আমাকে বর্ণনা করেন, আমি বিভিন্ন সময় বিমানের চারদিকে পাখিদের উড্ডয়ন দেখেছি, যাতে মুজাহিদরা বোমার আঘাত থেকে নিরাপদ থাকে।

আবদুল জব্বার নিয়াজি আমাকে বলেন, আমি দুবার শত্রুবাহিনীর বিমানের নিচে পাখির উড্ডয়ন দেখেছি।

কুরবান মুহাম্মদ আমাকে বলেন, একবার আমি ৩০০-এর অধিক পাখিকে বিমান কর্তৃক তাড়িত হতে দেখলাম; কিন্তু একটি পাখিও আহত হয়নি।

আলহাজ মুহাম্মদ জাল (ঘানার প্রদেশের মুজাহিদ) আমাকে বলেন, কম হলেও দশবারের অধিক সময় আমি পাখির ঝাঁককে শত্রুবাহিনীর বিমানের চারপাশে উড়তে দেখেছি, যাদের ওড়ার গতি ছিল শব্দের গতি অপেক্ষা দ্রুততর।

চারদিক থেকে আগুনের পরিবেষ্টন

আরসালান আমাকে বলেন, আমরা শাতুরি নামক এক স্থানে ছিলাম। শত্রুবাহিনীর ২,০০০ সৈন্যের মোকাবিলায় আমরা ছিলাম মাত্র ২৫ জন মুজাহিদ। যুদ্ধ শুরু হলো। দীর্ঘ চার ঘণ্টা পর শত্রুরা পরাজিত হলো। তাদের ৮০ জনের অধিক নিহত হয়েছে এবং ২৬ জনকে আমরা বন্দি করলাম। আমরা বন্দিদের বললাম, তোমাদের সৈন্যরা কেন পালিয়ে গেল? তারা বলল, আফগান মুজাহিদরা চারদিক থেকে আমাদের ওপর বোমা ও গুলি নিক্ষেপ করেছে। আরসালান বলেন, আমাদের কাছে বোমা বা গুলি কোনোটিই সে সময় মজুদ ছিল না। প্রত্যেকের ছিল স্বতন্ত্র অস্ত্র এবং আমরা সবাই একই দিকে আক্রমণ করেছিলাম।

তিনি আমাকে আরো বলেন, একবার শত্রুবাহিনীর বিপুলসংখ্যক সৈন্য আমাদের আক্রমণ করে। অথচ আমরা ছিলাম অল্প ক'জন মুজাহিদ। শত্রুবাহিনীর সহযোগিতার জন্য আকাশে বিমান প্রদক্ষিণ করছিল। আমাদের গোলা-বারুদের পরিমাণও ছিল নিঃশেষ অবস্থায়। ফলে আমরা বন্দি হওয়ার আশঙ্কা করছিলাম। মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে কায়মনোবাক্যে দোয়া শুরু করলাম। হঠাৎ চারদিক থেকে শত্রুবাহিনীর ওপর বৃষ্টির ফোঁটার মতো গুলি ও বোমা পতিত হওয়া শুরু হলো। একপর্যায়ে তারা পরাজিত হলো। আমরা ব্যতীত সেই যুদ্ধের ময়দানে জীবিত কেউ অবশিষ্ট ছিল না। তিনি বলেন, তারা ছিল আল্লাহর মনোনীত ফেরেশতা।

ফেরেশতাদের গায়েবি অশ্ববাহিনী

মাওলানা আরসালান আমাকে বলেন, আর্জুন নামক এক স্থানে কমিউনিস্টরা আমাদের ওপর আক্রমণ চালালে আমরাও শত্রুদের ওপর হামলা করি। যুদ্ধের

একপর্যায়ে আমরা জয়লাভ করি। এতে শত্রুবাহিনীর ৫০০-এর অধিক সৈন্য নিহত হয় এবং ৮৩ জন সৈন্য আমাদের হাতে বন্দি হয়। আমরা বন্দিদের বললাম, তোমরা কেন পরাজিত হলে? তোমাদের কেন এত সৈন্য নিহত হলো, যেখানে মাত্র একজন মুজাহিদ শহীদ হলো? বন্দিরা বলল, তোমাদের মুজাহিদদের ঘোড়ায় আরোহণ করে আমাদের দিকে আক্রমণ করতে দেখলাম। যখনই আমরা আঘাত করি, ঘোড়াগুলো অদৃশ্য হয়ে যায়। আমরা তাদের একটি গুলিও বিদ্ধ করতে পারিনি।

ওই ঘটনার প্রামাণিকতা কুরআনে পাওয়া যায়, যখন বদরের প্রান্তে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের দ্বারা সাহায্য করেন।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

> الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ
>
> স্মরণ কর সেই সময়ে কথা (বদর যুদ্ধ) যখন তোমাদের প্রতিপালক ফেরেশতাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি, সুতরাং তোমরা মুসলমানদের চিত্তসমূহে সাহস সঞ্চার করে তাদেরকে ধীরস্থির রাখো। অচিরেই আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেব। কাজেই গর্দানের ওপর আঘাত করো এবং তাদের জোড়ায় জোড়ায় কাটো। *[আনফাল ৮:১২]*

আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন–

> بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ○
>
> অবশ্য তোমরা যদি সবর কর এবং বিরত থাক, আর তারা যদি তখনই তোমাদের ওপর চড়াও হয়, তাহলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত ঘোড়ার ওপর পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যে পাঠাতে পারেন। *[আলে ইমরান ৩:১২৫]*

এই আয়াতের তাফসিরে ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন, যেসব সৈন্য ধৈর্য ধারণ করে এবং মহান পালনকর্তার কাছ থেকে পুরস্কারের আশা রাখে, অবশ্যই আসমান থেকে ফেরেশতাগণ তাদের কাছে অবতরণ করবে। তাদের সঙ্গে যুদ্ধের ময়দানে সহযোগিতা করবে। কেননা কিয়ামত পর্যন্ত মুজাহিদদেরকে

এইরূপ সাহায্য করার জন্যই আল্লাহ তায়ালা এদেরকে সৃষ্টি করেছেন।

হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন, এই পাঁচ হাজার ফেরেশতা কিয়ামত পর্যন্ত মুমিনদের জন্য সাহায্যকারীরূপে বরাদ্দ। ইমাম মুসলিম রহ. হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেন, 'চিহ্নিত' বলতে এক বিশেষ ধরনের নিদর্শনকে বোঝানো হয়েছে। বিভিন্ন তাফসিরে বর্ণিত আছে, 'চিহ্নিত' বলতে ঘোড়ার ওপর আরোহণকারী ফেরেশতা বোঝানো হয়েছে। কেননা উপস্থিত সবার চেয়ে তারা ভিন্ন প্রকৃতির হন। হাদিস শরিফে এসেছে–

> عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ يَشْتَدُّ فِي أَثَرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمَامَهُ، إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ فَوْقَهُ وَصَوْتَ الْفَارِسِ. يَقُولُ أَقْدِمْ حَيْزُومُ. فَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ، فَخَرَّ مُسْتَلْقِيًا. فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ وَشُقَّ وَجْهُهُ، كَضَرْبَةِ السَّوْطِ. فَاخْضَرَّ ذَلِكَ أَجْمَعُ. فَجَاءَ الأَنْصَارِيُّ فَحَدَّثَ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ: صَدَقْتَ ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ.
>
> হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন: বদরের ময়দানে একজন মুসলিম সাহাবি এক মুশরিককে ধাওয়া করলেন। হঠাৎ মাথার ওপর থেকে ঘোড়ার ওপর চাবুক মারার আওয়াজ শুনতে পেলেন। অশ্বারোহী চিৎকার করে বলছে, হে হাইসাম, সামনে অগ্রসর হও। তিনি সেই মুশরিককে দেখলেন উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তার দাঁত ভেঙে গেছে আর চেহারা পরিপূর্ণ বিকৃত হয়ে গেছে। মনে হয় তার চেহারার ওপর কেউ চাবুকের আঘাত করেছে। একজন আনসারি বিস্মিত হয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে সংবাদ দিলেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সত্য বলেছ। এটা হল তৃতীয় আসমান হতে আগত সাহায্য। *[সহিহ মুসলিম]*

মুহাম্মদ ইয়াসির আমাকে বর্ণনা করেন, শত্রুবাহিনী ট্যাংক-বহর নিয়ে শহরে প্রবেশ করার পর তারা মুসলিম বাহিনীর ঘোড়ার আস্তাবল অনুসন্ধান করতে লাগল। মানুষ আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগল, তারা তো ঘোড়ায় আরোহন করতেই করেন না। তখন তারা উপলব্ধি করল, এ ঘোড়াগুলো আল্লাহ প্রদত্ত ফেরেশতা

অস্ত্র ভাণ্ডারের শেষ নেই

একবার জালালুদ্দীন হক্কানি আমাকে বলেন, আমি একজন মুজাহিদকে সামান্য কিছু অস্ত্র দিলাম। সে এগুলো নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে গেল। যুদ্ধের ময়দানে সেই অস্ত্র দিয়ে প্রচুর পরিমাণ গোলা-বারুদ নিক্ষেপ করেছে; কিন্তু অস্ত্রের মধ্যে মজুদ গোলা-বারুদ কিছুই হ্রাস পায়নি। সে যেরূপ নিয়ে গিয়েছিল সেরূপই যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে।

শরীরের ওপর দিয়ে ট্যাংক অতিক্রম করার পরও জীবিত থাকা

আবদুল জব্বার নিয়াজি আমাকে বলেন, একসময় আমি একজন মুজাহিদকে দেখলাম, যার শরীরের ওপর দিয়ে ট্যাংক অতিক্রম করেছে, অথচ সে জীবিত। সেই মুজাহিদের নাম ছিল গোলাম মহিউদ্দিন। আলহাজ মুহাম্মদ ইউসুফ (লোগার শহরের সহকারী আমির) আমাকে বর্ণনা করেন, একটি ট্যাংক মুজাহিদ বদর মুহাম্মদ জালের ওপর দিয়ে অতিবাহিত হয়, অথচ সে অত ছিল। আমরা ঠিক জানি না সে ট্যাংকের চাকার নিচে পিষ্ট হয়েছিল নাকি উভয় চাকার মধ্যস্থানে চাপা পড়েছিল।

কাঁকড়া-বিছার দ্বারা মুজাহিদদের সুরক্ষা

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ

> তোমাদের পালনকর্তার বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। এটা তো মানুষের জন্য উপদেশ ছাড়া কিছু নয়।
> *[মুদ্দাসসির ৭৪:৩১]*

আবদুস সামাদ ও মাহবুবুল্লাহ উভয়ে আমাকে বলেন, শত্রুবাহিনী কুন্দুজ শহরের মাঝামাঝি এক স্থানে তাঁবু স্থাপন করে। বিভিন্ন প্রজাতির কাঁকড়া-বিচ্ছু তাদের আক্রমণ করে এবং দংশন করে। ছয়জন স্ব-স্থানেই মারা যায়, আর অন্যরা পলায়ন করে।

একটি শিশু ও দিয়াশলাই

আবদুল মান্নান আমাকে বলেন, মুজাহিদ আমির জান শহীদ হওয়ার কিছুদিন পর রাশিয়ান বাহিনী ট্যাংকের বহর নিয়ে তার এলাকায় প্রবেশ করে। এ সময় আমির জানের তিন বছরের শিশু সন্তান বাড়ি থেকে একটি ম্যাচ নিয়ে বাড়ির

বাইরে বের হয়ে আসে। রাশিয়ান সেনাপতি জিজ্ঞেস করল, বাচ্চাটি কী চায়? তারা বলল, সে আপনাদের (শত্রুবাহিনীর) ট্যাংক ধ্বংস করতে চায়।

সাপ-বিচ্ছু মুজাহিদদের আক্রমণ করে না

উমর হানিফ আমাকে বললেন, অনেক সাপ-বিচ্ছু মুজাহিদদের সঙ্গে রাত যাপন করেছে। দীর্ঘ চার বছরের মধ্যেও কোনো মুজাহিদকে সাপ-বিচ্ছু দংশন করতে দেখিনি। আফগান পাহাড়ি অঞ্চলে অসংখ্য বিষধর সাপ থাকে, যেগুলো সোভিয়েত কমিউনিস্ট সৈন্যদের দংশন করলেও মুজাহিদদের কোনো ক্ষতি করে না; বরং পাহারা দেয়। এভাবেই দীর্ঘ প্রায় দশ বছর ধরে চলছে সাপ ও কমিউনিস্টদের লড়াই। বিষধর পাহাড়ি সাপগুলো যেন মুজাহিদদের কতই না আত্মীয়, পুরনো বন্ধু।

হাতের মেহেদি মোছার আগেই শহীদি নারী

ওমর হানিফ আমাকে বলেন, একদা শত্রুবাহিনীর ট্যাংক লরি একটি মসজিদে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে ঘিরে ফেলল, যেখানে মুজাহিদরা অবস্থান করছিলেন। একজন যুবতী নারী, মাত্র দুই দিন আগে যার বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে, বিনয়াবনত হয়ে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করছেন–

'হে আল্লাহ, যদি শত্রুরা মুজাহিদদের হত্যার জন্য ট্যাংকের সাহায্যে আক্রমণ করে তবে আমাকে তাদের জন্য প্রতিবন্ধক বানিয়ে দাও।'

এতে সেই যুবতী নারী শাহাদাতবরণ করল এবং মুজাহিদরা রক্ষা পেল। মুয়াজিন আমাকে বলেছেন, যখন আনজির জাল শহীদ হন, তার মা হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিয়ে বাড়ির বাইরে বের হয়ে আসেন। শাহাদাতকে উদ্‌যাপনের জন্য মানুষ আকাশে ফাঁকা গুলিবর্ষণ করছিল। দুর্বলচিত্তের ঈমানদার ব্যক্তিরা আমাদের উদ্দেশে বলছিল, এই লোকগুলো পাগল হয়ে গেছে। বাস্তবিকপক্ষে দুনিয়ার প্রতি তীব্র ভালোবাসায় আমরা জড়িয়ে আছি বিধায় পরকালীন বিষয়াবলি বুঝে আসতে চায় না।

বোমা অবিস্ফোরিত রয়ে গেছে

জালালুদ্দীন হক্কানি আমাকে বলেছেন, একবার আমরা ৩০ জন মুজাহিদ এক জায়গায় ছিলাম। হঠাৎ আমাদের উপর বিমান থেকে বোমা নিক্ষেপ করা শুরু

হয়। বোমাগুলো আমাদের চারদিকে তীব্র আওয়াজে বিস্ফোরিত হচ্ছিল। হঠাৎ একটি বোমা সজোরে আমাদের আঘাত করল; কিন্তু আল্লাহর রহমতে বোমাটি বিস্ফোরিত হলো না। বোমাটির ওজন প্রায় ৪৫ কেজি। এটি বিস্ফোরিত হলে সবাই শহীদ হয়ে যেতাম।

আবদুল মান্নান আমাকে বলেন, একটি স্থানে আমরা তিন হাজার মুজাহিদ ছিলাম। শত্রুবাহিনী আমাদের ওপর প্রায় ৩০০টি ভারী বোমাবর্ষণ করে। কিন্তু আল্লাহর কুদরতে একটি বোমাও বিস্ফোরিত হয়নি। বোমাগুলো কুড়িয়ে এনে অতিদ্রুত আমরা সেই স্থান ত্যাগ করি। পরবর্তিতে সেই ৩০০ বোমা পাকিস্তানের কোয়েটা শহরের মুজাহিদ সেন্টারে জমা দিই।

এক গর্বিত মায়ের শহীদি সন্তান

ভাই মুয়াজ্জিন আমাকে বললেন, আমাদের এক সঙ্গী শাহাদাতবরণ করল। নাম তার আনজির গুল। খবর পেয়ে শহীদের মা সুন্দর কাপড়চোপড় পরে হাসিখুশি চলাফেরা করতে লাগলেন। আর পাড়ার অন্যান্য লোক তাদের পড়শীর শাহাদাতে বন্দুকের ফাঁকা গুলি ছুড়ে আনন্দ প্রকাশ করল। পুত্র শহীদ হলে আফগান মায়েরা খুশিই হন। কারণ, এর চেয়ে বড় কোনো সম্মান তাঁদের দৃষ্টিতে নেই।

বুলেট তাদের শরীরকে ছিদ্র করেনি

করেনি জালালুদ্দীন হক্কানি আমাকে বলেন, আমি অনেক মুজাহিদকে যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসতে দেখেছি, যাদের জামাগুলো ছিল অসংখ্য গুলির ছিদ্রযুক্ত; কিন্তু তাদের শরীরে একটি গুলিও প্রবেশ করেনি।

শায়েখ আহমাদ শরিফ আমাকে বলেন, আমার সন্তান যুদ্ধের ময়দান থেকে একসময় ফিরে আসে, যার কাপড়ে ছিল অসংখ্য ছিদ্র; কিন্তু শরীরে কোনো ক্ষতচিহ্ন নেই।

শায়খ নাসরুল্লাহ মানসুর আমাকে বলেন, ১৯৮২ সালের ১ এপ্রিল আমি একজন মুজাহিদকে দেখলাম, যার মাথায় ১০টি বুলেটের চিহ্ন আর কনুই থেকে হাতের তালু পর্যন্ত প্রায় ১৫টি আঘাতের চিহ্ন। অথচ সে সম্পূর্ণ সুস্থ।

মাওলানা পীর মুহাম্মদ আমাকে বলেন, আমরা ১২ জন মুজাহিদ 'বাকতিসা' নামক একটি স্থান পাহারা দিচ্ছিলাম। আমরা এমন একটি শত্রুবাহিনীর দ্বারা

আক্রান্ত হলাম, যাদের ছিল প্রায় ১৮০টি যুদ্ধবিমান। একপর্যায়ে তারা আমাদের ঘিরে ফেলল এবং অনর্গল বোমা নিক্ষেপ করছিল। আমরা যুদ্ধের ময়দান থেকে যখন প্রত্যাবর্তন করি, তখন কাপড়গুলোতে ছিল অসংখ্য ছিদ্র, অথচ আমাদের কেউ হতাহত হয়নি। শত্রুবাহিনীর ১৬০ জন সদস্য মারা যায় ও তিনটি ট্যাংক ধ্বংস হয়। আমাদের মাত্র দুজন মুজাহিদ শহীদ হন।

আমি নিজের চোখে দেখেছি, জালালুদ্দীন হক্কানির বুকে গুলিবিদ্ধ হয়েছে, কিন্তু তাঁর বুকে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই।

জালালুদ্দীন হক্কানি আমাকে বলেন, ভূমিতে লুকানো একটি মাইন আমার পায়ের নিচে বিস্ফোরিত হয়েছে, কিন্তু আমি কোনো আঘাত পাইনি।

শহীদের শরীর থেকে আলোর বিচ্ছুরণ

মুজাহিদ আবদুল মান্নান (পশ্চিম কেনদারের হেলমান প্রদেশের একজন নেতা) আমাকে বলেন, একবার এক লড়াইয়ে আমরা ছিলাম সংখ্যায় ৬০০ জন, আর রাশিয়ান বাহিনীতে ছিল ৬০০০-এর অধিক। শত্রুবাহিনীর ছিল ৬০০টি ট্যাংক ও ৪৫টি বিমান বহর। তারা আমাদের তীব্রভাবে আক্রমণ করে। প্রায় ১৮ দিন ধরে যুদ্ধ চলতে থাকে। এতে ৩৩ জন মুজাহিদ শহীদ হন। শত্রুবাহিনীর ৪৫০ জন সদস্য মারা যায়, আর ৩৬ জন বন্দি হয়, ৩০টি ট্যাংক ধ্বংস হয় এবং দুটি বিমান ভূপতিত হয়। তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। ১৮ দিন ধরে চলমান এই যুদ্ধের মধ্যে কোনো শহীদের শরীর বিকৃতও হয়নি বা কোনোরূপ দুর্গন্ধযুক্ত হয়নি। এদের মধ্যে একজন শহীদ আবদুল গাফফার, যিনি দীন মুহাম্মদের সন্তান, প্রতিদিন রাতে তাঁর মৃত শরীর থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়ে আকাশের দিকে উঠে যেত এবং এই আলোর আভা প্রায় ৩ মিনিট ধরে স্থায়ী থাকত। উপস্থিত সব মুজাহিদ এই অভূতপূর্ব দৃশ্য অবলোকন করেছে।

ওমর হানিফ আমাকে বলেন, ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। এশার পর প্রতি রাতে আমাদের বাড়ির পাশে একজন মুজাহিদের বাড়ির আঙিনা থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়ে আকাশে উঠে যেতে দেখা যায়। ওই আলোর আভা চারপাশকে আলোকিত করে দেয়। কিছুক্ষণ পর তাও অদৃশ্য হয়ে যায়।

আগুন থেকে অস্ত্রাগার নিরাপদ

জালালুদ্দীন হক্কানি আমাকে বলেন, প্রায় চার বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে শত্রুবাহিনী আমাদের ওপর বোমা নিক্ষেপ করে। এতে অনেক বাড়িঘর বা মুজাহিদের তাঁবু আগুনে জ্বলে যায়; কিন্তু যেখানে অস্ত্র সংরক্ষণ করা হতো, আগুন কখনো সেখানে স্পর্শ করেনি।

ছোট একটি দল বৃহৎ দলের ওপর জয়লাভ করা

শায়েখ জালালুদ্দীন হক্কানি তার অনেক যুদ্ধের স্মৃতি থেকে দুটি বিশেষ ঘটনার স্মৃতিচারণা করেন– প্রথমটি হলো ১৯৮৭ সালের ঘটনা। এমন এক কঠিন মুহূর্তের মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত হচ্ছিল যে আমরা ট্যাংক ধ্বংসকারী পি-২ ও পি-৭ রকেট সংগ্রহ করতে পারছিলাম না। আমরা মুজাহিদরা মিলে কিছু অর্থ জমা করলাম। ট্যাংক ধ্বংসকারী রকেট সংগ্রহের জন্য আমরা সফর শুরু করলাম। একদিন হঠাৎ শত্রুবাহিনীর একটি অগ্রবর্তী দল আমাদের আক্রমণ করল, যাদের ছিল কয়েক হাজার সৈন্য। দুই দিনের অধিক সময় ধরে তীব্র লড়াই চলল।

একপর্যায়ে তারা পরাজিত হলো। আমরা ২৫টি পি-২ ও পি-৭ রকেট, কিছু বন্দুক, মেশিনগান ও আটটি ট্যাংক আয়ত্ত করলাম। একটি একে-৪৭সহ হাজারের অধিক সৈন্যকে আমরা বন্দি করলাম।

দ্বিতীয়টি হলো ১৯৮২ সালের ঘটনা। আমরা ছিলাম ৫৯ জন মুজাহিদ। শত্রুবাহিনীর ছিল ২২০টি ট্যাংক ও মালামালবাহী গাড়ি। সৈন্যসংখ্যাও ছিল হাজারের অধিক। আকাশের ওপর বিমানের সাহায্যে আমাদের ওপর অবিরাম বোমা নিক্ষেপ করা হচ্ছিল। এ যুদ্ধে শত্রুবাহিনীর প্রায় ৪৫টি ট্যাংক ও মালামাল সরবরাহকারী অনেক বাহন ধ্বংস হলো। ১৫০ জন সৈন্য নিহত হল এবং শতের অধিক আহত হলো। আমরা শত্রুবাহিনী থেকে বিমান ধ্বংসকারী মেশিন, সাতটি একে-৪৭, ৬৬টি বন্দুক, ২৮০টি বোমা এবং ৩৬ হাজার রাউন্ড গুলি জব্দ করেছিলাম।

উত্তর কাবুলে যুদ্ধ

আলহাজ মুহাম্মদ জান আমাকে বলেন, মুজাহিদরা সংখ্যায় ছিল ১২০ জন আর শত্রুরা ছিল প্রায় ১০হাজারের অধিক। তাদের সঙ্গে ছিল ৮০০টি ট্যাংক ও ২৫টি যুদ্ধবিমান। যুদ্ধের ফলাফল হলো, আমরা ৪৫০ জন সৈন্যকে হত্যা করলাম ও

১৫০টি ট্যাংক ধ্বংস করলাম। এ সময় অস্ত্রভর্তি ১১টি গাড়ি আমাদের হস্তগত হয়।

প্রথম যুদ্ধের এক মাস পরই দ্বিতীয় যুদ্ধ শুরু মুহাম্মদ জান আমাকে বিস্তারিত বলেন যে, মুজাহিদরা সংখ্যায় ছিল ৫০০ জন। আর শত্রুবাহিনীর সজোয়া ট্যাংক বহরসহ সংখ্যায় ছিল প্রায় ১০ হাজার। ফলাফল হলো এই যে, আমরা প্রায় ১২০০ সৈন্যকে হত্যা করলাম। কাফেরদের পতিত মৃতদেহগুলো এতটাই বিকৃত হয়েছিল যে, প্রায় এক মাস অবধি তাদের মৃতদেহ থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল।

তন্দ্রাচ্ছন্নতা ও একগুচ্ছ ফুল

মুহাম্মদ ইয়াসির (যিনি উস্তাদ সাইয়াফের একজন সাহায্যকারী) আমাকে বলেন, উদাইল মিয়া জাল, যিনি বিনলাল প্রতিরা বিভাগের প্রধান নেতা। তিনি ১৪০৩ হিজরিতে শহীদ হন। ইসলামী এই আন্দোলনের তিনি ছিলেন প্রথম পর্যায়ের সন্তান এবং একজন বিখ্যাত নেতা। যখন তিনি শহীদ হন, তখন এই আন্দোলনের সদস্যসংখ্যা লাখেরও অধিক ছাড়িয়ে গেছে। মিয়া জাল ছিলেন তাঁদের ভাই-বোনদের মধ্যে চতুর্থ। তাঁর শাহাদাতে পরিবারের সবাই অত্যন্ত মর্মাহত হন। এক রাতে তাঁর ভাই অজু করে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করেন, হে আল্লাহ, যদি আমার ভাই প্রকৃত শহীদ হন, তবে আমাকে একটি নিদর্শন দেখাও। সে যথারীতি তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করে ঘুমিয়ে পড়ে। হঠাৎ সে অনুভব করল, তার শরীরের ওপর কোনো কিছু পতিত হলো। সে বাতি জ্বালাল, দেখল একগুচ্ছ গোলাপ ফুল। যার ঘ্রাণে পুরো ঘর বিমোহিত। সে পরিবারের সবাইকে একত্র করে এই অলৌকিকতা দেখাল। পরিবারের সবাই মতামত দিল, আগামীকাল সকালে মুহাম্মদ ইয়াসিরকে আমরা এটি দেখাব। সে পুনরায় ফুলগুচ্ছটি বালিশের পাশে রেখে ঘুমিয়ে গেল। যখন সকাল হলো, সেই গোলাপ গুচ্ছকে আর পাওয়া গেল না।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً
لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ
وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ○

স্মরণ করো সে সময়কে যখন তিনি তোমাদের সান্ত্বনার জন্য

তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন, তোমাদের পবিত্র করার জন্য ও তোমাদের থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারণের জন্য এবং তোমাদের মনোবল সুদৃঢ় রাখার লক্ষ্যে, আর তোমাদের পা অবিচলিত রাখার প্রয়োজনে তিনি আসমান থেকে তোমাদের ওপর বারিবর্ষণ করেন। *[আনফাল ৮:১১]*

ইবনে কাসির রহ. তাঁর তাফসিরের কিতাবে উল্লেখ করেন, হযরত আবু তানহা রা. বলেন, আমি সেইসব ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, যাদের ওপর উহুদের ময়দানে তন্দ্রা আচ্ছন্ন করেছিল। বহুবার তন্দ্রার কারণে আমার হাত থেকে তরবারি নিচে পতিত হয়েছিল। যতবারই পড়ে, আমি উঠিয়ে নিই। আমি মুসলিমদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তারাও এদিক-সেদিক ঢলে পড়ছে, অথচ তাদের হাতের ঢালগুলো ঠিকই আঘাত প্রতিরোধ করছিল।

বদর যুদ্ধ সম্পর্কে এক হাদিসে এসেছে–

عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : مَا كَانَ فِينَا فَارِسٌ يَوْمَ بَدْرٍ غَيْرُ الْمِقْدَادِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا فِينَا قَائِمٌ إِلا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي تَحْتَ شَجَرَةٍ وَيَبْكِي حَتَّى أَصْبَحَ

হযরত আলী রা. বলেন, বদরের যুদ্ধে আমাদের মাত্র একজন ঘোড়সাওয়ার ছিলেন, যিনি হযরত মেকদাদ রা.। আমি শপথ করে বলতে পারি, একমাত্র নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আমাদের সবাইকে তন্দ্রা আচ্ছন্ন করেছিল। অথচ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি গাছের নিচে হাত তুলে মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে দোয়া ও ক্রন্দন করছিলেন, এভাবেই সকাল হয়েগেল। *[মুসনাদে আবু ইয়ালা]*

আরসালানের ওপর তন্দ্রার প্রভাব

মাওলানা আরসালান আমাকে বলেন, শাহী কিউয়ের যুদ্ধে তিনি প্রায় ১০ মিনিটের জন্য ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এ অবস্থায় চারদিক থেকে প্রচণ্ড আওয়াজে শত্রুবাহিনীর থেকে গুলি নির্গত হচ্ছিল।

আবদুর রহমান আমাকে বলেন, রাইজি (বাকি) নামক যুদ্ধে প্রায় ১৫০ অথবা

২০০টি ট্যাংক আমাদের আক্রমণ করে। কিছু কিছু গোলার কান ফাটানো শব্দ এতই বিকট ছিল যে, মুজাহিদরা দুই-তিন দিন পর্যন্ত অন্য কিছুই শুনতে পায়নি। একপর্যায়ে যুদ্ধের ময়দানেই ঘুম আমাদের আচ্ছন্ন করল। যখন আমরা জাগ্রত হলাম, তখন চারপাশ ছিল শান্ত ও নীরব। এই যুদ্ধে আমরা অনেক অস্ত্র সংগ্রহ করেছিলাম এবং দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের বিজয় হয়েছিল।

আবদুল্লাহ (যিনি হেকমতিয়ারের দেহরী ছিলেন) আমাকে বলেন, যুদ্ধের ময়দানে বহুবার ঘুম আমাদের আচ্ছন্ন করেছে। আমার ধারণা, এটি মহান আল্লাহ তায়ালার প থেকে শান্তি ও উপহার।

আবদুর রশীদ আবদুল কাদির আমাকে বলেন, আমি সাক্ষ্য দিতে পারি যে, প্রায় তিনবার রাশিয়ান বাহিনীর আক্রমণের সময় মুজাহিদদের ওপর তন্দ্রা আচ্ছন্ন করেছিল। তারা দুই বা তিন মিনিটের জন্য ঘুমিয়েছিল। পুনরায় জেগে নতুন উদ্যমে যুদ্ধ শুরু করে। এতে তারা রাশিয়ান বাহিনীর ওপর বিজয়ী হয়।

আখতার মুহাম্মদের শরীরের ওপর দিয়ে ট্যাংক চালানোর পরও তাঁর মৃত্যু হলো না

মুহাম্মদ জিনজাল, গাজনি ও খানসার সবাই আমাকে বলেন, আমি নিজের চোখে দেখেছি, আখতার মুহাম্মদের শরীরের ওপর দিয়ে ট্যাংক অতিবাহিত হয়েছে, অথচ তিনি জীবিত। যখন তারা (শত্রুরা) দেখল এই বিরাট ঘটনার পরও তিনি জীবিত, তারা পুনরায় একইভাবে শরীরের ওপর দিয়ে ট্যাংক চালনা করল, কিন্তু মহান আল্লাহর কুদরতে তাঁকে হত্যা করা গেল না। অতঃপর অন্য দুজন মুজাহিদ ও আখতার মুহাম্মদকে একত্র করে দূর থেকে তাঁদের ওপর বোমা নিক্ষেপ করল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার কী অপূর্ব নিদর্শন, আখতার মুহাম্মদ ব্যতীত অন্য দুজন শহীদ হয়ে গেলেন। তিনি জীবিত অবস্থায় মাটিতে পড়ে রইলেন। শত্রুরা মৃত মনে করে সবার শরীরকে বালি দিয়ে ঢেকে দিল এবং সব শত্রু স্থান ত্যাগ করল। সত্রুরা চলে যাওয়ার পর তিনি সুস্থ অবস্থায় মুজাহিদদের কাছে ফিরে এলেন। এখন পর্যন্ত (কিতাব লেখার সময়) তিনি জীবিত ও আন্তরিকতার সঙ্গে জিহাদের ময়দানে আছেন।

মুহাম্মদ মিনজাল আমাকে গজনি প্রদেশের মুজাহিদ নাসরুল্লাহর ঘটনা শোনান। তাঁকে উদ্দেশে করে শত্রুরা অনেক গুলি নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু গুলিগুলো কোনোরূপ আঘাত করা ব্যতীত তাঁর পকেটে পড়ে যায়। তিনি দুজন মুজাহিদকে এ অবস্থা দেখান এবং তাঁরা দুজন এই ঘটনার সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছেন।

চোখে বুলেট বিদ্ধ হয়েছে কিন্তু কোনোরূপ ক্ষতি হয়নি

মাওলানা আরসালান আমাকে বলেন, দূর থেকে নিক্ষিপ্ত একটি বুলেট শাহ্ নামক মুজাহিদের চোখে বিদ্ধ হয়; কিন্তু তাঁর চোখের কোনো ক্ষতি হয়নি। শুধু চোখের ভেতরের অংশ সামান্য লালবর্ণ হয়েছিল।

চৌদ্দটি বোমা নিক্ষেপের পরও মুজাহিদ অক্ষত ছিলেন

মুহাম্মদ নাঈম (গাইমাজ প্রদেশের এক নেতা) আমাকে বলেন, একবার মুজাহিদদের ওপর বিমান থেকে ১৪টি শক্তিশালী বোমা নিক্ষেপ করা হয়। ১৩টি বোমা তাদের কাছে বিস্ফোরিত হয়; কিন্তু কাউকেই এর আঘাত স্পর্শ করেনি।

বুলেট তাদের শরীরকে বিদ্ধ করেনি

আমি (লেখক) নিজের চোখে খাজা মুহাম্মদের পাঞ্জাবি দেখেছি, যা মর্টারের গোলার আঘাতে টুকরো টুকরো হয়েছিল। মর্টার থেকে পাঁচটি গোলা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল; কিন্তু তার শরীরে মাত্র একটি আঘাতের চিহ্ন ছিল।

তাঁবুতে আগুন কিন্তু অবস্থানকারী নিরাপদ

ইবরাহিম শাকিক জালালুদ্দীন আমাকে বলেন, ১৯৮৩ সালের ৮ মার্চ, শত্রুবাহিনীর পদাতিক সৈন্যরা আমাদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। এতে একটি তাঁবুর ৯টি স্থানে আগুনে পুড়ে যায়। তিনজন মুজাহিদ ভাই তাঁবুতে ছিলেন। কিন্তু কারো কোনো ক্ষতি হয়নি।

আমার জামা পুড়েছিল

ইবরাহিম আমাকে বলেন, ১৪০২ হিজরির ২০ শাবান। বাজি নামক যুদ্ধের ময়দানে আমাদের ওপর অনবরত গুলি নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। এতে আমার টেলিস্কোপ ভেঙে যায় এবং আমার জামার বিভিন্ন অংশ পুড়ে যায়। আমি (লেখক) নিজেই ইবরাহিমের সেই দগ্ধ জামা দেখেছি, যার স্মৃতি আমার চোখে এখনো ভাসছে। ইবরাহিমের ছিল প্রচণ্ড বিস্ময়তা। তাঁর সঙ্গে আরো ২০ জন মুজাহিদ ছিলেন, যাদের জামার বিভিন্ন অংশে দগ্ধের চিহ্ন ছিল। কিন্তু তাদের কেউই কোনোরূপ হতাহত হননি।

মাইনের ওপর দিয়ে গাড়ি পার হওয়া

ইবরাহিম আমাকে বলেন, আমরা রাজমা নামক স্থানে ৩০ জন মুজাহিদ ছিলাম। শত্রুরা ছিল সংখ্যায় প্রায় ৩০০ জন, সঙ্গে ছিল ট্যাংক, অস্ত্রবাহী গাড়ি ও প্রচুর পরিমাণ রশদভাণ্ডার। যুদ্ধের একপর্যায়ে তারা পরাজিত হলো। আমরা দুটি দীর্ঘ রেঞ্জের বন্দুক, একটি অস্ত্রবাহী গাড়ি, ৩০০টি গোলা, কিছু মাইন, ৩০ হাজার রাউন্ড গুলি ও ছয়টি একে-৪৭ রাইফেল সংগ্রহ করলাম। আমরা একটি গাড়িতে শত্রুবাহিনীর বন্দি হওয়া সৈন্যদের একত্র করলাম।

সেই গাড়ির চালক মুহাম্মদ রাসুলের পেছনে আমি বসা ছিলাম। হঠাৎ আমাদের গাড়িটি একটি মাইনের ওপর দিয়ে অতিক্রম করে; কিন্তু মাইনটি বিস্ফোরিত হয়নি। একইভাবে আমাদের পেছনের গাড়িটি সেই পতিত মাইনের ওপর দিয়ে অতিবাহিত হয়; কিন্তু প্রচণ্ড আওয়াজে মাইনটি বিস্ফোরিত হয়।

ফাতুল্লাহ আমাকে বলেন, একবার মুজাহিদদের তাঁবুর ওপর একটি বোমা পতিত হয়ে সব তাঁবু আগুনে জ্বলে যায়; কিন্তু তাঁবুতে অবস্থানকারীদের কোনো ক্ষতি হয়নি।

আবদুল করিম আমাকে বলেন, আমি অফিসার সাইয়েদ আবদুল আলীকে দেখেছি, যখন তিনি যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে এলেন, তাঁর শরীরে পরিহিত জামার বিভিন্ন অংশে বুলেটের আঘাতে ছিদ্র হয়ে আছে; কিন্তু শরীরের কোনো ক্ষতি হয়নি।

শহীদদের কারামত

শহীদদের শরীর থেকে ঘ্রাণ বের হওয়া শহীদদের শরীর থেকে সুঘ্রাণ বের হওয়া মুজাহিদদের কাছে অতিপরিচিত একটি বিষয়। ঘ্রাণের ব্যাপকতা এতটাই বেশি হয় যে, অনেক দূরবর্তী স্থান থেকে তা অনুভব করা যায়।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تُفَنِّدُونِ

> যখন কাফেলা রওনা হলো, তখন তাদের পিতা বললেন, যদি তোমরা আমাকে অপ্রকৃতিস্থ না বলো, তবে বলি, আমি নিশ্চিতরূপেই ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি। *[সুরা ইউসুফ ১২:৯৪]*

ইবনে কাসির রহ. বলেন, যখন মিসর থেকে যাত্রীদল বের হলো, তখন ইয়াকুব আ. ছিলেন ফিলিস্তিনে। দীর্ঘ বছর পর হযরত ইয়াকুব আ. তাঁর ছেলে ইউসুফ

আ.-এর ঘ্রাণ পেলেন। তিনি ভয় পেলেন, যদি অন্যরা এটিকে বৃদ্ধ বয়সের দুর্বলতা বা অতি ভালোবাসায় কথন না বলে বসে। মূলত সুঘ্রাণ অলৌকিকভাবে বহুদূর থেকেই স্থানান্তরিত হয়েছিল।

ঘ্রাণ দ্বারা শহীদকে সনাক্ত করা

মাওলানা আরসালান আমাকে বলেন, এক গভীর রাতের অন্ধকারে শহীদ আবুল বাশিরের শরীর থেকে ঘ্রাণ অনুভব করেই তার মৃত শরীর চিহ্নিত করেছিলাম।

দুই মাইলের অধিক দূরত্ব থেকে শহীদের ঘ্রাণ অনুভূত হওয়া

জালালুদ্দীন অথবা ইবরাহিম আমাকে বলেছেন, আমি আমার গাড়ি চালাচ্ছিলাম। হঠাৎ দূর থেকে এক ব্যতিক্রমী ঘ্রাণ পাচ্ছিলাম। আমার কাছে উপস্থিত সঙ্গীকে বললাম, নিশ্চয় এটি একটি শহীদের শরীর থেকে নির্গত হচ্ছে। যদিও শহীদের শরীরের রক্তের স্বাতন্ত্র্য একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যা দেখে বোঝা যায়। আমরা এতে নিশ্চিত ছিলাম না যে সে কি যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়েছিল, না এই পথে কোনো দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিল।

এক শহীদের মায়ের হাতে আতরের ঘ্রাণ তিন মাস পর্যন্ত ছিল

নাসরুল্লাহ মানসুর আমাকে বলেন, আমার ভাই এক যুদ্ধে শহীদ হন। তার শাহাদাতের তিন মাস পর আমার মা তাকে স্বপ্নে দেখেন। স্বপ্নে সে মাকে বলল, আমার সব ক্ষত শুকিয়ে গেছে। শুধু মাথার একটি ক্ষত এখনো রয়ে গেছে। আমার মা বুঝতে পারলেন, নিশ্চয় তার কবর উন্মুক্ত হয়ে গেছে। আমরা তার কবরের কাছে গিয়ে দেখলাম, কবরের উপরিভাগ কিছুটা খুলে গেছে। যখন আমরা কবরটি ধীরে ধীরে মাটি সরিয়ে খুঁড়ছিলাম, তখন কবর থেকে উদ্‌গত তীব্র ঘ্রাণ আমাদের বিমোহিত ও মাতাল করে তুলছিল। আমরা দেখতে পেলাম তার মাথার ক্ষত দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। আমার মা সেই রক্তে হাত রাখলেন, রক্ত থেকেও ঘ্রাণ বের হচ্ছিল। পুনরায় তার কবরটি সুন্দর করে মাটি দ্বারা ভরাট করলাম। এভাবে তিন মাস পার হওয়ার পরও আমার মায়ের হাতের আঙুলে ঘ্রাণ বিদ্যমান ছিল। এখনো সেই সুঘ্রাণের হালকা আবেশ রয়ে গেছে।

মুহাম্মদ শিরিন আমাকে বলেন, বুতওয়ারদাক নামক এক স্থানে আমাদের মধ্যকার চারজন মুজাহিদ শহীদ হন। সেখানেই তাদের দাফন করা হয়। চার

মাস অতিবাহিত হওয়ার পরও তাদের কবর থেকে ঘ্রাণ অনুভূত হয়।

মুহাম্মদ শিরিন আমাকে বলেন, আমি আবদুল গিয়াসকে তার মৃত্যুর তিন দিন পরে দেখেছি। সে পায়ের ওপর ভর দিয়ে বসা ছিল। দূর থেকে আমি ধারণা করলাম, হয়তো সে জীবিত আছে। যখন আমি তার নিকটবর্তী হলাম এবং স্পর্শ করলাম, সে একপাশে কাত হয়ে পড়ে গেল।

শহীদের অস্ত্র দিতে বাধা দেওয়া

জুবায়ের মীর আমাকে বলেন, লোগার শহরে আমাদের সাথে থাকা অবস্থায় মীর আগা শহীদ হন। তার সঙ্গে একটি রিভালবার ছিল। শহীদ হওয়ার পরও হাত দিয়ে রিভালবার আঁকড়ে ধরেছিলেন। মুজাহিদরা বিভিন্নভাবে রিভালবারটি হাত থেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করেছেন; কিন্তু সম্ভব হয়নি। অবশেষে যখন তাকে তার পরিবারের কাছে সমর্পণ করা হয়, তার বাবা কাজি মীর সুলতান তাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হে আমার পুত্র, এই রিভালবার এখন আর তোমার অধিকারভুক্ত নয়, মুজাহিদদের উপকারের জন্য দিয়ে দাও।' তৎক্ষণাৎ তার হাত থেকে রিভালবারটি নিচে পড়ে যায়।

জুবায়ের মীর আমাকে আরো বলেন, ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাস। লোগার শহরে সুলতান মুহাম্মদ শহীদ হন। তার হাতে ছিল একটি একে-৪৭ রাইফেল। শত্রুরা (রাশিয়ান বাহিনী) তার হাত থেকে অস্ত্রটি নিতে অনেক চেষ্টা করল; কিন্তু সক্ষম হল না। পরিশেষে শহীদের হাত কেটে অস্ত্রটি নিয়ে গেল।

শহীদের মুখে হাসি

আরসালান আমাকে বলেন, আব্দুল জলিল নামে খুবই ধার্মিক একজন ছাত্র ছিল। যুদ্ধের ময়দানে থাকাকালে অতর্কিতে একটি গুলি তাকে আঘাত করে এবং সে শহীদ হয়ে যায়। জানাজার নামাজ আদায়ের পর (কেননা হানাফি মাজহাব অনুযায়ী শহীদদের জানাজ পড়া হয়) তাকে পরিবারের কাছে অর্পণ করা হয়। তখন ছিল পড়ন্ত বিকেল। অন্ধকার ঘনিয়ে আসায় কবর দেওয়ার জন্য সকালের অপেক্ষা করা হয়। তার লাশের পাশে উপবিষ্ট অনেক মুজাহিদ লক্ষ করে দেখেছে, সে চোখ খুলেছে ও হেসেছে। মুজাহিদরা এ অবস্থা দেখে মাওলানা আরসালানের কাছে ব্যক্ত করেন, সে মারা যায়নি। তিনি বললেন, অবশ্যই সে শহীদ হয়েছে। মুজাহিদরা ওই ঘটনা ব্যক্ত করে পীড়াপীড়ি করতে লাগল যে, মৃত্যু নিশ্চিত না হয়ে কবর দেয়া জায়েজ হবে না এবং জনাজা নামাজ পুনরায়

পড়তে হবে। আরসালান দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, অবশ্যই সে গতকাল শহীদ হয়েছে এবং এটি হলো তার কারামত।

শহীদ হামিদুল্লাহর হাসি

বাগমান প্রদেশের সিপাহসালার মুহাম্মদ ওমর আমাকে বলেন, আমাদের সঙ্গে থাকা অবস্থায় হামিদুল্লাহ নামক এক মুজাহিদ শহীদ হন। তাকে দাফন করার সময় আমি দেখলাম, তিনি হাসছেন। আমি চিন্তা করলাম, হয়তো ভুল দেখছি বা কল্পনা আমাকে ঘিরে রেখেছে। কবরের কাছ থেকে ওপরে উঠে এসে আমি ভালোভাবে চোখ ধৌত করলাম। পুনরায় কবরের কাছে গিয়ে তাকে আগের মতোই দেখলাম।

জালালুদ্দিন হক্কানির অধীনস্ত প্রবীণ সিপাহসালার ফাতহুল্লাহ আমাকে বলেন, আমি সোহবত খান নামক এক শহীদকে দাফনের চার দিন পরে দেখেছি, যখন তার কবর উন্মুক্ত করা হয়, সে হাসছিল। তিনি বলেন, আমি ভালোভাবে লক্ষ করে দেখলাম, সে আমার দিকে চেয়ে আছে।

শহীদের শরীর বিকৃত হয় না

মাওলানা আবদুল করিম আমাকে বলেন, আমি ১২০০-এর অধিক শহীদের মৃতদেহ দেখেছি, যার মধ্যে কারো শরীর সামান্যতমও বিকৃত হয়নি। একজন শহীদও এমন পাইনি, যার মৃত শরীর কোনো হিংস্র কুকুর স্পর্শ করেছে। অথচ একই ময়দানে হিংস্র কুকুরের প্রধান উপজীব্য ছিল শত্রুবাহিনীর মৃত শরীর।

ফাতহুল্লাহ আমাকে বলেন, হাকিম নামক আমার এক সহযোদ্ধা আমাকে বলেছেন, আমরা শহীদ তামির খানকে দাফনের সাত মাস পর কবর হতে উত্তোলন করি। কিন্তু এত দিনের ব্যবধানেও তার শরীর সামান্যতম বিকৃত হয়নি। এমনকি তস্থানগুলো হতেও রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিল, যার থেকে মেশকের ঘ্রাণ অনুভূত হচ্ছিল।

জিদরান এলাকার জালালুদ্দিন আমাকে বলেন, আমি এমন কোনো শহীদকে দেখিনি যার শরীর কোনো কুকুর ভক্ষণ করেছে। আমি জালাব নামে এক শহীদের ব্যাপারে শপথ করে বলতে পারি, শত্রুবাহিনীর মৃতদেহের মাঝে তারও মৃতদেহ পড়ে ছিল প্রায় ২৫ দিন ধরে। হিংস্র কুকুর বিভিন্ন মৃতদেহ থেকে ভক্ষণ করেছে; কিন্তু ওই শহীদের শরীর ছিল পরিপূর্ণ অবিকৃত অবস্থায়।

শহীদি মাতার স্তন্যপায়ী শহীদ সন্তান

মুজাহিদ ইয়ুরদাল ও তার সহকারী মুহাম্মদ করিম আমাকে বলেন, একজন মহিলা ও তাঁর দুগ্ধপোষ্য মেয়ে উভয়ই শহীদ হন। মহিলার স্বামীর নাম ছিল মিনজাল। লোকজন অনেকে চেষ্টা করেছে মায়ের শরীর থেকে সন্তানকে পৃথক করার; কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। হানাফি মাজহাব মতে, একান্ত প্রয়োজন ছাড়া একই কবরে দুজনকে দাফন করা জায়েজ নেই। এই শহীদ জননীর পরিবারবর্গ অপারগতাবশত দুজনকে একই কবরে দাফন করেন।

মুজাহিদদের দোয়া ও আল্লাহ তায়ালার সাহায্য

জাগতু শহরের অধিবাসী মুজাহিদ ইয়ুরদাল আমাকে বলেন, একদা আমাদের ও শত্রুবাহিনীর মধ্যে সাত দিন ধরে তুমুল যুদ্ধ হয়। সপ্তম দিনে আমাদের গোলা-বারুদ শেষ হয়ে যায়। সেই রাতে শত্রুবাহিনী আমাদের চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলে। আগুন জ্বালানোর মতো কোনো উপাদানও আমাদের কাছে ছিল না।

হঠাৎ চারদিক থেকে কাফেরদের ওপর বৃষ্টির ফোঁটার মতো বোমা ও গুলি আপতিত হতে থাকে, যা ছিল তাদের কল্পনারও বাইরে। এতে শত্রুবাহিনীর ৫০০-এর অধিক সৈন্য নিহত হয়, যার মধ্যে ২৩ জন ছিল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। স্বল্পসংখ্যক সৈন্য বেঁচে ছিল। তারা একপর্যায়ে মুসলিম নেতাদের জিজ্ঞেস করল, মুজাহিদরা এই প্রকারের অস্ত্র কোথায় পেল, যা আমরা (রুশ বাহিনী) কোনো দিন দেখিইনি?

পাথর থেকে পানির ঝর্ণা

বাগমান প্রদেশের সাইদুর রহমান আমাকে বলেন, ওয়াইজান পর্বতে অবস্থানকালে আমরা অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত ছিলাম। তীব্র পিপাসা আমাদের নিস্তেজ করে ফেললো। ফলে আমরা সামনে অগ্রসর হতে পারলাম না। আমরা কিছু মেষপালককে জিজ্ঞেস করলাম, এখানে কোনো পানির ব্যবস্থা আছে কি? তারা বলল, এ পর্বতে পানির কোনো ব্যবস্থা নেই। আমরা মহান আল্লাহর কাছে দোয়া শুরু করলাম। হঠাৎ পানিভর্তি একটি শিলাখণ্ড আমাদের কাছে পতিত হলো। আমরা সবাই সেখান থেকে তৃপ্তিসহকারে পানি পান করলাম। সংখ্যায় আমরা ছিলাম ৪৫ জন মুজাহিদ।

বাইয়াল মুহাম্মদ (যিনি জালালুদ্দীন হক্কানির আত্মীয়) আমাকে বলেন, আমরা

ছিলাম সংখ্যায় ৬০ জন। এক স্থানে ২০ জন, অন্য এক স্থানে ৪০ জন। শত্রুরা ছিল প্রায় ১৩০০-এর অধিক। তারা ভারী অস্ত্র ও গোলা-বারুদে সজ্জিত ছিল। ইতিমধ্যে আমি কুরআনের সেই আয়াত দ্বারা আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া শুরু করলাম। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ

আপনি যখন বালু-মুষ্ঠি নিক্ষেপ করেছিলেন, তখন তা আপনি নিক্ষেপ করেননি, বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন মহান আল্লাহ। *[আনফাল ৮:১৭]*

[বদর যুদ্ধের সময় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেরদের উদ্দেশে এক মুষ্ঠি বালি নিক্ষেপ করেছিলেন। মহান আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক কাফেরের চোখে তা পৌঁছে দেন।]

আমিও এক মুষ্ঠি নুড়িপাথর হাতে নিলাম এবং ওই আয়াত পড়ে তাতে ফুঁৎকার দিয়ে বললাম, আল্লাহ শত্রুবাহিনীর চেহারাগুলোকে বিকৃত করে দাও এবং তাদের অস্ত্রসমূহ ধ্বংস করে দাও। এ দোয়া করতে করতে আবেগ ও অশ্রুতে আমার বাক রুদ্ধ হয়ে গেল। তখন ছিল জোহরের নামাজের সময়। প্রথম ট্যাংকটি আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল। সামান্য বুলেটের আঘাতেই ট্যাংক ব্রিজের ওপর থেকে অনেক নিচে পতিত হলো। যখন ট্যাংক থেকে মাইন ছোড়ার প্রস্তুতি চলছিল তখন একজন মুজাহিদ ট্যাংকটিকে লক্ষ করে ছোট একটি বোমা নিক্ষেপ করল।

প্রচণ্ড আওয়াজে ট্যাংকটি ধ্বংস হয়ে গেল। পরবর্তী ট্যাংকটিও সামনে অগ্রসর হতেই আগুন ধরে যায়। এভাবে মুজাহিদরা তাদেরকে পরাস্ত করতে করতে একেবারে ঘিরে ফেলে। একপর্যায়ে তারা আত্মসমর্পণ করে। এই যুদ্ধে আমাদের অনেক অস্ত্র গনিমত হিসেবে প্রাপ্ত হয়।

এগুলোর মধ্যে ছিল– একটি দোসাখা, সাতটি মর্টার লাথড, ১৯টি মধ্যম ধরনের মর্টার, ১২টি গ্রেনেড, ২৬০০টি একে-৪৭ রাইফেল, সাতটি ৮২ রকেট, ২৬ হাজার রাউন্ড গুলি ও ২৮টি অস্ত্রবাহী গাড়ি। এ ছাড়া অনেক অস্ত্র বহন করতে না পারায় সেগুলো ধ্বংস করে দিই।

আবদুর রহমান (বাতুয়ার যুদ্ধের একজন নেতা) আমাকে বলেন, ৮০০ অথবা ১২০০ সৈন্যবিশিষ্ট শত্রুবাহিনী আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, যাতে তাদের ছিল ৫৮টি ট্যাংক ও অনেক অস্ত্রবাহী গাড়ি। অথচ আমরা ছিলাম মাত্র ৩০ জন মুজাহিদ।

তিন দিন ধরে অবিরত যুদ্ধ চলতে থাকে। তৃতীয় দিন আমাদের কাছে মাত্র তিন রাউন্ড গুলি অবশিষ্ট থাকে। আসরের সময় আমরা একত্র হয়ে পরামর্শ করলাম, শত্রুবাহিনীকে পরাজিত করতে আমরা সক্ষম নই। নামাজের পরে আমরা দোয়া করলাম। নামাজ শেষে শত্রুবাহিনীর অস্ত্রবাহী গাড়িকে উদ্দেশ্য করে গুলি নিক্ষেপ করলাম। গাড়িটি সব উপাদানসহ প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হলো। এতে শত্রুবাহিনী ভীত হয়ে এদিক-সেদিক পলায়ন করল, আর অল্প কিছুসংখ্যক সৈন্য আত্মসমর্পণ করল। এতে মুজাহিদরা পাঁচটি ট্যাংক, ৩০টি অস্ত্রবাহী গাড়ি, ১৬টি মিসাইল ও বিপুলসংখ্যক একে-৪৭ রাইফেল প্রাপ্ত হলো। মহান আল্লাহ তায়ালার এটি ছিল অসীম কুদরতের নিদর্শন।

অনুর্বর ভূমি থেকে পানির নির্গমন

অনেক আগফান অধিবাসী পাকিস্তান সীমান্তের কাছে অনুর্বর ভূমিতে সাময়িকভাবে বসবাস শুরু করে। মহান আল্লাহ তায়ালার কুদরতে সেখানেও পানির সুব্যবস্থা হয়ে যায়। ধীরে ধীরে ওই জনপদগুলো বসবাসের উপযোগী হয়ে ওঠে। চারদিক শস্যশ্যামলে ঝলমল করতে থাকে। কিন্তু পাকিস্তানিদের লোভাতুর দৃষ্টি সেই উপত্যকার প্রতি পড়ে। তারা সেই ভূমি থেকে আফগানদের জোরপূর্বক বিতাড়িত করল। সেই শস্যশ্যামল প্রান্তর পুনরায় বিরানভূমিতে পরিণত হয়ে গেল।

কুয়াশার কাণ্ড

জালালুদ্দীন হক্কানি আমাকে বলেন, যখন রাশিয়ান বাহিনীর আক্রমণ আমাদের ওপর তীব্রতর হলো, সে সময় আমরা বিভিন্ন পাহাড়-পর্বতে অবস্থান করতাম। রাশিয়ান বাহিনী বিভিন্ন গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছিল মুজাহিদদের সংবাদ পাওয়ার জন্য। সে কারণে আমরা পাহাড়ের ওপর আগুন জ্বালাতে পারতাম না, যদি গোয়েন্দারা অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যায়। কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালার কৃপার পরিক্রমায় বছরের অধিকাংশ সময় ঘন কুয়াশার দ্বারা পাহাড় ছেয়ে থাকত। ফলে আগুনের ধোঁয় দৃষ্টিগোচর হতো না।

শহীদদের পরিবারের সুরক্ষা

জালালুদ্দীন হক্কানি আমাকে বলেন, রাশিয়ান বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধের সময় সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষিত হলো, যারা আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে তাদের পরিবারকে সমূলে হত্যা করা হোক। আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতে যেসব পরিবার মুজাহিদদের সঙ্গে অবস্থান করত বা মুজাহিদদের পরিবারগুলো সেখানে একত্রে অবস্থান করত, শত্রুরা বিন্দুমাত্র তাদের তি করতে পারেনি। শুধু যেসব শহীদদের পরিবার অন্যত্র হিজরত করেছে, তারা বিভিন্ন ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

মেঘের দ্বারা মুজাহিদদের সুরক্ষা

মুহাম্মদ ইয়াসির আমাকে বলেন, একবার শত্রুবাহিনীর অনেক বিমান পাহাড়ের এক উন্মুক্ত স্থানে মুজাহিদদের ওপর আক্রমণ করে, যেখানে লুকানোর কোনো ব্যবস্থা ছিল না। আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে বিনয়ের সঙ্গে দোয়া করতে শুরু করলাম। হঠাৎ কালো বর্ণের মেঘ যুদ্ধের ময়দানকে ঘিরে ফেলল এবং বাতাসে প্রচণ্ড ধুলা নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল। এতে সব মুজাহিদ নিরাপদ স্থানে অবস্থান গ্রহণ করল।

আবদুল করিম আমাকে বর্ণনা করেন, শত্রুবাহিনীর দুটি ট্যাংক আমাদের নিকটবর্তী হয়ে আক্রমণ শুরু করল। তারা আমাদের জীবিত অবস্থায় বন্দি করার চেষ্টা করল। আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া শুরু করলাম। হঠাৎ তীব্র বাতাসে ধুলা উড়ে চারপাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেল। মহান আল্লাহ তায়ালার রহমতে আমরা রক্ষা পেলাম।

শত্রুবাহিনীর ট্যাংক ধ্বংস করা

কাজী আবু তাহের বাদগাইসী আমাকে বলেন, আমরা ছিলাম সংখ্যায় ৩০০ জন মুজাহিদ, আর অস্ত্র বলতে ছিল মাত্র ১৫টি রাইফেল। শত্রুপক্ষ ৪০টি ট্যাংক ও বিপুলসংখ্যক পদাতিক বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করল। একপর্যায়ে শত্রুবাহিনী পরাস্ত হলো। মাত্র দুটি ট্যাংক ব্যতীত সব ট্যাংক ধ্বংস হয়ে গেল। শত্রুবাহিনীর কিছু সদস্যকে আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কিভাবে তারা পরাজিত হলো? তারা বলল, ভারী অস্ত্র ও বিপুল পরিমাণ গোলা-বারুদ আমাদের ওপর নিক্ষেপ করা হয়। কাজী আবু তাহের শপথ করে বলেন, ট্যাংক ধ্বংস করার মতো কোনো অস্ত্র বা গোলা-বারুদ আমাদের কাছে ছিল না, সবই আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ।

শরীয়তের দৃষ্টিতে জিহাদের হুকুম

মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে জিহাদের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও বিধানের বিষয়ে আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। সামান্য কিছু নমুনা নিচে উপস্থাপন করা হলো। মহান রাব্বুল আলামিন বলেন–

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

তোমরা অভিযানে বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জেহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার। *[তাওবা ৯:৪১]*

আল্লাহ তায়ালা অন্যত্র ইরশাদ করেন–

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

যাঁরা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জেহাদ করেছে, আল্লাহর কাছে তাদের জন্য রয়েছে উচ্চস্তরের মর্যাদা এবং তারাই সফলকাম। *[তাওবা ৯:২০]*

মহান আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন–

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

আর লড়াই করো আল্লাহর জন্য তাদের সঙ্গে, যারা লড়াই করে তোমাদের সঙ্গে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না। *[বাকারাহ ২:১৯০]*

শরীয়তের আলোকে জিহাদের হুকুম বর্ণনা করতে লেখক এখানে বিভিন্ন দলিল ও মতামত উল্লেখ করেছেন। যার সারসংক্ষেপ হলো–

স্বাভাবিক শান্তি বজায় রেখে প্রত্যেক মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য জিহাদ ফরজে কিফায়াহ। সর্বাবস্থায় কাফেরদের কাছে ইসলামী দাওয়াতি জিহাদের মিশন

চালিয়ে যেতে হবে, যাতে ভবিষ্যতের জন্য সহায়ক একটি অবস্থান তৈরি করা যায়। এ জন্য প্রত্যেক মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য আবশ্যক যে তারা একদল মুজাহিদকে পার্শ্ববর্তী কাফের দেশগুলোতে প্রেরণ করে দাওয়াতি কার্যক্রম চালিয়ে যাবে। যদি তারা মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর আওতাভুক্ত হয়ে বসবাস করে এবং দাওয়াত পাওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে তাদের কাছ থেকে জিজিয়া কর (ট্যাক্স) আদায় করতে হবে।

জিজিয়া হলো মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমদের বসবাসের নিরাপত্তা কর প্রদান। যদি তারা এই জিজিয়া দিতেও অস্বীকার করে, তবে এ অবস্থায় ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদ করা ফরজ।

বর্তমান সময় পর্যন্ত এমন একটি মুসলিম দেশ খুঁজে পাওয়া যাবে না, যাতে জিহাদের এই স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। মুসলিম উম্মাহর নৈতিকতা চরমভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং তাদের অবস্থান নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শ থেকে বহুদূর। এ জন্য আমাদের আত্মশুদ্ধি অর্জন করে সঠিক জিহাদের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে।

যদি কাফেররা কোনো মুসলিম রাষ্ট্রকে আক্রমণ করে, তবে তাদের প্রতিরোধের জন্য জিহাদ ফরজ। এই প্রকারের জিহাদকে প্রতিরোধমূলক জিহাদ বলা হয়।

জিহাদ ফরজ হলে সর্বপ্রথম ব্যবহার হবে সেই দেশের সেনাবাহিনী, যাদের প্রতিরার কাজে নিয়োজিত করা হয়েছে। যদি সৈন্যরা শত্রুবাহিনীকে প্রতিরোধ করতে অক্ষম হয়ে যায়, তবে সেই দেশের সব সুস্থ পুরুষের ওপর সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে জিহাদ করা ফরজ। যদি তারাও ব্যর্থ হয়, তাহলে দেশের সর্বস্তরের নাগরিকের ওপর জিহাদে অংশগ্রহণ করা ফরজে আইন। এর মধ্যে মহিলাগণ এবং সেই সব কিশোররাও অন্তর্ভুক্ত, যারা প্রাপ্তবয়স্ক না হলেও যুদ্ধের জন্য শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী। ফকিহগণ বর্ণনা করেন, এ অবস্থায় কোনো স্ত্রী যদি জিহাদে গমন করে, অথচ তার স্বামী অনুমতি দেয়নি, তবু ওই মহিলার কোনো গুনাহ হবে না। অনুরূপভাবে মা-বাবার অনুমতি ব্যতীতও বাচ্চারা জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

যদি রাষ্ট্রের সব নাগরিক শত্রুবাহিনীকে পরাস্ত করতে ব্যর্থ হয় অথবা তাদের আরো সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তবে পার্শ্ববর্তী সকল মুসলিমের ওপর আবশ্যক তাদের সাহায্য করা। এতেও যদি শত্রুবাহিনী পরাজিত না হয় তবে চারদিকের সব নিকটবর্তী মুসলিমদের ওপর আক্রান্ত মুসলিমদের সাহায্য করা আবশ্যক হয়ে যায়। এভাবে পৃথিবীর সব মুসলিম জাতির জন্য আহত মুসলিম জাতিকে সাহায্য করা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে যায়।

কয়েক লাইনে আফগান জিহাদের বাস্তবতা

আফগান মুজাহিদদের অন্তরে তীব্র কামনা-বাসনা আর আবেগ ছিল যে এই দেশটি একটি শান্তির দেশে পরিণত হবে। একটি প্রকৃত ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের উজ্জ্বল সম্ভাবনা ছিল, যেখানে সমুন্নত ছিল মহান আল্লাহ তায়ালার নাম আর শরিয়তের সব বিধানের পূর্ণ বাস্তবায়ন। আমি (লেখক) অনেক আহত মুসলিম ভাইয়ের কাছে এই প্রশ্ন করেছি, যারা হাসপাতালের বিছানায় যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিল, যাদের মধ্যে ১২ বছরের তারুণ্যদীপ্ত অসংখ্য কিশোর ছিল, ছিল ১০৪ বছরের নাম না-জানা বৃদ্ধও। কেন তারা এত ত্যাগ স্বীকার করছে? তারা সবাই একই সুরে সুর মিলিয়ে উত্তর দিল– একমাত্র আশা, এখানে আল্লাহর বিধান কায়েম হবে আর আফগান হবে পরিপূর্ণ একটি ইসলামী রাষ্ট্র। আমিও তাদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বললাম, হ্যাঁ, এটিই সুবর্ণ সুযোগ আল্লাহর বিধান পৃথিবীতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার।

যারা জিহাদের বাস্তবতা সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখেন, তারা বুঝবেন জিহাদের জন্য একটি সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করা খুবই কঠিন। মানুষের কাপুরুষসুলভ মনোভাব সম্পর্কে কুরআন ব্যক্ত করেছে–

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ
أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ
قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ
فَتِيلًا ۝ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن
تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ
مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَمَالِ هَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ
حَدِيثًا ۝

অতঃপর যখন তাদের প্রতি জেহাদের নির্দেশ দেয়া হল, তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ভ করল, যেমন করে ভয় করা হয় আল্লাহকে। এমন কি তার চেয়েও অধিক ভয়। আর বলতে লাগল, হায় পারনকর্তা, কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হলো! আমাদেরকে কেন আরও কিছুকাল অবকাশ দান করলে না! (হে রাসূল!)

> তাদেরকে বলে দিন, পার্থিব ফায়দা সীমিত। আর আখেরাত পরহেযগারদের জন্য উত্তম। আর তোমাদের অধিকার একটি সুতা পরিমাণও খর্ব করা হবে না। তোমরা যেখানেই থাক না কেন; মৃত্যু কিন্তু তোমাদেরকে পাকড়াও করবেই– যদি তোমরা সুদৃঢ় দুর্গের ভেতরেও অবস্থান কর, তবুও। বস্তুতঃ তাদের কোন কল্যাণ সাধিত হলে তারা বলে যে, এটা সাধিত হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হয়, তবে বলে, এটা হয়েছে তোমার পক্ষ থেকে, বলে দাও, এসবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। এ কওমের কী হল যে, এরা কোনো কথা বুঝতে চেষ্টা করে না। *[নিসা ৪:৭৭-৭৮]*

উল্লেখিত আয়াতগুলো মক্কায় অবতীর্ণ হয়। এটা সেই সময়ের কথা যখন মুসলিমরা শুধু নামাজ ও জাকাতের বিষয়ে আদিষ্ট ছিল। কিছুদিন পর তারা আত্মশুদ্ধি বিষয়ে আদেশপ্রাপ্ত হয়, জিহাদ তখনো ফরজ হয়নি। তথাপি কিছু মুসলিমের হৃদয়ে মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধের প্রেরণা তৈরি হয়। অতঃপর মদিনায় জিহাদ্ ফরজ করা হয়, তখনো দুর্বল ঈমানের মুসলিমরা শত্রুকে ভয় করতে থাকে, অথচ মুসলিমরা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকেই ভয় করবে।

কোথায় আপনি লক্ষাধিক যুবক পাবেন, যারা আল্লাহর জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত, যাদের অন্তর জিহাদের অপার আগ্রহে আন্দোলিত? কোথায় আপনি এমন একটি পরিপূর্ণ সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত পাবেন, যাদের সহযোগিতার জন্য সামান্য অর্থও বরাদ্দ নেই? কোথায় আপনি আত্মোৎসর্গকারী ব্যক্তি পাবেন, যাদের প্রতিদান পাওয়ার আশা শুধু পারলৌকিক জীবনে? একটি দেশেই উপরিউক্ত সব কিছুই পাওয়া যাবে, সেটি আফগানিস্তান।

আমি পূর্ববর্তী ইসলামী সোনালি যুগের মুসলিমদের দুনিয়াবিমুখ জীবন-যাপনের ইতিহাস পড়েছি, বস্তুত আমি স্বচক্ষে বর্তমানে তার কিছুটা নমুনাও দেখেছি। আমি উস্তাদ সাইয়াফের বাড়ি দেখেছি, যেখানে তিনি বসবাস করেন। বাড়ির কাঠামো ছিল মাটির তৈরি আর মেঝেতে বিছানো ছিল শুধু বালি। মেহমানদের জন্য বাড়ির সম্মুখ আঙিনায় একটি তাঁবু বিছানো ছিল, যা তিনি ১১/১২ ডলার দিয়ে কিনেছিলেন। আমাদের পূর্বপুরুষদের দানের অনেক বিস্ময়কর ইতিহাস শুনেছি; কিন্তু আমি সাক্ষ্য দিতে পারি যে, আফগানিরা তাদের বিপুল পরিমাণ ছাগল ও ভেড়ার পালকে বিক্রি করেছিল খুবই সস্তা দামে, শুধু জিহাদের জন্য কিছু গোলা-বারুদ সংগ্রহ করার জন্য। আফগান জিহাদের সূচনায় এক রাউন্ড গুলির মূল্য ছিল ৩ ডলার। একজন মুজাহিদ তার পালের ৬০০টি ভেড়াকে বিক্রি

করেছিল মাত্র পদাতিক অস্ত্র কিনতে, যার বাজার বিক্রি মূল্য ৬০০ কুয়েতি দিনার।

একদা আরব ভূমির কিছু তরুণ যুবক বিস্ময়ের সঙ্গে আমাকে বলল, আমরা দেখেছি, পাকিস্তানের কুকুররা রুটি খাচ্ছে? অথচ আমাদের দেশের কুকুররা না রুটি খায়, না ভাত; বরং তাদের একমাত্র খাবার হলো গোশত।

আপনি আরো আশ্চর্যবোধ করবেন, যদি আপনি দেখেন প্রতি বৃহস্পতিবার এক স্তূপ ভাত আর গোশত মরুভূমির গভীরে আবর্জনার স্থানে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। আমি যুবকদের বললাম, যেখানে মানুষ জাতি এক টুকরো রুটিও সংগ্রহ করতে পারে না, এমনকি আফগান মুজাহিদরা কখনো কখনো ক্ষুধার তীব্র যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পাহাড়ের চূড়ায় কোনো গাছের তিক্ত ফলও সংগ্রহ করতে পারেনি। প্রায় আট হাজার সদস্যের একটি সৈন্যদল দুই মাস ধরে পাহাড়ের গাছপালার ফল ভক্ষণ করে জিহাদ পরিচালনা করেছে, তাদের না ছিল থাকার কোনো সুন্দর ব্যবস্থাপনা, না ছিল খাবারের পর্যাপ্ততা। বর্তমান বিশ্বের সব মুসলিমের জন্য এই নিষ্ঠুর বাস্তবতা উপলব্ধি করা একান্ত আবশ্যক।

আমার এ বইটি রচনাকালে আফগান যুদ্ধের কিছু নমুনা

১. আফগানযুদ্ধে সহযোগিতার জন্য বহির্বিশ্বের কোনো মুসলিম ডাক্তার উপস্থিত ছিল না, শুধু ১০ জন আফগানি ডাক্তার ছিল। প্রায় এক হাজার সৈন্যবাহিনীর জন্য এই সংখ্যা গণনা করাই অপ্রতুল। অপরদিকে শত্রুবাহিনীর সামগ্রিক সাহায্যের জন্য মৌমাছির ঝাঁকের মতো আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলো ভিড় করেছিল এবং আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি ও বিদেশ থেকে ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল পাঠানো হয়েছিল।

২. আফগানযুদ্ধের সঠিক চিত্র তুলে ধরার জন্য একজন মুসলিম সাংবাদিকও উপস্থিত ছিলেন না। অপরদিকে পশ্চিমা সাংবাদিক আর সংবাদ চ্যানেলগুলোর সার্বণিক দৃষ্টি ছিল শত্রুবাহিনীর সংবাদ পরিবেশনের ওপর।

৩. উত্তপ্ত মরুভূমির বালিরাশি আর বন্ধুর গিরিপথ পাড়ি দেওয়ার মতো যথেষ্ট জুতার ব্যবস্থাও মুজাহিদদের ছিল না। তারা একে অন্যের সঙ্গে বিনিময় করে জুতা ব্যবহার করত।

৪. ওমর ক্যাম্পে প্রায় তিন মাস ধরে প্রচণ্ড শীতে চার হাজার মুজাহিদ অবস্থান করে; কিন্তু তাদের জন্য না ছিল একটি তাঁবু বা একটি কম্বল। যখন শায়েখ নাসির-উর রাশেদ (সৌদি রেড ক্রিসেন্টের কোষাধ্যক্ষ) মুজাহিদদের এই দুর্দশা

অবলোকন করলেন, তখন ব্যক্তিগত টাকা দিয়ে এক হাজার তাঁবু ও কম্বল ক্রয় করে মুজাহিদদের উৎসর্গ করেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম প্রতিদান দিন। অনুরূপভাবে হযরত আবু বকর সিদ্দিক ক্যাম্পে শীতের অধিকাংশ সময় প্রায় ২৫০০ মুজাহিদ একত্রে পার করেন। তাদেরও না ছিল একটি তাঁবু, না ছিল একটি প্রশস্ত কম্বল।

৫. জুতাবিহীন নগ্ন পা নিয়ে বরফের ওপর ভর দিয়ে চলাচলের কারণে অনেক মুজাহিদের পায়ের পাতাগুলো ফেটে চৌচির হয়ে রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল। যখন বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার জুতার মূল্য ছিল পাকিস্তানি রুপির ১০০ রুপি। অথচ মুজাহিদদের সংখ্যা প্রায় এক লাখ। প্রত্যেকের জন্য যদি একটি জুতা ক্রয় করতে হয়, তবে ১০০ মিলিয়ন রুপি লাগবে। যে জুতার স্থায়িত্ব মাত্র একটি যুদ্ধের অভিযান।

৬. মুহাম্মদ সিদ্দিক (যিনি কাবুল শহরের একজন নেতা ছিলেন) আমাকে বর্ণনা করেন, আমি একজন মাকে দেখলাম, যিনি বরফের ওপর দিয়ে দুগ্ধপোষ্য সন্তান নিয়ে খালি পায়ে হেঁটে যাচ্ছেন, পা দিয়ে রক্তের বিন্দুকণা গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে, বরফের ওপর দিয়ে চলার মতো একটি পোষ্য প্রাণীরও তিনি ব্যবস্থা করতে পারেননি।

৭. আফগান জিহাদে মুজাহিদদের সংখ্যা শত্রুবাহিনীর তুলনায় এতটাই অপ্রতুল ছিল যে, গণনা করা যেত। অপরদিকে শত্রুবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল ধারণাতীত। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জাপান, জার্মান প্রভৃতি দেশ থেকে যুদ্ধের সরঞ্জামে তারা সজ্জিত হয়ে আফগান ভূমিতে পদার্পণ করেছে।

[যখন বইটি রচিত হয় তখন বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে অনেক মুসলিম আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে। এমনকি আরব ভূমির অনেক সাধারণ মানুষও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।]

লেখক কর্তৃক সাধারণ মুসলমানদের প্রতি সদয় নিবেদন

১. প্রত্যেক মুসলিম পরিবার তাদের মাসিক খরচ থেকে এক দিনের খরচ বাঁচিয়ে আফগান ভাইদের সহযোগিতা করবেন।

২. অনেক মুসলিম প্রমোদ ভ্রমণের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে গমন করেন। তাঁদের প্রতি আহ্বান, আপনারা আফগান ভূমিতে আসুন। দেখে যান মুসলিম ভাইদের সংগ্রামপূর্ণ জীবন। তাদের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করুন।

৩. মুসলিম ডাক্তারদের প্রতি অনুরোধ, বছরের কিছু সময় যেন আফগান

ভাইদের জন্য বরাদ্দ করেন, যাতে তাঁরা উপযুক্ত সেবা নিতে পারেন। এই অনুরোধ (বই লেখা পর্যন্ত) শুধু আফগান ভাইদের জন্যই নয়; বরং কাশ্মীর, বসনিয়া, চেসনিয়া, বার্মা প্রভৃতি দেশের নির্যাতিত মুসলিমদের জন্যও। তাই আল্লাহ তায়াল ইরশাদ করেন–

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ.

> এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্যে, যার অনুধাবন করার মত অন্তর রয়েছে। অথবা সে নিবিষ্ট মনে শ্রবণ করে। *[সূরা ক্বাফ ৫০:৩৭]*

পশ্চিমা বিশ্ব আফগানিস্তানে তাদের যুদ্ধ পরিচালনার জন্য গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৪০ থেকে ৬০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে। অন্য এক তথ্যমতে ৭০ মিলিয়ন ডলার। ফলে পশ্চিমা বিশ্ব আজ অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। তারা ভেবেছিল, আফগান পৃথিবীর মধ্যে একটি ছোট ও দুর্বল জাতি। আমাদের সুপ্রিম পাওয়ার দ্বারা অচিরেই তাদের পদপৃষ্ঠ করব; কিন্তু আজও তা তাদের জন্য কল্পনাই রয়ে গেছে।

একজন তারুণ্যদীপ্ত যুবক, যিনি ১৪০৩ হিজরির রমজান ও শাওয়াল মাস যুদ্ধের ময়দানে অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি আমাকে বলেন, 'আমি দেখতে পাচ্ছি আফগান ভূমিতে অচিরেই আল্লাহ তায়ালার সাহায্য নেমে আসবে।'

তিনি আরো বলেন, 'মুজাহিদরা যখন কাবুল শহরের কেন্দ্রীয় ক্যাম্প ইয়াকদুর আক্রমণ করে, আমিও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমরা ছিলাম ১২০ জন মুজাহিদ। একটি হেলিকপ্টার আমাদের আক্রমণ করে বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ করে।

আমরা অসহায় হয়ে শাহাদাতের প্রতীক্ষা করছিলাম আর অপোয় ছিলাম মৃত্যুর সঙ্গে আন্তরিক সাক্ষাতের। ইতিমধ্যে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য অবতীর্ণ হয় এবং আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করি। যুদ্ধের ফলাফল হলো, তিনটি ট্যাংক ধ্বংস হয়, ১৮ জন রাশিয়ান অফিসার ও সৈন্য মারা যায়, ১৩ জন আফগানি শত্রু মারা যায় ও ২০ জন আহত হয়। আল্লাহর অসীম রহমতে আমাদের কেউই নিহত বা আহত হয়নি।'

কাবুল শহরের পক্ষ থেকে একটি সরকারি ঘোষণাপত্র মুহাম্মদ সিদ্দিক তাসখারির কাছে পৌঁছানো হয়, যাতে উল্লেখ ছিল– 'আপনারা কাবুলের ওপর সর্বপ্রকার আক্রমণ বন্ধ করুন, বিনিময়ে আপনাদের জন্য প্রয়োজনীয় খাবার, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি উপকরণের ব্যবস্থা সরকার করবে।'

সরকারি ঘোষণার প্রতিলিপিতে তিনি উত্তর প্রদান করেন, আমি আপনার সব প্রতিশ্রুতি মেনে নেব। শর্ত হলো, আপনাদের প্রচলিত ধর্মনিরপে মতবাদ বর্জন করে ইসলামের আদর্শে অনুপ্রবেশ করতে হবে।

১৪০৩ হিজরি সালের শাওয়াল মাসে তৎকালীন আফগান মন্ত্রীপরিষদ একটি চুক্তিপত্র আলহাজ মুহাম্মদ ওমরের (বাঘমান উপজাতির নেতা) কাছে পাঠায়। এতে উল্লেখ ছিল, আমরা মহান আল্লাহর নামে আপনার কাছে মিনতি করছি, মুসলিমদের রক্ত ঝরানো থেকে আপনারা বিরত থাকুন।

হে আল্লাহ! আপনার কী অপার কুদরত, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী তো আল্লাহর নামে প্রার্থনা করছে। আলহাজ মোহাম্মাদ ওমর প্রতিউত্তরে বলেন, 'আমরা মুজাহিদদের সম্মানিত আমির উস্তাদ সাইয়াফের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে সবিনয় মিনতি জানাচ্ছি যে, আফগানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা অস্ত্র সংবরণ করব না। এর আগে কোনো পরে সঙ্গে আলোচনা বা মতবিনিময় করাও সম্ভব নয়।' এই পত্র পৌঁছানোর দুই দিন পরই রাশিয়ান বাহিনী তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে মুজাহিদদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। আল্লাহর রহমতে মুজাহিদরা এই যুদ্ধেও জয়লাভ করেন। ফলাফল, শত্রুবাহিনীর ৪০টি ট্যাংক ও তিনটি যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়, প্রায় ৫০০ সৈন্য মারা যায়। অন্যদিকে মুজাহিদদের মাত্র ২০০ জন সৈন্য শহীদ হন।

কথা প্রসঙ্গে কিছু মুসলিম ভাই আমাকে জিজ্ঞেস করেন, আফগান জিহাদের কি কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে? আমার উত্তর ছিল ঠিক সেটাই, যেটা উস্তাদ সাইয়াফ দিয়েছেন। তিনি বলেন, জিহাদের জন্য প্রয়োজন অর্থের আর মানুষের জন্য প্রয়োজন জিহাদের।

আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এমন কিছু অলৌকিক গুণাবলি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, যাদের আছে দৃঢ় সাহস, উত্তম কথা ব্যক্ত করার যোগ্যতা, আর বাস্তবতার নিরিখে সব বিষয় পর্যালোচনা করার অসম্ভব ক্ষমতা। যুগে যুগে যত বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে, তার পেছনে ছিল এক ব্যক্তির ঐকান্তিক ইচ্ছা, চেষ্টা, পরিশ্রম এবং যার মধ্যে ওই গুণাবলিরও প্রকাশ ঘটত। এভাবেই পৃথিবীতে আদর্শ সমুন্নত হয়। ইতিহাসের পাতায় পাতায় যাদের বর্ণিল কর্মময় জীবনী লিপিবদ্ধ আছে।

আমার এক সম্মানিত উস্তাদ আমাকে বলেন, 'অচিরেই আমি তুর্কিস্তানে সফর করব, সেখানে বিদ্যমান পূর্ববর্তী যুগের খেলাফতের কিছু নিদর্শন দেখার জন্য।' আমি বললাম, 'আপনি কেন পেশওয়ারে সফর করছেন না ওই ব্যক্তিদের দেখার জন্য, যারা বর্তমান সময়ে খেলাফত প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সদা লিপ্ত আছেন?'

কিন্তু আফসোস, মুসলিমরা ইসলামের বর্তমান দাবি উপলব্ধি করতে পারছে না এবং বর্তমান মুসলিমদের এই তীব্র আর্তনাদকে নিজেদের মনের মণিকোঠায় স্থান দিতেও সক্ষম হচ্ছে না। একদিকে বহু মুসলিম দুনিয়াতে দীর্ঘ হায়াত লাভ করে সম্পদের প্রাচুর্যের সঙ্গে থাকার স্বপ্ন দেখে, আবার ঠিক বিপরীতে কত মুসলিম শাহাদাতের তামান্নায় সকাল-সন্ধ্যায় মহান আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে দোয়া করে।

আমি কিছু পাকিস্তানি ভাইয়ের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলাম– 'আরব বিশ্ব থেকে কতজন শায়েখ এই পেশওয়ারে আগমন করেন এই বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য যে, আফগান মুজাহিদদের ওপর যে নির্যাতন আর অমানবিক অত্যাচার করা হচ্ছে তা অন্যায়?' তারা বলেন, এ প্রশ্নের উত্তর হবে হতাশাপূর্ণ!

পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কর্মশালা অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে উদ্দেশ করে আমি বলেছিলাম, 'কেন আপনারা মুসলিমদের দুর্দশা পর্যবেক্ষণের জন্য পেশওয়ারে সফর করছেন না?' উত্তরে অনেকেই সময়ের অপ্রতুলতার কথা বলেন। আমি বললাম, 'মুসলিমদের এই ক্রান্তিলগ্নে পেশওয়ার পরিদর্শন না করে ইসলামাবাদ ত্যাগ করা হবে শরীয়তের দৃষ্টিতে আপনাদের জন্য অন্যায়।'

আমার এই সাময়িক সময়ের আলোচনা তাদের বাধ্য করেছে দুর্দশাগ্রস্ত এই মুসলিম জনপদকে সামান্য সময়ের জন্য হলেও কিছুটা পর্যবেক্ষণ করা।

অনেকেই বলেছেন, ইতিমধ্যে অনুষ্ঠান শেষে তার বেলা ডান নামক এক স্থান পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি বললাম, সকলের জন্য উচিত অন্য স্থান নির্বাচন করা, যেখানে থাকবে না কোনো উঁচু উঁচু দালানকোঠা, ভরপুর উন্নত খাবারের ব্যবস্থা। থাকবে না চারদিকে অসংখ্য মানুষের পাহারার ব্যবস্থা। যদি সম্ভব হয় তবে এমন একটি স্থানে পরিদর্শনের ব্যবস্থা করেন, যেখানে মাটি ও পাথরের মাঝে ছোট একটি গর্তে মুজাহিদদের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটানো যায়। যাদের খাবার হলো পুরনো শুষ্ক রুটি বা সামান্য কিছু মিষ্ট পানি, যাদের চারপাশে রাশিয়ান বাহিনীর হিংস্র ও লোলুপ দৃষ্টি ছাড়া আর কোনো পাহারার ব্যবস্থা নেই। যে বাহিনীর পদতলে প্রতিনিয়ত হাজার হাজার মুসলিম নারী, পুরুষ ও শিশু পিঁপড়ার মতো পদপিষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

কেননা হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:
لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.

> হযরত আনাস রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয় আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল অথবা একটি বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া এবং তাতে যা কিছু আছে সেসব থেকে উত্তম। *[বুখারি শরীফ ৩৯৬/১]*

অন্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে–

> عَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَنَازِلِ.
>
> হযরত উসমান ইবনে আফফান রা. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত অবস্থায় একরাত পাহারায় নিয়োজিত থাকা বাড়িতে হাজার রাত ইবাদতে নিয়োজিত থাকা অপেক্ষা উত্তম। *[বুখারি ও মুসলিম]*

অন্য একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে–

> عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ.
>
> হযরত আবু মুসা রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয় জান্নাতের প্রবেশ দ্বার তলোয়ারের ছায়ার নিচে। *[সহিহ মুসলিম শরিফ, হাদীস নং ১৯০২]*

যদি কোনো মুসলিমের জিহাদে গমনের শরয়ী সামর্থ্য না থাকে, তবে তার এ নিয়ত থাকা আবশ্যক যে, আল্লাহ তায়ালা যদি তাওফিক দান করেন তবে অবশ্যই আমি সর্বাত্মকভাবে তাদের সহযোগিতা করব; হয়তো অর্থের দ্বারা, নতুবা কলমের দ্বারা কিংবা বুদ্ধির দ্বারা ইত্যাদি। তাই হাদিসে বর্ণিত হয়েছে–

> যে ব্যক্তি একান্তচিত্তে আল্লাহর কাছে শাহাদাত কামনা করে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তার দোয়া কবুল করবেন, যদিও ঘরে বসেই তার মৃত্যু হয়।

জ্ঞানসম্পন্ন ও বিবেকবান ব্যক্তিমাত্রই এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারেন যে, প্রত্যেক মুসলিমের নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী জিহাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সর্বাত্মক

সহযোগিতা করা উচিত। কারণ আল্লাহ তায়ালা মানুষের উপরে সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো বোঝা চাপিয়ে দেন না। আফগানিস্তানের বিষয়টি ফিলিস্তিনের সমস্যার বিপরীত নয়। মূলত উভয় দেশের সমস্যাটি একই অর্থাৎ শত্রুবাহিনীর প্রধান মিশনই হলো মুসলিম রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট করে ইসলামী বিধান কায়েমের সব সম্ভাবনাকে নির্মূল করা। আমাদের চেষ্টার পাশাপাশি মহান আল্লাহ তায়ালার সাহায্যের প্রতি আমরা অপেক্ষমাণ।

মুসলমানদের জন্য উচিত নয় যে তারা শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করবে বা হতাশাগ্রস্ত হবে। আল্লাহ তায়ালাও মানুষের জন্য হতাশাগ্রস্ত হতে নিষেধ করেছেন; বরং মুসলিমরা যেখানেই যাবে, যতই বাধার সম্মুখীন হবে, যতই বিপদের ঘূর্ণিপাকে তারা আবর্তিত হবে, ততই তাদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসা ও শাহাদাতের অপরিসীম তামান্না আরো বদ্ধমূল হবে। যদি পৃথিবীর সবাই আমাদের বিপক্ষে অবস্থান নেয় এবং আমরা আল্লাহ তায়ালার সাহায্যের আশাও পরিত্যাগ করি, তবে প্রথমে যেভাবে ফিলিস্তিনের পরিণতি হয়েছে সেরূপই দ্বিতীয় পরিণতি আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আদর্শে পাওয়া যায়। যখন মক্কার কাফেররা ইসলামী দাওয়াতের চরম বিরোধীতা শুরু করল এবং দাওয়াত প্রচার নিষিদ্ধ করে দাওয়াত গ্রহণকারীদের মক্কা থেকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করল, তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দাওয়াতি মিশনকে আরো বৃদ্ধি করলেন। সাহাবায়ে কেরামকে আবিসিনিয়ায় পাঠালেন, নিজে তায়েফে গমন করলেন, এভাবে একপর্যায়ে তিনি হিযরতও করলেন। সর্বশেষে মদীনায় আল্লাহ তায়ালা ইসলামকে সর্বদিক দিয়ে শক্তিশালী করলেন। সেখানে তিনি এক শক্তিশালী মুসলিম জনগোষ্ঠী তৈরি করলেন এবং ইসলামের বাণীকে আরো সমুন্নত করার জন্য সাহাবায়ে কেরামকে সর্বাত্মক যোগ্যতাসম্পন্ন করে মক্কায় পাঠালেন, যা মাত্র আট বছরের মধ্যেই সম্ভব হয়েছিল। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কিয়ামত পর্যন্ত কাবাঘর থেকে সর্বপ্রকার মূর্তি অপসারণ করলেন।

আফগান জাতির কিছু ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য

১. আফগানযুদ্ধের মূল ভূমিকায় সর্বদা একজন আলেম বিদ্যমান থাকবেন, তার কথাই সব যুদ্ধের সামগ্রিক বিষয়ের ওপর প্রভাব রাখে।

২. আফগান জাতি প্রকৃতিগতভাবেই বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত মোকাবিলা করতে

সম। তারা কখনোই অন্যায়ের সাথে আপস করা পছন্দ করে না। ফলে আল্লাহর সাহায্যে তারা আলেকজান্দ্রিয়া, ব্রিটেন ইত্যাদি দেশকে পরাজিত করেছে। অনেক দেশই তাদের জয়ের পতাকা আফগান পাহাড়ে স্থাপন করতে চেষ্টা করেছে; কিন্তু সবাই বিফল হয়েছে। ব্রিটেন ১৯৮২ সালে ১২০০ সৈন্যসহ পরাজিত হলো, যাতে মাত্র একজন জীবিত ছিলেন, তিনি হলেন ডক্টর প্রিজন। পরবর্তী সময়ে তিনি এই যুদ্ধ সম্পর্কে পূর্ণ একটি বই রচনা করেন।

৩. আফগান জাতি সব আধুনিকতার ছোঁয়ামুক্ত প্রাচীন সভ্যতার বৈশিষ্ট্যসংবলিত একটি সাধারণ জাতি।

৪. আফগানিস্তানে একটি ছোট গির্জাও নেই বা কোনো মিশনারি কার্যক্রমও তথায় চালু নেই, যা অন্য কোনো মুসলিম দেশে বিরল।

ওস্তাদ সাইয়াফ বলেন, আমরা পৃথিবীর বুকে কোনো রাজত্ব বা সিংহাসন অর্জনের জন্য এক মুহূর্তও জিহাদে ব্যয় করি না; বরং ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থায় আল্লাহর বিধান মোতাবেক জীবন পরিচালনাই আমাদের উদ্দেশ্য।

কাজী মুহাম্মদ আমাকে বলেন, হাজার হাজার মুজাহিদ আমার চোখের সামনেই শাহাদাতবরণ করেছেন, যার মধ্যে আমার ভাই ও পুত্রও আছেন। এতে আমার বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই। যেমনটি আক্ষেপ ছিল একজন অফিসারের, যে অফিসার একটি ধনী দেশের প্রতি ইঙ্গিত করে তার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিল—'আমি যদি ওই দেশের রাস্তার ভিক্ষুক হতে পারতাম!'

রাশিয়ান বাহিনীর যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সকল প্রকার আর্থিক ও সামরিক সামর্থ্য বিদ্যমান রয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য হলো আরব সাগর পাড়ি দিয়ে ইরান ও পাকিস্তানের মাঝামাঝি অবস্থান করবে। যেহেতু রাশিয়ার বেশিরভাগ সমুদ্র বরফ আচ্ছাদিত থাকে, ফলে তার দেশে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী পৌছাতে গেলে বিনষ্ট হয়।

আর আরব সাগর দ্রুত পাড়ি দিয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করলেও সেখানে ঘাঁটি স্থাপন করলে আরব দেশ থেকে যে তেল আদান-প্রদান হয় তা তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। তারা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ তেলের খনির নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্যই মূলত আফগানিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে সেখানে তাদের ঘাঁটি স্থাপন করতে চেয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার ওয়াদাই সত্য। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন—

وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ○ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ۝

> আর তারা (কাফেররা) চক্রান্ত করে এবং আমিও কৌশল অবলম্বন করি এবং তারা তা জানে না। অতএব, দেখ তাদের চক্রান্তের পরিণাম, আমি অবশ্যই তাদেরকে এবং তাদের সম্প্রদায়কে নেস্তনাবুদ করে দিয়েছি। *[আন-নমল ২৭:৫০-৫১]*

এই আফগান জাতি সমগ্র পৃথিবীতে বিস্ময় সৃষ্টি করেছে। দারিদ্র্য, দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থা, আধুনিক প্রযুক্তির অপ্রতুলতা, বড় বড় অস্ত্রের সমাহার-বিবর্জিত একটি দেশ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ শক্তিকে পরাভূত করেছে। এটি যে মহান আল্লাহর অসীম রহমতের নিদর্শন এবং তার অপার অনুগ্রহের দান সেটি বলাই বাহুল্য।

আমি এখানে একটি ঘটনা বর্ণনা করতে চাই, যা আমাদের পূর্ববর্তীদের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। তাদের মুক্ত স্বাধীনতা, আল্লাহভীতি, তাওয়াক্কুল ও পৃথিবীর মাখলুকের ওপর তাদের প্রভাব বর্ণনা করবে। এরূপ অনেক ঘটনাই আছে। আমি শুধু একটি বর্ণনা করছি। এ ঘটনাটি মুসলিম নেতা নাজমুদ্দিনের। ঘটনার স্থান আফগানের সীমান্তবর্তী এলাকা, যার একপাশে চীন, রাশিয়া ও অন্য পাশে পাকিস্তান। আফগান জাতি রাজনৈতিক ও সামরিক বিষয়ে অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্রের তুলনায় অত্যন্ত মিতব্যয়ী, যেমনটি নয় আমেরিকা, রাশিয়া, চীন প্রভৃতি দেশ। এসব দেশ সুরক্ষার জন্য অ্যাটম বোমা, ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র, মিসাইল ইত্যাদি প্রস্তুত করেছে কোটি কোটি ডলার ব্যয় করে। যাই হোক, বলছিলাম কমান্ডার নাজমুদ্দিনের কথা। তিনি মাত্র ১৫০ মুজাহিদ নিয়ে রাশিয়ান বহরকে প্রতিরোধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এদের কাজ হলো, রাশিয়ান বাহিনীর মূল যাতায়াত রাস্তায় বাধা দেওয়া, যাতে তারা রসদ সরবরাহ করতে না পারে।

একপর্যায়ে রাশিয়ান বাহিনী তাদের অস্ত্রের সাঁজোয়া বাহনসহ মুজাহিদদের প্রতিরোধ করল কিন্তু আল্লাহ তায়ালা মুজাহিদদের সাহায্য করলেন। মুজাহিদরা পাঁচজন উচ্চপদস্থ রাশিয়ান অফিসারকে গ্রেপ্তার করলেন। রাশিয়ানরা নাজমুদ্দিনের কাছে বার্তা পাঠাল, 'আমাদের পাঁচজন অফিসারকে মুক্ত করো, বিনিময়ে তোমরা যা চাইবে তাই প্রদান করা হবে।'

নাজমুদ্দিন প্রতিউত্তরে বললেন, 'আমরা কারো গোলাম নই। একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই গোলামি করি।' দ্বিতীয় একটি বার্তায় রাশিয়ানরা জানালো, 'যদি তুমি এই পাঁচজন অফিসারকে মুক্ত না করো, তবে তোমাদের সব প্রদেশ, সব বৃদ্ধ নারী-পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করা হবে।'

তিনি বললেন, 'হে রাশিয়ান কুকুররা, তোমরা তো সন্ধি বা চুক্তির প্রতি সম্মান রাখতে পার না।'

রাশিয়ান বাহিনী তৃতীয় যে পত্রটি পাঠাল তাতে বিন্দু বিন্দু রক্তের ছাপ ছিল। পত্রে লেখা ছিল, 'যদি তাদের কোনো ক্ষতি হয়, আমরা সর্বাত্মক প্রতিশোধ নেব।' নাজমুদ্দিন বললেন, 'আমি তোমাদের চ্যালেঞ্জ করলাম এবং এই পাঁচজনকে হত্যার আদেশ দিলাম।' রাশিয়ানরা অত্যন্ত দুঃখ পেল। এহেন পরাজয়ে তারা অফিসারদের স্মরণের জন্য পাঁচজনের পাঁচটি মূর্তি স্থাপন করেছিল, যা তাদের সান্ত্বনা দিত।

এই আফগান জাতি দীর্ঘদিন ধরে মহান আল্লাহ তায়ালার বিধান কায়েমের জন্য জিহাদের ময়দানে সর্বাত্মক ভূমিকা পালন করছে। অথচ আমরা তাদের সহযোগিতার পরিবর্তে বিভিন্ন প্রকার স্বার্থসংবলিত দ্বন্দ্বে লিপ্ত। ফলে আমাদের থেকে আল্লাহর সাহায্য অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। বিষয়টি অতীব গুরুত্বের সঙ্গে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে।

তৃষ্ণার্ত মায়ের কান্নার রোল

নাসিরুল্লাহ আমাকে বলেন, একবার আফগানের এক পাহাড়ি অঞ্চলে আমরা কয়েকজন মুজাহিদ লুকিয়ে থেকে রুশ সৈন্যদের লক্ষ করছিলাম। চারদিকে অন্ধকার, ছোট ছোট কয়েকটি ঘর ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না। শুধু গোলা-বারুদ আর বোমার আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই কানে আসে না। হঠাৎ এক অসহায় নারীর চিৎকার আমাদের কানে আসে। আমরা চারদিকে লুকিয়ে লুকিয়ে খুঁজতে ছিলাম, কোন দিক থেকে আওয়াজ আসছে। তাকিয়ে দেখি আমাদের থেকে একটু দূরে এক নারী চিৎকার করছে আর বলছে, একটু পানি, একটু পানি! আমরা আস্তে আস্তে সামনে এগোনোর চেষ্টা করি। একটু কাছাকাছি যাওয়ার পর মেয়েটি আমাদের দেখতে পেয়ে বুঝতে পারল যে মুজাহিদ বাহিনী তার সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছে। সেও তখন এগিয়ে এসে বলল, গত সন্ধ্যায় তার বাড়িতে বোমা হামলায় সবাই নিহত হয়েছে। বেঁচে ছিল শুধু তার ১২ বছর বয়সী একটি মেয়ে ও সে। আজ কিছুক্ষণ আগে তার সামনে থেকে মেয়েটিকে ধরে নিয়ে গেছে। গতকাল থেকে এখন পর্যন্ত সে ও তার মেয়ে কিছুই খায়নি। এ কথা বলতে বলতেই হঠাৎ আমাদের মাঝে মেয়েটির ছিন্নভিন্ন দেহ এসে পড়ল উপর থেকে। আমাদের দেখে শত্রুবাহিনী গুলি ছুড়তে লাগল। আমরা মেয়েটিকে নিয়ে পেছনের দিকে ছুটতে লাগলাম। এরই মধ্যে একটি গুলি

এসে বোনটির শরীর ভেদ করে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আমরা তার পানির পিপাসা মেটাতে পারলাম না। খুব কষ্ট ও অনুশোচনা হচ্ছিল বোনটির জন্য। পরবর্তী সময়ে অবশ্য এ এলাকাটি আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। আল্লাহ, তুমি আমার এ বোনটিকে জান্নাত দান করো।

বইতে উল্লিখিত কারামতের গ্রহণযোগ্যতা

এ বইতে উল্লিখিত বিভিন্ন কারামত ও অলৌকিক বিষয়াবলি, যা আমি সামান্যই উল্লেখ করেছি। আমি ওই সব মুজাহিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি, যাদের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে। প্রথম আমার দৃষ্টি নিবদ্ধিত হয় মুহাম্মদ ইয়াসিরের প্রতি (যিনি উস্তাদ সাইয়াফের একজন বিশ্বস্ত সাহায্যকারী), হজের ময়দানে। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে আমার অবচেতন মন জাগ্রত হয় এবং আমি আশা করি ঐ ঘটনাবলি নিজেই অনুসন্ধান করার। যে বর্ণনাকারী নিজেই কোনো ঘটনা দেখেছে বা তথায় উপস্থিত ছিল, এরূপ উক্তি ব্যতীত কোনো কারামত আমি বর্ণনা করিনি। দুই অথবা তিনটি বর্ণনা এই নিয়মবহির্ভূত হতে পারে। আমি বর্ণনাকারীদের حدثني অর্থাৎ সরাসরি বর্ণনাকারীর নাম থেকে আমার কাছে বর্ণিত হয়েছে এরূপ সূত্রে ব্যবহার করেছি, যেমনটি হাদিস বর্ণনায় রাবিদের বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়।

উলামায়ে কেরামের মতামত

এই বইটি রচনায় সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম, তিনি শায়েখ আবদুল আজিজ বিন বাজ রহ.। আমার কানে এখনো তাঁর দরদপূর্ণ উক্তিটি ভেসে আসে। তিনি বলেছিলেন– 'এই ঘটনাসমূহ আমাদের সৌভাগ্যের কারণ হবে ইনশাআল্লাহ।'

আমি শায়েখ ওমর আল আসকারকে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন, 'সর্বপ্রথম মূল বিষয় হলো বর্ণনাকারীদের গ্রহণযোগ্যতা। যদি বর্ণনাকারীরা গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে এই ঘটনাপ্রবাহ প্রচার করা বা ব্যক্ত করতে আমাদের কোনোরূপ সমস্যা হবে না।

অনেক মিথ্যাবাদী ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী ও বস্তুবাদী চিন্তা লালনকারী ব্যক্তিরা এই ঘটনাসমূহকে উপহাসস্বরূপ গ্রহণ করবে এবং ইসলামের প্রতি ঘৃণা পোষণ করবে, যা সচরাচর হয়ে আসছে। এ জন্য আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ○

> হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না; তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না– তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখ হতেই বের হয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো অনেকগুণ বেশি জঘন্য। তোমাদের জন্যে নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও। *[আলে ইমরান ৩:১১৮]*

আমি মুসলিম ভাইদের মেরাজের ঘটনা স্মরণ করাতে চাই। যখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মেরাজ সম্পর্কে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে এর সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল, কাফেররা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করার জন্য অপকৌশলের চেষ্টা করছিল। তদ্রূপই এ বইটিতে বর্ণিত ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে তারা একই প্রকার উক্তি ও ধারণা পোষণ করবে। ইসলামবিদ্বেষীরা চিরকালই দীনের জ্যোতিকে নেভানোর হীনচক্রান্তে লিপ্ত থাকে। তবু আমি আশা করি, আল্লাহ তায়ালা এ বইটিকে কেয়ামতের ময়দানে নাজাতের অসিলা বানাবেন এবং আমার সব পাপ ও গুনাহকে মার্জনা করে দেবেন।

বইটি পাঠের পর প্রথম অভিব্যক্তি

আলহামদুলিল্লাহ, বইটি পাঠের পর মানুষ বিভিন্ন উৎসাহমূলক মন্তব্য করেছেন। আমি ইউরোপ, আমেরিকা ও আরব দেশ থেকে প্রচুর পরিমাণ ফোন পেয়েছি। তারা অনুমতি চাচ্ছিল নিজ নিজ ভাষায় বইটি প্রকাশের। আমি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য চিঠিও পেয়েছি। এ কথা অস্বীকারযোগ্য নয় যে, বইটি বর্তমান পৃথিবীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচিত এবং এর প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত ব্যাপক।

কিন্তু পাঠক ভাইয়েরা বইটিতে উল্লিখিত কিছু বিষয়ের প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। তারা বলেছেন, 'বইটিতে কিছু বিষয় এমনভাবে প্রকাশিত

হয়েছে, যার দ্বারা বোঝা যায়, আফগানই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আদর্শিক জাতি, যার সমতুল্য দ্বিতীয় কোনো জাতি নেই।'

আমার উত্তর হলো, তাদের মধ্যেই আফগান সর্বশ্রেষ্ঠ, যাদের অবস্থান এই জাতির মধ্যেই রয়েছে। বস্তুত কোনো জাতি বা ব্যক্তির পক্ষেই নিজেকে সব দোষ-ত্রুটির ঊর্ধ্বে মনে করা সম্ভব নয়।

প্রতিটি জাতিতেই কিছু ধর্মভীরু ব্যক্তি থাকবে, আবার এর বিপরীত গুণের অধিকারী খারাপ ব্যক্তিও থাকবে। কিছু থাকবে নেশাগ্রস্ত, ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতা হিসেবে আফগানিরা অধিকাংশ সৎ ও সাহসী এবং ধার্মিক। এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে আমি বিভিন্ন প্রদেশের নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছি, যারা বিপুলসংখ্যক মুজাহিদদের পথপ্রদর্শক।

১. বাংহাম প্রদেশের মুহাম্মদ ওমর, যিনি আট হাজার মুজাহিদের নেতা।

২. নাসিরাহ প্রদেশের মুহাম্মদ জান, যার সঙ্গে তিন হাজার ২০০ মুজাহিদ আছেন।

৩. মুহাম্মদ খালেদ ফারুকী, যাঁর তত্ত্বাবধানে ১৫ হাজার মুজাহিদ আছেন।

৪. মৌলবি হালিম, যাঁর তত্ত্বাবধানে ১১ হাজার মুজাহিদ আছেন।

উপরিউক্ত সব ব্যক্তিই এই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাঁদের মধ্যে এমন একজন ব্যক্তিও নেই, যাঁরা এক ওয়াক্ত নামাজ ছেড়ে দেন। শতকরা ৯০ জন জামায়াতের সঙ্গে নামাজ আদায় করেন। বিপুলসংখ্যক মানুষ নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করেন এবং দিনের বেলা নফল রোজা রাখেন।

বর্তমান পৃথিবীতে কি এমন কোনো জাতি আছে, যারা এরূপ নেক আমলের ব্যাপারে সক্ষম হতে পারে?

একজন মুজাহিদ আমাকে বর্ণনা করেন, আমাদের ছোট বাচ্চারাও এ বিষয়টি অবগত যে, কোন বিমানটি আমাদের ওপর বোমা নিক্ষেপ করবে আর কোনটি করবে না। যদি বিমানের চারদিকে পাখির উড্ডয়ন না হয়, তবে নিশ্চিত শত্রুরা বোমা নিক্ষেপ করবে না। আর যদি বিমানের সাথে পাখির উড্ডয়ন দেখা যায়, তবে অবশ্যই বোমা নিক্ষিপ্ত হবে। কেননা পাখিরা মুজাহিদদের সুরক্ষার জন্য বিমানের চারপাশে ওড়ে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

কারামত প্রকাশের এ ঘটনার দ্বারা উদ্দেশ্য এটি নয় যে, জিহাদের ময়দান থেকে মানুষ হটে যাবে; বরং জিহাদের কঠিন মুহূর্তে মুমিনের সাহায্যের জন্যই কারামত প্রকাশিত হয়। মুমিনের সর্বাত্মক শক্তি, সামর্থ্য ও যোগ্যতার পরিপূর্ণ প্রদর্শনের পরই মহান আল্লাহ তায়ালার সাহায্য আসে। যেমন আল কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ○ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ○ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ○

'অতঃপর যখন দুটি দল পরস্পরকে দেখল, তখন মুসার সঙ্গীরা বলল, আমরা তো ধরা পড়ে গেলাম! মুসা বলল, কখনোই নয়! আমার সঙ্গে আমার প্রতিপালক আছেন; সত্বর তিনি আমাকে পথ নির্দেশ করবেন। অতঃপর মুসার প্রতি ওহি অবতরণ করলাম– তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত করো। ফলে তা বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বত সদৃশ হয়ে গেল। *[আশ-শোআরা ২৬:৬১-৬৩]*

ইহা তখনই সংঘটিত হয়েছিল, যখন মুসা আ. পরিশ্রম করে সমুদ্রের তীরে পৌঁছেছিলেন, এরপর আল্লাহর সাহায্য এসেছে।

অতিগুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ের আলোচনা

জিহাদী জীবন হলো কঠোর শারীরিক শ্রম ও সাধনানির্ভর। এতে থাকে ঘাম ও রক্ত ঝরানো, কান্তিহীন সফর, দুর্বার গিরিপথ পারাপার, জীবনের আশঙ্কা এবং শত্রুর বিরুদ্ধে চৌকস পরিকল্পনা। জিহাদের ভিত্তিই তৈরি হয় মানুষের রক্ত ও লাশের ওপর দিয়ে, যেমন আলো জ্বালানোর ভিত্তি হলো তেল। মুজাহিদদের বিন্দু বিন্দু রক্তের ফোঁটা, শরীর হতে নির্গত ঘাম, দিনের পর দিন ক্ষুধা আর তৃষ্ণার অমানবিক নির্যাতন– এ সবই হলো জিহাদের প্রধান উপজীব্য। তাই আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ○

> তোমরা কি এই ধারণা করেছ যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদকারী এবং কে ধৈর্যশীল তা আল্লাহ পরীক্ষা করবেন না? *[আলে ইমরান ৩:১৪২]*

জিহাদ কোনোরূপ অলৌকিকতার ওপর ভিত্তিশীল নয়, তবে কঠিন মুহূর্তে কারামতরূপে আল্লাহর সাহায্য অতীর্ণ হয়ে থাকে। শায়েখ আবুল হাসান শাহসিনী রহ. বলেন, কারামত প্রকাশিত হওয়ার প্রতি অতিশয় লালায়িত ব্যক্তির দ্বারা কখনো কারামত প্রকাশ হবে না। অথবা মনের ইচ্ছা যখন হয় তখনো হবে না। কারামত তাদের জন্য হবে, যারা নিজেদের তুচ্ছ মনে করে আল্লাহর অস্তিত্বে বিলীন করে দেয়। নিজের কোনো আমলের যোগ্যতায় বা আত্মবিশ্বাসের দ্বারা নয়; বরং মহান আল্লাহর অনুগ্রহেই কারামত সংঘটিত হয়ে থাকে।

জিহাদে কোনোরূপ হতাশা, অপকৌশল ও ধৈর্যচ্যুতি থাকবে না। মুজাহিদদের জীবন সার্বক্ষণিক থাকে শঙ্কার মধ্যে, না জানি কখন শত্রুর বুলেটের আঘাত বক্ষকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। এই মানসিক অস্থিরতায় মাসের পর মাস অতিবাহিত হয়ে যায়। আবার এমনও সময় আসে, যখন দিনের মধ্যে তিনবার শত্রুর আক্রমণের মুখে পতিত হতে হয়। তাও আবার BM-12 ও BM-13-এর মতো মারণাস্ত্র দ্বারা, যার একটি মাত্র ট্রি-গারের চাপে ২৫টি মিসাইল ক্ষেপণাস্ত্র বের হয়ে আসে, যার একেকটির ওজন অর্ধ টন বা ৫০০ কেজি কিংবা তারও বেশি।

একজন মুজাহিদ দীর্ঘ পাঁচ বছর উপরোক্ত বাস্তব অবস্থা মোকাবিলা করেছেন। এ সময় আল্লাহর প্রতি নিজের জীবন সমর্পণ করাই ছিল তার দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা, তবু এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মাত্র একবার তার দ্বারা কারামত সংঘটিত হয়েছিল।

ওমর হানিফ আমাকে বলেন, 'আমরা এমন এক জাতি, যাদের জন্য জিহাদ অপরিহার্য; যেমন মাছের জন্য পানি অপরিহার্য।'

ডা. আবদুল কাদির আমাকে বলেন, আমি সাক্ষ্য দিতে পারি একজন মুজাহিদ ও একজন ডাক্তারের কথোপকথনের, যখন ডাক্তার প্যারালাইসিসের আশঙ্কায় মুজাহিদের ক্ষত পা কেটে ফেলে দিচ্ছিলেন। ওই মুজাহিদ তখন ডাক্তারকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, আপনি আমার পা-কে আগের মতো ফিরিয়ে দিন, যাতে আমি আফগান জিহাদে আবার অংশগ্রহণ করতে পারি।

আমি (লেখক) কখনোই ওই বৃদ্ধ ব্যক্তির অভিব্যক্তি ভুলতে পারবো না, যাকে বার্ধক্যের কারণে জিহাদে যেতে নিষেধ করা হয়েছিল। তিনি তখন বলেছিলেন,

'জিহাদে অংশগ্রহণ না করে পেশওয়ারে অবস্থান করা আমার জন্য গুনাহ।'

রণাঙ্গনের এক সিপাহসালার মৌলবি হালিম বলেন, 'যখন শত্রুবাহিনীর যুদ্ধবিমান থেকে আমাদের ওপর আক্রমণের প্রস্তুতি চলছিল, হঠাৎ বিমানের নিচে অসংখ্য পাখির ওড়াউড়ি শুরু হলো। আমি উপস্থিত মুজাহিদদেরকে বললাম, আল্লাহর সাহায্য এসে গেছে। আরেকবার আমাদের বিমান বিধ্বংসী কামান ZK-1 নষ্ট হয়ে যায়। আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করলাম। হঠাৎ আমাদের চারদিকে প্রচুর পরিমাণ মেঘের আচ্ছাদন দেখা গেল এবং আমরা বিমান আক্রমণ থেকে বেঁচে গেলাম।'

মুহাম্মদ দাউদ ছাইরাত (ওয়ারদাফ প্রদেশের নেতা) আমাকে বলেন, একবার শত্রুবাহিনীর সৈন্যরা চারদিক থেকে আমাদেরকে ঘিরে ফেলে এবং ওপর থেকেও আক্রমণের জন্য বিমান প্রস্তুত হয়। মুজাহিদদের সংখ্যা ব্যাপক থাকলেও শত্রুরা ছিল প্রায় ১০ হাজার। সঙ্গে ১০০-এর অধিক ট্যাংক। এই অসম যুদ্ধে অধিকাংশ মুজাহিদই শহীদ হয়ে যান। আমরা যে ২০ জন বেঁচে ছিলাম, তারাও মৃত্যুর ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম। একপর্যায়ে আরো ১১ জন শহীদ হয়ে যান, অবশিষ্ট ৯ জন ছিলাম ব্যাপকভাবে আহত। এভাবেই ক্ষুধা আর তৃষ্ণায় দুই দিন অতিবাহিত হয়ে যায়। তখন ছিল রমজান মাস। শত্রু সৈন্যরা আমাদেরকে জীবিত ধরার জন্য ট্যাংক নিয়ে অগ্রসর হলো। কাছাকাছি এলে আমরা সমস্বরে 'আল্লাহু আকবার' বলে উঠলাম। মনে হল যেন সমগ্র শহর থেকে তাকবিরের ধ্বনি ভেসে আসছে। এই তাকবিরের আওয়াজেই অনেকগুলো ট্যাংক ধ্বংস হয়ে যায়।

মুজাহিদরা এই যুদ্ধের ময়দানেও তালিম-তারবিয়াত বজায় রেখেছিল। দেখা গেছে, কোনো এক যুদ্ধের ময়দানে আট হাজার মাদ্রাসার ছাত্র উপস্থিত ছিল, যারা মুজাহিদদের তত্ত্বাবধানে উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করছিল। অনুরূপভাবে প্রতিটি জেলায়ই মুজাহিদদের তত্ত্বধানে পরিচালিত একটি করে মাদ্রাসা ও বিচার বিভাগ চালু ছিল। রাশিয়ানরা এ বিষয়টি অবগত ছিল যে এই আফগান জাতিকে পরাজিত করা বা নিশ্চিহ্ন করা খুব সহজসাধ্য হবে না।

উপসংহার

পরিশেষে সবার উদ্দেশে একটি শেষ নিবেদন করতে চাই, তারা যেনো নিজেদের দোয়ায় মুজাহিদদেরও স্মরণ করে। আল্লাহ তায়ালা যেন তাদের সব চেষ্টা, শ্রম ও মনের বাসনা পূর্ণ করেন, আমাদেরও তাঁর মনোনীত মত ও পথের ওপর অবিচল রাখেন।

যৌথবাহিনী কর্তৃক মুসলিম নারীদের ওপর পাশবিক নির্যাতন

সময় তখন পড়ন্ত বিকেল। ১৬ এপ্রিলের সেই বিকেলে কাবুল থেকে বহু দূরে অবস্থিত এই গ্রামটির মানুষের মনে আনন্দ বিরাজমান। ছোট শিশু থেকে শুরু করে অবালবৃদ্ধ পর্যন্ত সবার মাঝেই আনন্দের এক অপরিসীম আভা লেগে আছে। কারণ আজ মাগরিবের পর এক মুসলিম তরুণ ও তরুণীর বিবাহ সম্পন্ন হবে, যেখানে গ্রামবাসীর সাদর উপস্থিতি কাম্য। যথারীতি শরীয়তের বিধানে বিবাহ সম্পন্ন হলো। একে অন্যের সঙ্গে কুশল বিনিময়, মেহমানদারি সবই চলতে লাগল। রাত গভীর হতে কোলাহল কমে এল। রাত যখন গভীর, নববিবাহিত তরুণ-তরুণীর আন্তরিকতার উষ্ণ আহ্বান ও কথোপকথনের পরিবর্তে বধু তার স্বামীকে বলছে, আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে সিজদাবনত হয়ে দোয়া করি, তিনি যেনো ইসলামকে সমুন্নত করতে এই আফগানযুদ্ধে আপনাকে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে গাজি কিংবা শহীদ হয়ে ফিরে আসার তাওফিক দেন। এভাবেই আল্লাহ প্রেমে কেটে গেল তাদের বিনিদ্র রজনী।

যখন পূর্ব আকাশে নতুন দিনের সূচনার আভা দেখা গেল তখন চারদিক থেকে মহান আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদের আহ্বান শোনা যেতে লাগলো। নব বিবাহিত উমর ও তাঁর স্ত্রী মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করে ফজরের নামাজ শেষ করলেন। এবার বিদায়ের পালা। বাড়ির সামনে থেকে বিদায় নিয়ে উমর আল্লাহর রাস্তায় পুনরায় চলা শুরু করলেন। পেছনে ফিরে যতবার উঁকি দিল, ততবারই সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর অশ্রুসিক্ত নয়নযুগলের আহ্বান দেখতে পেল। তবু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এই পথ তাকে চলতেই হবে। দ্বিপ্রহরের সময় কাবুল পৌঁছে অন্য মুজাহিদদের সঙ্গে কাজ শুরু করে দিলেন। তাদের যাত্রা অনেক দূরের পথ। সন্ধ্যার আগেই তারা নিরাপদ এক স্থানে তাঁবু স্থাপন করলেন; কিন্তু খাবারের স্বল্পতা তাদের ভাবিয়ে তুলল। পরামর্শ হলো, আশপাশের এলাকা থেকে কিছু খাবার সংগ্রহ করতে হবে।

খাবার সংগ্রহের প্রতিনিধিদলে উমরকে আমিরের দায়িত্ব দেওয়া হলো। প্রতিনিধিদল যাত্রা করে সর্বপ্রথম বাড়িটিতে সালাম দিয়ে মৃদু আঘাত করল। এক বৃদ্ধ দরজা খুলে দিলেন। তার অবয়বে ছিল বার্ধক্যের ছাপ; কিন্তু চোখের চাহনি ছিল দুঃখের এক অপার সমুদ্রতুল্য। মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী চাই?' উমর বললেন, 'আমরা মুজাহিদ। সামান্য কিছু খাবারের প্রয়োজন ছিল।' উপস্থিত মুজাহিদের শরীরে ছিন্নভিন্ন পোশাক ও কোমল অবয়ব কঠিন হৃদয়ের মানুষটিকেও গলিয়ে দিল। বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, 'বাবা, আল্লাহ তায়ালা মক্কা

করুন, আমি তোমাদের খাবার দিতে পারছি না। মুজাহিদদের সাহায্য করার কারণে আমার অনেক বড় ক্ষতি হয়ে গেছে।' বলতে বলতে বৃদ্ধের দুই চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল।

উমর বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বললেন, 'কী হয়েছিল বলবেন কি?' বৃদ্ধ বললেন, আমার ছিল দুই ছেলে ও চার অবিবাহিত মেয়ে। বড় ছেলেটি আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে। তিন দিন আগে ২০-২৫ জনের যৌথবাহিনীর একটি দল আমার বাড়িতে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করে, কেন আমার সন্তানকে জিহাদে পাঠিয়েছি এবং কেন আমি আশপাশের মুজাহিদদের বিভিন্ন সময় আশ্রয় দেই? উত্তরে আমি নিশ্চুপ থাকি। তারা জোরপূর্বক আমার বাড়িতে প্রবেশ করে আমার চার মেয়েকে বাড়ির উঠানে এনে বেঁধে ফেলল। আমি বৃদ্ধ, তবু তাদের অফিসারের পা জড়িয়ে মিনতি করলাম– আমাকে যত পার শাস্তি দাও; কিন্তু আমার মেয়েদের ছেড়ে দাও। অফিসার কোনো উত্তর দেয়নি, শুধু পায়ের বুটের গোড়ালি দিয়ে বাঁ পাঁজরে সজোরে আঘাত করেছে। ছিটকে গিয়ে পড়লাম অনেক দূরে।

এরপর শুরু হলো তাদের পৈশাচিক নির্যাতন। এক সেনা আমাকে মাটি থেকে তুলে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিল। আমার বড় মেয়েটির সম্পূর্ণ শরীর আমার চোখের সামনেই উলঙ্গ করে দিল। আল্লাহ! বাবা কেমন করে এই নৃশংস দৃশ্য দেখতে পারে! প্রথমে মেয়েটির মাথার চুল কেটে দিল। মৃত হরিণের পতিত শরীর যেমন করে হায়েনারা টেনে-ছিঁড়ে খায়, যৌথবাহিনীর সেই অফিসার আমার মেয়েকে সেভাবে খাচ্ছিল। মেয়ের তীব্র চিৎকারে তখন আকাশ-বাতাস ভারী হচ্ছিল। একপর্যায়ে মেয়েটির দুই স্তন ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে ফেলল। আহ! ফিনকি দিয়ে রক্ত গড়িয়ে সর্বপ্রথম আমার মতো অধম বাবার শরীরে এসে পড়ল। এরপর দুই স্তনের মধ্যবর্তী অংশে ছুরি দিয়ে গোশত কাটার মতো কাটতে লাগল। আমার মেয়েটি মৃতপ্রায় মুরগির মতো ছটফট করছিল। এভাবে শরীরের বিভিন্ন স্থানে যন্ত্রণা দিচ্ছিল।

একসময় আমার মেয়েটি বেহুঁশ হয়ে পড়ে। সর্বশেষে মেয়েটির লজ্জাস্থান দিয়ে ছুরি প্রবেশ করিয়ে মেয়েটির লজ্জাস্থান কেটে ফেলে। আহ! বাবা হয়ে এমন দৃশ্য...তীব্র চিৎকার করতে করতে মেয়েটি আমার মারা যায়।

এরপর আমার দ্বিতীয় মেয়েটিকে আমার কাছে এনে বেঁধে ফেলে এবং তার শরীর থেকে সব কাপড় খুলে নিয়ে মাটিতে শুইয়ে দেয়। এক-এক করে প্রথমে অফিসার, পরে আরো সাতজন সেনা মেয়েটিকে আমার চোখের সামনে ধর্ষণ করে। একপর্যায়ে একজন এসে তার একটি স্তন কেটে আমার পায়ের কাছে

এনে বলে, এটাকে ফুটবলের মতো শ্যুট করে ওড়াতে। কিন্তু এটা কি কোনো বাবার পক্ষে সম্ভব, বলুন? না বললে আমার ওপর চলে পাশবিক নির্যাতন। এরপর মেয়েটির দ্বিতীয় স্তনও কেটে ফেলে। ওই সময় মেয়েটি শুধু একবার বাবা বলে চিৎকার দিল। এরপর জ্ঞান হারিয়ে ফেললে তার লজ্জাস্থান দিয়ে লম্বা একটি ছুরি ঢুকিয়ে বুকের কাছ দিয়ে বের করে। মুহূর্তের মধ্যে আমার চোখের সামনে দুটি মেয়েকে তারা নির্মমভাবে হত্যা কারার এ দৃশ্য দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। জ্ঞান ফেরার পর আমার বাকি দুজন মেয়েকে আর দেখতে পাইনি। সেনারা তাদের নিয়ে চলে গেছে, আজও তারা ফিরে আসেনি।

উমরসহ সব মুজাহিদের চোখ থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছিল। তাদের সর্বশরীরে এক প্রতিশোধের শিহরণ বয়ে গেল। উমর বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দিয়ে প্রতিশোধ নেওয়ার অঙ্গীকার করে দ্বিতীয় বাড়ির দিকে অগ্রসর হলেন। কিন্তু সেখানেও তারা ব্যর্থ হলেন। এভাবে ৯টি বাড়িতে তারা গেলন; কিন্তু সবাই সাহায্য করতে অপারগতা প্রকাশ করল। এবার উমর আবেগের বাহুল্যতায় দুই হাত তুলে চোখের পানি ফেলে মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে দোয়া করলেন– 'হে আল্লাহ, আমি তো নিজের জন্য খাবার-পানি চাইনি। আপনার পথের মুজাহিদদের জন্য সাহায্য চেয়েছি। সব কিছুর মালিক একমাত্র আপনি। সব সৃষ্টির রিজিক একমাত্র আপনার আয়ত্বাধীন।'

দোয়ার পর অনেক আশা নিয়ে ১০ নম্বর বাড়িতে আঘাত করে সালাম দিলেন। বাড়ির কর্তা মুজাহিদদের অবস্থা শুনে বললেন, কিভাবে আমরা শান্তির সঙ্গে রাত্রি যাপন করতে পারি, যেখানে আল্লাহর পথের মুজাহিদরা অভুক্ত থাকবেন? এ বাড়ি থেকে দেয়া কয়েক বস্তা খাদ্যদ্রব্য নিয়ে প্রতিনিধিদল মুজাহিদদের তাঁবুর দিকে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে দূরের এক বাড়ি থেকে কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ তারা বস্তাগুলো নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে রেখে সেই বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানে পৌছে তারা যা দেখলেন তা ছিল শ্বাসরুদ্ধকর। যৌথবাহিনীর ছয়-সাতজন সেনা এক অবলা সুন্দরী মুসলিম তরুণীকে হায়েনার মতো ছিঁড়ে খাচ্ছে। উমরসহ অন্যরা সেই পাপিষ্ঠ নরপিশাচদের প্রতিরোধ করতে এগিয়ে গেলেন। উমর হুংকার দিয়ে বললেন, 'আল্লাহু আকবার! তোরা মেয়েটিকে ছেড়ে দে, নতুবা তোদের সবাইকে আমরা হত্যা করব।' কথা বলতে বলতে উমর যখন তার রিভলবার তাক করবে, তখন হঠাৎ ঘন অন্ধকারের মধ্য থেকে একটি বুলেট এসে বিঁধল উমরের বাঁ পাঁজরে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার অপার রহমতে দৃঢ় হাতেই রিভলবার নিয়ে ট্রিগার টিপে এক পাপিষ্ঠ সেনার বুকের তাজা রক্ত ঝরিয়ে দিলেন। বাকি সৈন্যরা পালিয়ে গেল। যেহেতু তারা অন্য স্থানে অস্ত্র

রেখে এসেছিলেন, তাই শত্রুদেরকে তাড়া করতে পারলেন না।

উমর তার রক্তভেজা পা ও শরীর নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়তে এগিয়ে গেলেন মেয়েটির দিকে। নিজের শরীরের পোশাক খুলে জড়িয়ে দিলেন মেয়েটির শরীরে। অন্য মুজাহিদরা তার রক্তাক্ত ক্ষতস্থান বেঁধে দিলেন। উমর সর্বশক্তি দিয়ে ব্যথা সহ্য করে সবার সহযোগিতায় মুজাহিদদের ক্যাম্পে ফিরে এলেন।

উমরের শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণ রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। উপযুক্ত চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা সেখানে না থাকায় পরামর্শক্রমে উমরকে বাড়িতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হলো এবং তাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। স্ত্রীর সঙ্গে কৃত ওয়াদা তিনি পূরণ করার চেষ্টা করেছেন। তাই সবশেষে স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে শহীদি মৃত্যু লাভ করে চিরবিদায় গ্রহণ করেন।

ইরাকে যৌথবাহিনীর পৈশাচিকতা

শুধু আফগানিস্তান নয়; বরং পৃথিবীর প্রতিটি মুসলিম দেশেই চলছে যৌথবাহিনীর পৈশাচিক নির্যাতন আর মুসলমানদের সম্পদ লুণ্ঠন করে নিজেদের ভোগ-বিলাসে ব্যবহার করার প্রবণতা। কিছুদিন আগে The times পত্রিকায় যৌথ বাহিনীর অমানুষিক বর্বরতার আলোচনা উঠে এসেছে। প্রতি রাতে তারা বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে আক্রমণ করত এবং শিশু-নারী-পুরুষের ওপর অমানষিক অত্যাচার করত।

১৪ বছরের এক তরুণী, যার মাত্র কিছু দিন হলো বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে এবং সে ছিল গর্ভবতী। এক রাতে যৌথবাহিনীর ১০-১২ জন সেনা তাদের এলাকায় আক্রমণ করে। তারা বিভিন্ন বাড়ি থেকে জোরপূর্বক যেসব কুমারী মেয়েদের ধরে নিয়ে আসে, তাদের মধ্যে এই ১৪ বছরের গর্ভবতী মেয়েটিও ছিল। সেনারা মেয়েটিকে নিয়ে তার সম্পূর্ণ শরীর উলঙ্গ করে। সর্বপ্রথম হায়েনাগুলো তার পেটে এত জোরে আঘাত করে যে, মেয়েটি ব্যাথায় বেহুঁশ হয়ে যায়। তার লজ্জাস্থান দিয়ে রক্তরণ শুরু হয়ে যায়। তার গর্ভের সন্তান এত বেশি নড়াচড়া শুরু করে যে, মেয়েটির তীব্র চিৎকারে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। সেই সময় হায়েনার দল মেয়েটিকে বেঁধে পালাক্রমে রক্তের মধ্য দিয়েই নিজেদের স্বাদ উপভোগ করতে থাকে। আল্লাহ, একি নির্মম জীবনের অবস্থা! পরিশেষে গর্ভের সন্তানসহ মেয়েটিকে হত্যা করে তার শরীর ২২টি টুকরা করে কুকুর দ্বারা খাইয়ে দেয়।

যেই দেশের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন Human Rights এর মতো

সংস্থা বিশ্ব মানবতার কথা বলে, সেই দেশের সেনারা মানব সভ্যতার এই নির্মম পরিণতি ঘটাচ্ছে! এর দায়ভার কে বহন করবে? পত্রিকার পাতা আর বিশ্বব্যাপী নিউজ চ্যানেলগুলো খুললে দেখা যাবে বর্তমান যৌথবাহিনীর নির্মমতা। অনেক পত্রিকা বা চ্যানেল তাদের দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় ঘটনার যৎসামান্যই প্রচার হয় এবং বেশির ভাগই গোপন থাকে। কিন্তু প্রতিটি নির্মমতা আর অন্যায়ের প্রতিফলন সর্বদা হবেই। বর্তমান যৌথবাহিনীর প্রধান বিনোদন আর আনন্দ উপভোগের বস্তু হলো মুসলিম নারী আর শিশু। আল্লাহ তায়ালার একত্ববাদকে বুকে ধারণ করে জীবন-যাপনের কারণেই কি এই নির্যাতন, নাকি দুনিয়া থেকে চিরতরে ইসলামকে নিঃশেষ করাই তাদের মিশন? তাদের জেনে রাখা উচিত, ইসলাম থাকবে চিরউন্নত ও চিরস্থায়ী।

জিহাদের বিরুদ্ধে তথ্যসন্ত্রাস

আফগানিস্তানে ইসলামের এ মহান বিজয়, যা দ্বারা আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীর সব মুসলমানকে সম্মানিত করেছেন, সেটা খেলোয়াড়দের খেলার পুতুলে পরিণত হয়েছে এবং হলুদ সাংবাদিকতা ও মূর্খদের দ্বারা ঘৃণা ও বিকৃতির খপ্পরে পড়েছে। এ জিহাদকে নিয়ে যার যা ইচ্ছা বলে বেড়াচ্ছে। জিহাদের প্রতি এটা কোন ধরনের অবিচার? কোন বিষাক্ত খঞ্জর দিয়ে আমরা নিজেদের অজান্তে নিজেদের ওপর আঘাত করছি? না জেনে না বুঝে আমরা ইতিহাসকে কিভাবে বিকৃত করছি?

সাংবাদিকরা যা-ই লিখুন না কেন, এ জিহাদ নিঃসন্দেহে ইতিহাস পরিবর্তনের সূত্র বা পয়েন্ট হিসেবে বাকি থাকবে এবং আল্লাহর পথের যেসব সৈনিক মনজিলে মাকসুদে পৌঁছতে চায় তাদের কাছে একটি জীবন্ত আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হবে।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ

নিঃসন্দেহে এতে দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে *[আলে ইমরান ৩:১৩]*

বিংশ শতাব্দির মুজিজা

এই প্রথমবারের মতো একটি মুসলিম জনগোষ্ঠীর আফগানের কাছে লাল ফৌজের পরাজয় ও রাশিয়ার লাঞ্ছনাকর প্রস্থান ইসলামের পথে অন্ধকার অনুভবকারী লোকদের জন্য কয়েক শতক পর্যন্ত একটি আলোকস্তম্ভ হিসেবে

বাকি থাকবে। আফগান কমিউনিস্টদের সঙ্গে যুদ্ধে মুজাহিদরা পেরে উঠুক বা না উঠুক, রাশিয়ার আফগানিস্তান থেকে লাঞ্ছনাকর প্রত্যাবর্তন অবশ্যই বিগত দুই যুগের সবচেয়ে বড় ঘটনা ও বিংশ শতাব্দির মুজিজা। এ জিহাদ ও তার বিজয় নিয়ে মুসলিম উম্মাহর সব সদস্য গৌরব বোধ করবে। আমি নিশ্চিত, এ জিহাদ আফগানিস্তানে বাকি কমিউনিস্টদের এ ক্ষুদ্র দলের ওপরও বিজয় লাভ করবে। পরাশক্তি নামের যে হিংস্র পশুকে মানুষ ভয় করত, সে ভয়ের প্রাচীর আফগান জিহাদ চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে। আফগান জিহাদ প্রত্যেক মুসলমানকে অনিশ্চয়তা ও হতাশার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে এ আশার আলোর দিকে নিয়ে এসেছে যে, এই উম্মাহ যখনই তার দীনকে আকড়ে ধরবে, তখনই বিজয় তার পদচুম্বন করবে।

এ পর্যন্ত আফগানিস্তানের এ ঘটনা খ্রিস্টীয় শেষের তিন শতকের (১৮, ১৯, ২০) ইতিহাসের সবচেয়ে বড় পরিবর্তন বলে বিবেচিত হচ্ছে। এ ঘটনা এখন বিশ্ব কাঁপানো এক বিশাল বিস্ফোরণ হিসেবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অজ্ঞতায় রয়েছে মুসলমানরা। পশ্চিমারা কিন্তু ঠিকই ব্যাপারটা যথাযথ উপলব্ধি করেছে।

তাই রাশিয়া চলে যাওয়ার পর থেকে তারা তাদের মিডিয়াকে দুটি কাজ সম্পাদনে নিয়োজিত রেখেছে। প্রথম কাজ মুসলমানদের মধ্যে এ জিহাদের নেতৃবৃন্দ ও ব্যক্তিবর্গের চরিত্র হনন ও তাদের প্রভাবকে খাটো করা, যাতে পৃথিবীতে এ দীনকে বিজয়ী করতে যারা ইচ্ছুক, তাদের চলার পথে এ জিহাদ উজ্জ্বল আদর্শ হিসেবে বাকি না থাকে। রাশিয়া চলে যাওয়ার পর থেকে আফগানদের মধ্যে পূর্ণ গোত্র ও আঞ্চলিকতার বিভেদ উসকে দেওয়া ও জিহাদের চিত্র বিকৃতকরণ ছাড়া পাশ্চাত্য মিডিয়ার আর কোনো কাজ নেই।

শহীদের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মর্যাদাবলি

হযরত মিকদাম বিন মাদিকারিব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سَبْعُ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُحَلَّى حُلَّةَ الإِيمَانِ، وَيُزَوَّجُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الأَكْبَرِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا،

وَيَشْفَعُ فِي سَبْعِينَ إِنْسَانًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ.

আল্লাহ তায়ালার কাছে শহীদের বিশেষ সাতটি মর্যাদা রয়েছে। যথা– ১. তাঁর রক্তের প্রথম বিন্দু মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার পাপরাশি ক্ষমা করে দেওয়া হয়। ২. সে তাঁর জান্নাতের ঠিকানা দেখা অবস্থায় পৃথিবী ত্যাগ করে। ৩. তাঁর গায়ে ঈমানি পোশাক পরিয়ে দেওয়া হয়। ৪. ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট ৭২ জন হুরের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হবে। ৫. কিয়ামত দিবসের কঠিন বিভীষিকা থেকে সে নিরাপদ থাকবে। ৬. তাঁর মাথায় সম্মানের মুকুট পরিধান করানো হবে, যার একটি ইয়াকুত পাথর দুনিয়া ও এর মধ্যে বিদ্যমান সব কিছু থেকে অধিক মূল্যবান। তাঁর স্বপক্ষে পরিবারের ৭০ জন মানুষের সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। *[আহমদ, তিরমিজি]*

বিষাক্ত এক কালনাগিনী ব্রিটেন

সর্বশক্তিমান মহান রাব্বুল আলামিন তাঁর পবিত্র কালামে ঘোষণা করেন যে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ○ هَا أَنْتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○ إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ○

হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না; তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না– তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখ হতেই বের হয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে, তা আরো

অনেকগুণ বেশি জঘন্য। তোমাদের জন্যে নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও।

দেখ, তোমরা তাদেরকে আন্তরিকভাবে ভালোবাস, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেই আন্তরিকতা রাখে না। আর তোমরা সব কিতাবের ওপর বিশ্বাস রাখ; কিন্তু তারা তোমাদের কুরআনকে বিশ্বাস করে না। তারা যখন তোমাদের সঙ্গে মিলিত হয়, তখন বলে আমরা (তোমাদের ন্যায়) ঈমান এনেছি, আর যখন তারা তোমাদের থেকে আলাদা হয়, তখন তোমাদের প্রতি ক্ষোভে আঙুল কামড়ায়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের অন্তরের বিষয়সমূহের ব্যাপারে অবগত আছেন।

আর যদি তোমাদের কোনো ক্ষতি হয়, তাহলে তারা তা নিয়ে আনন্দ করে। তবে যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা কিছু করছে, তা নিশ্চয়ই আল্লাহর আয়ত্ত্বাধীন রয়েছে। *[আলে-ইমরান ৩:১১৮-১২০]*

এ পবিত্র আয়াতগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি মদিনায় তার ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক প্রচেষ্টার সময় অবতীর্ণ হয়েছিল। অর্থাৎ বদর ও উহুদযুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর। উহুদযুদ্ধ ইসলামী আন্দোলনের একটি অন্যতম শিক্ষণীয় ঘটনা ছিল, যা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের অন্তর ও চিন্তাধারায় পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। যে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ইচ্ছুক, তার উচিত হবে সাইয়েত কুতুব শহীদ রহ.-এর 'তাফসির ফি জিলালিল কুরআন' দেখে নেওয়া। তিনি যুদ্ধের ঘটনাবলি এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন, যেন মনে হবে তিনি প্রতিমুহূর্তে প্রত্যক্ষ করাপূর্বক যুদ্ধের তাজা তাজা সংবাদ নিয়ে আসছেন।

এ আয়াতগুলো আমাদের এমন কিছু লোকের ব্যাপারে সতর্ক করছে, যারা আমাদেরই মাঝে বসবাস করে, গায়ের রং আমাদের মতো এবং যারা কথা বলে আমাদের ভাষায়। এরা মুসলমানদের পরাজয় ও দুর্ভোগ কামনা করে, তাদের অসহায়ত্ব ও পতনের প্রতীক্ষায় থাকে। আর তারা তখনই অনন্দবোধ করে, যখন কুফরের ঝাণ্ডাকে সমুন্নত ও ইসলামের ঝাণ্ডাকে পতিত অবস্থায় দেখে। আমি যখন এ কথা বলছি, তখন আরবের বামপন্থী ও আফগানিস্তানের সুবিধাবাদীদের কথা আমার মনে পড়ছে।

সবার দৃষ্টি এখন আফগানিস্তানের প্রতি

ভাইয়েরা, এখন গোটা দুনিয়ার দৃষ্টি, কণ্ঠ, মিডিয়া ও আলো পৃথিবীর যে ভুখণ্ডকে নিয়ে ব্যস্ত, তার নাম আফগানিস্তান। আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হয়েছে। এর নাম আফগানিস্তান বিভাগ। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে মিশন নামে একটি শিক্ষাগার ছিল। এর নাম পরিবর্তন করে এখন নাম দেওয়া হয়েছে আফগানিস্তান স্কুল। উদ্দেশ্য আফগানিস্তানের ঘটনাবলি সংগ্রহ করে পর্যালোচনা করা।

তারা পৃথিবীতে ইসলামের পুনরায় বিজয় লাভ করার ভয়ে ভীত ও কম্পমান। আন্তর্জাতিক মিডিয়াগুলোর দিকে চেয়ে দেখুন এবং পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীগুলো পড়ে দেখুন। দেখবেন আফগানিস্তানই এখন লেখার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। কারণ, চলতি শতাব্দির গোড়ার দিকে পশ্চিমারা ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিতে সক্ষম হয়েছে।

যেসব আফগান জিহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, তারা এখনো রোম থেকে আফগানিস্তানে মমিকে (জহির শাহ) ফিরিয়ে আনার চেষ্টা অব্যাহত রখেছে। এরা এবং আরববিশ্বের বামপন্থীদের কথা আমরা ভুলিনি। কুয়েতের 'আসসিয়াসাহ' ও 'আলওয়াতান' এবং আমিরাতের 'আল-খালিজ'সহ অনেক পত্রিকা নোংরা ও তথাকথিত বাম চিন্তাধারা প্রচারের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এ আলওয়াতানকে কুয়েতি 'আলওয়াতান' (স্বদেশ) না বলে সোভিয়েত বা রাশিয়ান 'আলওয়াতান' বলা উচিত।

'আলওয়াতান' লিখেছে, আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ কার স্বার্থে অব্যাহত রয়েছে? 'উপসাগরীয় অর্থ ব্যয়ে আফগানিস্তানে রক্তপ্রবাহ অব্যাহত রয়েছে' ইত্যাদি। সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের পার্লামেন্ট নাকি কাজী শাকুর নামে একজন মুসলমানকে বিসমিল্লাহ বলার অনুমতি দিয়েছে। তাই পত্রিকাটি সোভিয়েত ইউনিয়ন নিয়ে গর্ববোধ করছে। আল্লাহই ভালো জানেন, লোকটি শাকুর 'কৃতজ্ঞ' না কাফুর 'নাফরমান'। একজন মুসলমানকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পার্লামেন্টে বিসমিল্লাহ বলার অনুমতি প্রদান বিরল ও বিস্ময়কর ঘটনা। আমাকে একজন টেলিফোন করে বলল, আমার চোখ দিয়ে অশ্রু বের হচ্ছে। বাস্তবেই কি নজিব ক্ষমতা হাত ছাড়া হওয়ার পর খাইবারের পথে পুনরায় পৌছে যাচ্ছে? আমি বললাম, ভাই, নিশ্চিন্ত থাকুন। মাত্র দুদিন আগে নজিব রেডিওতে ঘোষণা দিয়েছে যে আমাদের চলে আসার পথে মুজাহিদরা আমাদের ওপর কোনো প্রকার আক্রমণ চালাতে পারবে না। বলল, আপনি কি সত্যি বলছেন? আমি বললাম, আল্লাহর কসম, আমি সত্যিই বলছি। বললাম, যারা বৃহৎ সোভিয়েত

সাম্রাজ্যের উচ্ছিষ্ট খেয়ে জীবন ধারণ করছে, সেসব বামপন্থীর কথা বিশ্বাস করবেন না। আফগানিস্তানে পশ্চিমা ও আন্তর্জাতিক কুচক্রী মহলের কিছু দালাল জহির শাহ নামের সে মমিকে আফগানিস্তানে ফিরিয়ে আনার অপচেষ্টায় মেতে উঠেছে, সে অপমানিত হয়ে আফগানিস্তান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। আমি ঈদের খুতবায় কান্দাহারের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। কিছু লোক যারা এতিমের সম্পদ খেয়ে নিজেদের পেটকে মোটাতাজা করে আসছিল, তারা শুরু থেকে মুজাহিদদের জন্য জগদ্দল পাথরের মতো কষ্টের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এসব লোক কান্দাহার বিমানবন্দরের কাছে ফাঁকা গুলি ছুড়ে ঘোষণা দিল যে, বড় বড় বীর সক্ষম না হলেও তারা বিমানবন্দরের বাউন্ডারি ভেদ করতে সক্ষম হয়েছে। অতঃপর কান্দাহারের গভর্নর মুজাহিদদের রক্ত নিয়ে ব্যবসাকারীদের কাছে আত্মসমপর্ণের ঘোষণা দিল। তাকে এসব নির্বোধ মুহাজির ও পাশ্চাত্যের কাছ থেকে অর্থ লাভ করা লোকদের মাধ্যমে স্বাগত ও অভ্যর্থনা জানিয়ে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় বসানোর ঘোষণাও দেওয়া হলো।

আফগানিস্তান নিয়ে বিষাক্ত কালনাগিনীর ষড়যন্ত্র

ব্রিটেন হচ্ছে সে বিষাক্ত নাগিনী, যে তার বিষ দিয়ে মুসলিম অঞ্চলগুলোকে ধ্বংস করেছে। সে এখন জহির শাহকে ফিরিয়ে আনার ষড়যন্ত্রের বৃহৎ অংশীদার এবং জহির শাহও তার পিতার ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটানোর স্বপ্ন দেখছে। এ জহির শাহর পিতা নাদির খানকে যেমন আফগানবাসী কাঁধে করে মিরানশাহ থেকে তারমনজিল এবং সেখান থেকে পাকতিয়া হয়ে কাবুলে নিয়ে এসেছিল, তেমনি জহির শাহও স্বপ্ন দেখে আফগানবাসী তাকে আবার আফগানিস্তানে সেভাবে নিয়ে আসুক। অভিশপ্ত কামাল আতাতুর্কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আফগান শাসক আমানুল্লাহ খান তার স্ত্রীকে নিয়ে মুসলিম নারীদের সম্ভ্রম রক্ষার প্রধান হাতিয়ার পর্দার বিধান বাতিল করে এবং একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ করে। ফলে আফগান গোত্রীয় নেতা বাচ্চা ও সাকা (প্রকৃত নাম হাবীবুল্লাহ) আফগানবাসীকে নিয়ে আমানুল্লাহ খানকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। বাচ্চা ও সাকা ইসলামপ্রেমিক ও ব্রিটিশবিদ্বেষী ছিলেন। তিনি বলতেন, আমি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস ও মস্কো বিজয় করা পর্যন্ত জিহাদ চালিয়ে যাব। তাই ব্রিটেন তাকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য তার মন্ত্রী মাসউদকে অর্থের বিনিময়ে হাত করে এবং নাদির খানকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য আফগান গোত্রগুলোর মাঝে দেদার অর্থ ঢালে। ফলে আফগান গোত্রগুলো নাদিরখানকে বরণ করে ক্ষমতায় বসায়।

বিষাক্ত কালনাগিনী ব্রিটেন ইসলামপন্থী বাচ্চা ও সাকাকে ক্ষমতাচ্যুত করেই

ক্ষান্ত হয়নি, নাদির খানের মাধ্যমে তাকে হত্যাও করে। তিনি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর যখন তার বাহিনী নিয়ে কাবুল ত্যাগ করেন, তখন নাদির খান চিঠি লিখে তাকে কাবুলে নিরাপত্তা দেওয়ার অঙ্গীকার করে। চিঠিটি কতিপয় আলেমের মাধ্যমে তার কাছে পাঠানো হলে তিনি কাবুলে ফিরে আসেন। কাবুলে ফিরে এলে তাকে বিশ্বাসঘাতকতা করে গ্রেপ্তার করা হয়। কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কিছু দিন রাখার পর প্রভু ব্রিটেনের নির্দেশে নাদির খান (জহির শাহর পিতা) তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। তার শাহাদাতে আফগানিস্তান এক মুজাহিদ নেতাকে হারায়।

আশ্চর্য এক কারামত

এক মুঠি ধূলি নিক্ষেপে কয়েকশত ট্যাংক ধ্বংশ

শাইখ আবদুল্লাহ আযযাম আমাকে কিছু কারামত বর্ণনা করতে বললেন, যা আফগান জিহাদে বিভিন্ন স্থানে ঘটেছে। যা শুনলে মনে আল্লাহর উপর নির্ভরতা বাড়ে।

শাইখ মুহাম্মদ হাসান আমাকে বলেছেন- তিন ব্যক্তি আল্লাহর কসম খেয়ে সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন যে, তারা এই কারামতটি স্বচক্ষে অবলোকন করেছে। তিনি বলেছেন- তাদের নিকট এক যুবক মুজাহিদ ছিল। সে ছিল হাফেজে কুরআন। একবার সে মুজাহিদ ঘাঁটিতে যাচ্ছিল। ঘাঁটিতে যাওয়ার পথঘাট খুব ভালভাবে চিনা ছিল না। তাই ভুল পথে চলতে চলতে সে একেবারে রাশিয়ান বাহিনীর এক ক্যাম্পের কাছে চলে গেল। কমিউনিস্ট সৈন্যরা তাকে দেখে চমকে উঠল। সাথে সাথে চিৎকার করে উঠল, আর বলতে লাগল থামো, থামো, আর এক কদম সামনে আসবে না। মুজাহিদ যুবকটি ভয় পেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। বুঝতে তার আর দেরী হল না যে, রাশিয়ান সৈন্যরা তাকে ঘিরে ফেলেছে। কি আর করা ভেবে আত্মসমর্পণ করলো। তাদের প্রধান অফিসার এলো। আর ও ছিলো বিশ্বাসগতভাবে পাকা কমিউনিস্ট। রাশিয়ান সৈন্য। দোভাষীর সাহায্যে সে আমাকে বলল, আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো। মুক্তি দিয়ে দেবো। তবে তোমাকে একটি কথা বলতে হবে। সত্যি করে বলতে হবে। আমি বললাম, হ্যাঁ, সত্যি কথাই বলব মিথ্যা বলবো না। সে বললো, আচ্ছা তোমরা মুসলমান মুজাহিদরা সাধারণ ক্লাসিনকভের গুলীতে কিভাবে ট্যাংকগুলো ধ্বংস করে দাও, জালিয়ে দাও? অথচ ক্লাসিনকভের গুলীতে তো তা ধ্বংস হওয়ার কথা নয়।

সেই মুজাহিদ বললো, আমি জানি এরা শত্রু। এদের সাথে মিথ্যা বলা বৈধ।

কারণ, এটা যুদ্ধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে বললাম, আমরা মুসলামান। আমরা একমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভর করি। কোন মানুষ, কোন অস্ত্র বা দুনিয়ার অন্য কোন শক্তির উপরও ভরসা করি না। আমাদের বিশ্বাস থাকে যা করার তা আল্লহই করবেন। আমারা শুধু আল্লাহর নির্দেশে ওসীলা হিসেবে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছি। তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট, আমরা এক মুষ্ঠি ধূলি হাতে নিয়ে বলবো–

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ

ব্যস, এতোটুকু বলে যদি সেই ধূলি ট্যাংকে নিক্ষেপ করি, তাহলে তাতে ট্যাংকে বিস্ফোরণ ঘটে, জ্বলে-পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। মুজাহিদ তাদের ভয় দেখানোর জন্য একথা বললো। কিন্তু অফিসার তো একজন সৈনিক। সে কি তার এ কথায় ভয় পাবে। সে বিস্মিত হয়ে বললো, আচ্ছা তাই নাকি? এই তোমার সামনে কয়েকটি ট্যাংক দাড়িয়ে আছে। তুমি প্রথম ট্যাংকটির উপর ধূলি নিক্ষেপ করো তো দেখি। যদি সত্যিই তা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে আমি আমার সামনে যে সাধারণ সৈন্যরা আছে তাদের সাক্ষী রেখে বলছি, তোমাকে ছেড়ে দেবো। আর যদি না পারো তবে তোমাকে হত্যা করবো। কারণ মিথ্যাবদীকে হত্যা করাই আমার নীতি।

আসলে আমাদের এমনই আত্মবিশ্বাসী হতে হবে, আমরা দুনিয়ার কাউকে ভয় করবো না, কোন রাজা-বাদশাহ বা অন্য কাউকে ভয় করবো না। শুধু একমাত্র আল্লাহকে ভয় করবো। যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমরা তারই গোলাম। তিনি যখন বলেন 'হও' তখনই তা হয়ে যায়। তাই বলছি, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করো না। আল্লাহ তোমার ব্যাপারে যা লিপিবদ্ধ করেছেন তাই তুমি পাবে। এ বিশ্বাস তোমার অবশ্যই থাকতে হবে। এ বিশ্বাস যদি থাকে তাহলে আল্লাহর সামনে দুনিয়ার সবকিছুকে ইঁদুরের মতো তুচ্ছ মনে হবে।

যা হোক, এ মুাজহিদ আল্লাহর আশ্রয় নিলো। বললো, আমাকে একটু পানি দাও। পানি আনলে সে ওযু করলো। দু'রাকাত নামায আদায় করলো। সিজদায় পড়ে আল্লাহর নিকট দু'আ করলো। বললো, হে আল্লাহ! আমি তো এ কারামত দেখানোর যোগ্যতা রাখি না। কিন্তু হে আল্লাহ! আপনি তো সক্ষম আমাকে দিয়ে তা দেখাতে। সুতরাং এই বেঈমান কাফির কমিউনিস্টদের সামনে আমাকে লজ্জিত করো না। তোমার রাসূলের ধর্মের অবমাননা করো না। এ ব্যর্থতা, এ অপমান শুধু আমার ব্যর্থতা ও অপমানই নয়, এটা গোটা মুসলিম উম্মাহর ব্যর্থতা ও অপমান।

মুজাহিদ সালাম ফেরানোর পর এক অভাবনীয় প্রশান্তি অনুভব করলো। পথের পাশ থেকে এক মুঠি ধূলি নিয়ে এ দু'আটি—

بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

পাঠ করে ট্যাংকের উপর ছুঁড়ে মারলো। সাথে সাথে সেই বালু দাঁড়িয়ে থাকা সবগুলো ট্যাংকের উপর গিয়ে পড়লো। আর সবগুলো ট্যাংকে আগুন ধরে গেলো। দাউ দাউ করে লেলিহান শিখায় আগুন উঠতে লাগলো। ক্যাম্পের প্রধান অফিসার এ দৃশ্য দেখে থর থর করে কাঁপতে লাগলো এবং অন্যান্য দূরবর্তী ট্যাংকগুলো দূরে সরিয়ে নিতে নির্দেশ দিলো এবং তাকে ছেড়ে দিয়ে বললো, আর ধূলি নিক্ষেপ করো না। তুমি তোমার পথে চলে যাও। আমরা তোমাকে আটকাবো না। সত্যিই তাদের ছিলো বিশ্বাস, ছিলো একীন। তাই আল্লাহ তাদের সাহায্য করেছেন। আমাকে মুহাম্মদ সিদ্দীক চকরী বলেছে। সে তখন দক্ষিণ কাবুলে কমান্ডার ছিল। একবার এক যুদ্ধবিমান এলো, আমাদের উপর বোমা ফেলতে লাগলো। আমরা সবাই লুকিয়ে পড়লাম। কিন্তু একজন বৃদ্ধ মুজাহিদ লুকালেন না। আকাশের দিকে তাকিয়ে কাঁদতে লাগলেন আর বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! কে শক্তিশালী? তাদের যুদ্ধ বিমানগুলো, না আপনি? কে সবচেয়ে বড় ও মহান? আপনি, না তাদের বিমানগুলো? আপনার বান্দাদের নির্বিচারে ধ্বংস করার জন্য আপনি এ বিমানগুলোকে ছেড়ে দিয়েছেন। এভাবে কেঁদে কেঁদে দু'আ করে হাত নামাতেই বিমানটি পড়ে গেলো। আর কিছুক্ষণ পর কাবুল থেকে ঘোষণা করা হলো, একটি যুদ্ধ বিমান ধ্বংস হয়ে গেছে। তাতে একজন জেনারেল ছিল।[১]

খোরাসানের জিহাদে আল্লাহর নিদর্শন

খোরাসানের রণাঙ্গনে আমেরিকা ও পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে জিহাদের এগারো বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। দুই বছর আগে রাশিয়ানরা যেমন পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়ে বিতাড়িত হয়েছিল, অনুরূপভাবে এখন আমেরিকা ও পশ্চিমাদের ললাটে পরাজয়ের কলঙ্কচিহ্ন পরিস্ফুটিত হচ্ছে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে আমাদের মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ তায়ালা রাশিয়ার বিরুদ্ধে মুজাহিদদের ঠিক যেভাবে সাহায্য করেছিলেন, ঠিক তেমনি অদ্যাবধি কৌশল ও সৈন্য দ্বারা প্রতিনিয়ত সাহায্য করে যাচ্ছেন।

---

[১] তাফসীরে তাওবা। ১৮০

শহীদ ড. আবদুল্লাহ আয্যাম রহ. খোরাসানের প্রথম রণাঙ্গনে আল্লাহর সাহায্যের চিত্র তুলে ধরেছিলেন, ফলে একটি তথ্যবহুল নির্ভরযোগ্য পুস্তক বাস্তবতার রূপ নিল। অনুরূপভাবে চলমান জিহাদেও আল্লাহর সাহায্যের বাস্তব নমুনাগুলো একত্র করে এগুলো মুসলিম উম্মাহর সামনে উপস্থাপন করা প্রয়োজন মনে করছি।

তারই ধারাবাহিকতায় আমরা পাকিস্তানের আল-কায়েদার দাওয়াহ বিভাগের প্রধান উস্তাদ আহমদ ফারুকের (হাফিজাহুল্লাহ) কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, তিনি প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে কারামতগুলো একত্রকরণের কাজ শুরু করেছেন। আল্লাহ তায়ালা হযরতের সব প্রচেষ্টাকে কবুল করুন এবং তাঁর এই অনুসন্ধানকে মুসলমানদের জন্য ইহকাল ও পরকালের উপকারের কারণ বানিয়ে দিন। আমীন!

অনুরূপভাবে পুরো জিহাদটাই একটি কারামত। একদিকে জল, স্থল ও আকাশপথে নতুন যুদ্ধ সরঞ্জামসহ পৃথিবীর ৪৫টির অধিক সন্ত্রাসী (ন্যাটো) রাষ্ট্রের রাজত্ব এবং তাদের সেনাবাহিনী দ্বারা বেষ্টিত; অন্যদিকে শুধু ঈমানি বলে বলীয়ান কতিপয় মুজাহিদ গ্রুপ। কিন্তু এখানে এসে মানবজ্ঞান হতবাক যে, শুধু এই প্রতিরোধ দশ বছর ধরে চলমান তা নয়; বরং বাস্তবে দুর্বল বাহিনীর বিজয় সর্বত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর পরও কি মহান আল্লাহর কুদরত বুঝতে পারা ও মুজাহিদদের (যারা রণাঙ্গনে জিহাদে জড়িত) সত্যের পথে অবিচলতার আর কোনো প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা বাকি থাকে?

কিন্তু এটি আল্লাহর এক বড় রহমত যে, এই আপাদমস্তক কারামত জিহাদের মধ্যে ও আল্লাহ তায়ালা আরো অধিক কারামত প্রকাশ করছেন, যাতে ঈমানদারদের ঈমানের জ্যোতির প্রবৃদ্ধি ঘটে এবং কাফের ও মুনাফিকের ওপর তা প্রমাণ ও হুজ্জতস্বরূপ হয়ে যায়। কিন্তু আমি সম্মানিত ভাইদের বারবার তাগিদে আল্লাহ তায়ালার শক্তি সাহায্যে এই কাজ সম্পাদনের ইচ্ছা করেছি। আমার প্রচেষ্টা হবে, রণাঙ্গনে মুজাহিদ এবং শহীদদের যেসব কারামত (অলৌকিক বিষয়) ও আল্লাহর সাহায্যের যেসব প্রমাণ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি কিংবা নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে আমি জ্ঞাত হয়েছি, সেগুলোকে এখানে ধারাবাহিকভাবে পাঠকদের সম্মুখে উপস্থাপন করব।

এই লেখনীর উদ্দেশ্য হলো, সর্বপ্রথম আমার ঈমানকে নবায়ন ও শক্তিশালী করা।

আল্লাহ তায়ালার কাছে আশাবাদী যে, এসব ঘটনা পাঠান্তে পাঠকের ঈমানি সজীবতা বৃদ্ধি পাবে এবং জিহাদ ও কিতালের ভালোবাসা তাদের অন্তরে

প্রোথিত হওয়ার অসিলা হবে। জিহাদের সত্যতা, ফজিলত ও গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য মৌলিক প্রমাণাদি কুরআন ও হাদিসের স্পষ্ট উদ্ধৃতিই যথেষ্ট, যেগুলোতে জিহাদ ও কিতালের অসাধারণ মর্যাদা ও বড়ত্ব বর্ণিত হয়েছে। এখানে এমন প্রমাণাদি বিদ্যমান, যেগুলো পাঠ করে আমি আল্লাহর সাহায্যে এ পথে পদার্পণ করেছি। কিন্তু এ পথে আসার পর এসব সুসংবাদ, অলৌকিক ঘটনা ও আল্লাহর সাহায্যের নিদর্শনাবলি অন্তরের দৃঢ়তা ও পদদ্বয় স্থির রাখার কারণ হচ্ছে। বিশেষভাবে একদিকে সারা দুনিয়ার কুফরিশক্তি একত্র হয়ে আফগানিস্তানে হামলা করেছে, অন্যদিকে আমাদের দেশীয় সৈন্য ও এজেন্সিগুলোও মুজাহিদদের জীবনযাত্রার ব্যত্যয় ঘটাচ্ছে। এমন শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে এসব সাহায্য আল্লাহর মুজাহিদ বান্দাদের প্রতি তাঁর বিশেষ রহমতের বহিঃপ্রকাশ।

অধুনা কুফফারদের টেকনোলজি ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছে। তাঁরা রক্তপাত ঘটানো ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর জন্য অবিশ্বাস্যভাবে ব্যাপক বিধ্বংসী মারণাস্ত্র তৈরি করেছে। কিন্তু এসব অত্যাধুনিক সরঞ্জাম বহনকারী ক্রুসেডার ন্যাটো বাহিনী রণাঙ্গনে শক্তি পরীক্ষাকারী মুজাহিদদের প্রতি আল্লাহর সাহায্য ও বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করছে।

কিন্তু এ কথা সত্য যে, মানুষ যতই জাতিগত শক্তির ঐক্য গড়ে তুলুক, যতই উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছুক, সে আল্লাহর এক সৃষ্টি মাত্র। মহান স্রষ্টার শক্তি, বড়ত্ব, কুদরত, প্রভাব ও শ্রেষ্ঠত্বের সামনে এসব কুফরি শক্তি মাছির পাখা সমপরিমাণও নয়।

আল্লাহ তায়ালার রীতিনীতি বর্তমান টেকনোলজির যুগেও তেমনই আশাবাদ জাগায়, যেমন তীর-তরবারির যুগে ছিল। তাঁর সাহায্য এখনো পদে পদে ঈমানদারদের পা দৃঢ় ও মজবুত করছে। কিন্তু শর্ত হলো, আল্লাহকে অসন্তুষ্ট না করা এবং নিজেদের দ্বারা আল্লাহর সাহায্য তালাশ করা।

বদরের ময়দান তৈরি করো, তোমার সাহায্যে এখনো চারপাশ থেকে সারি সারি ফেরেশতা অবতীর্ণ হবে ইনশাআল্লাহ!

আমার মুজাহিদ ভাইদের প্রতি আবেদন করছি, আপনাদের যাঁর যাঁর প্রত্যক্ষ কিংবা সার্বিক সূত্রে প্রাপ্ত কোনো মুজাহিদ বা শহীদের অলৌকিক ঘটনা জানা থাকলে লিখিত বা যেকোনো মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করুন। ইনশাআল্লাহ আপনার এই কাজ জিহাদের দাওয়াতে অংশগ্রহণ ও উদ্বুদ্ধকরণের কাজের অংশীদার হবে এবং আল্লাহর কাছে উত্তম প্রতিদানের কারণ হবে।

মুজাহিদদের সাহায্যে মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া

ইসলামাবাদের এক পরিচিত ভাই কিছুদিন আগের একটি ঘটনা আমার কাছে বর্ণনা করেন। তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। তিনি ও অন্যরা 'খিতায়ে মেহসুদে' একটি অপারেশনের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তাঁদের দলে তিনজন মুহাজির ও বাকিরা আনসার ছিলেন। অপারেশনের টার্গেট ছিল 'আসমান মুনাজ্জা'-সংলগ্ন এলাকায় পাহাড়ের শীর্ষ চূড়া। পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছে মুজাহিদরা পরামর্শ করল, আরোহণের জন্য আমরা কোন পথ বেছে নেব? যদি শত্রুদের দৃষ্টিবহির্ভূত পথে এগিয়ে যাই তাহলে চূড়ায় পৌঁছতে পৌঁছতে দেহের সব শক্তি শেষ হয়ে শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করা দুষ্কর হয়ে পড়বে। অন্যদিকে যদি সহজ রাস্তা ধরি, তাহলে শত্রুদের মুখোমুখি হয়ে যাব। সম্ভাবনা রয়েছে যে, ওপরে পৌঁছার আগেই শত্রুরা মুজাহিদদের দেখে ফেলবে এবং নিজেদের সামলে নেওয়ার আগেই ফায়ার করে দেবে। এই দ্বিধা-দ্বন্দে থাকা অবস্থায় হঠাৎ বাতাসের সঙ্গে মেঘ এসে পাহাড়কে সম্পূর্ণভাবে ঢেকে দিল। মেঘলা হাওয়া এত গাঢ় ছিল যে, কয়েক কদম সামনে দেখাও কঠিন হয়ে পড়ল।

সঙ্গীরা এটাকে ঐশী সাহায্য ভেবে সংক্ষিপ্ত পথে পাহাড়ে আরোহণ শুরু করে দিল। যখন তারা পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে নিজেদের পজিশন নিয়ে নিল, অল্পক্ষণ পরই মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া সরে গেল।

আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদরা প্রশান্ত মনে নিজেদের কার্যক্রম পূর্ণ করে নিল এবং হালকা ও ভারী অস্ত্র দ্বারা শত্রুদের চৌকিতে সফল অপারেশন চালাল। অপারেশন শেষ হতেই পুনরায় মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া এসে পাহাড়টাকে ঢেকে দিল। মুজাহিদরা আল্লাহর প্রশংসা ও জিকির মুখে নিয়ে মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ার আড়ালে নিরাপদে নিচে নেমে এলো। এ অপারেশনে নিজেদের কোনো ক্ষতি হওয়া ছাড়া শত্রুদের পূর্ণ ক্ষতি সাধন করে সফলতা অর্জন করল। সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

একজন আফগানি আলেমে দীনের ঈমান জাগানো বিবরণ

গ্রেপ্তার হওয়া থেকে গুপ্ত কারাগার পর্যন্ত

একজন মুজাহিদ আফগানি আলেমে দীন ও খতিব জেল থেকে মুক্তির পর তাঁর সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঈমান জাগানো বিবরণী আমাকে শুনিয়েছেন। নিম্নে তা উল্লেখ করা হল–

তাঁকে বেঈমান সৈনিকরা দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের 'বানা' নামক এলাকার একটি

কেন্দ্রীয় প্রধান সড়ক থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই আলেম এক সঙ্গীর সঙ্গে তাঁর গাড়িতে করে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ সামনে পাকিস্তানি সৈন্যদের একটি 'কাদেখা' চোখে পড়লে তাঁরা তাঁদের গাড়ি সড়ক থেকে সরিয়ে নিয়ে কিছুটা দূরে গিয়ে পাকিস্তানি সৈন্যগুলো চলে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু সৈন্যদের মনে সন্দেহের ডানা বিস্তার করল। ফলে ওদের গাড়ির চারপাশ ঘিরে ফেলল। বর্ণনাকারী ভাই বলেছিলেন, কতিপয় সৈনিক পায়ে হেঁটে আমার গাড়ির কাছে এসে আমাকে নিচে নামতে নির্দেশ দিল। আমি আমার কালাশনিকভ শক্তভাবে তাক করলাম এবং ইচ্ছা করলাম যে, কোনোমতেই আত্মসমর্পণ করব না এবং গাড়ি থেকে অবতরণও করব না। কিন্তু এক সৈন্য আমাকে বারবার এই প্রত্যয় দিচ্ছিল যে, আমরা আপনাকে গ্রেপ্তার করব না। আপনি শুধু নেমে আমাদের সঙ্গে একীভূত হোন। আমি তাদের কথা বিশ্বাস করে কালাশনিকভসহ গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম। তবে আমি মনে মনে ঠিক করলাম, যদি তারা তাদের প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করে তাহলে আমি লড়াই করব, তবু গ্রেপ্তার হব না।

আমি গাড়ি থেকে নেমে যখন সৈন্যদের দিকে তাকালাম, তখন তাদের পেছনে স্বাস্থ্যগত দিক দিয়ে তাদের চেয়ে আরো সুঠাম, সুন্দর পোশাকে সজ্জিত রূপসী এক নারীকে দেখতে পেলাম। ওই রূপসী ওয়াজিরিস্তানে প্রচলিত কোনো পোশাকে সজ্জিত ছিল না। এমন কি পৃথিবীর কোথাও এত শানদান ও মূল্যবান পোশাক পরিধান করা হয় না। তার চেহারায় ছিল এক অসাধারণ দ্যুতির ঝলক। আমি অবাকচিত্তে তাকিয়ে ছিলাম। আবারও এক সৈন্য আমাকে প্রত্যয় দিচ্ছিল, আমরা আপনাকে গ্রেপ্তারের ইচ্ছা করছি না, আপনি অস্ত্র এখানে রেখে আমাদের সৈনিকদের কাছে চলে যান। একদিকে সৈনিকদের নির্ভয়বাণী, অন্যদিকে সেই রূপসী হাতের ইঙ্গিতে আমাকে তার দিকে ডাকছে। আমি বুঝে গেলাম, এখানে স্থির থাকার (লড়াই) ফলাফল শাহাদাত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এটি জান্নাতি হুর হবে, যে আমাকে স্ব-স্থানে স্থির থাকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে এসেছে। কিন্তু অন্যদিকে এই আল্লাহদ্রোহী সৈন্যগুলো তাদের কথা বারবার এত মিনতিস্বরে বলছে যে, তাদের কথা আমার সঠিক বলে মনে হচ্ছিল।

আমার অন্তরে হঠাৎ দুর্বলতা এসে গেল। আমি ভাবলাম, লড়াই ব্যতীত যদি মুক্তি পেয়ে যাই, তাহলে ঝুঁকি নিয়ে লাভ কী! আমি কালাশনিকভ গাড়িতে রেখে দিয়ে যখন ফিরে আসছিলাম, তখন দেখলাম ওই রূপসী অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন আমি অত্যন্ত মর্মাহত হলাম এবং আমার কৃতকর্মের ওপর লজ্জিত হলাম। বুঝে গেলাম, আমি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

বাস্তবে হয়েছেও তাই। সৈন্যরা নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করল। এই

আলেম যখনই সৈন্যদের গাড়ির কাছে পৌঁছল, তারা তখন তাঁকে বন্দি করে ফেলল। গ্রেপ্তার হওয়ার পর কিছুদিন তাঁকে 'বানা'র সেনাক্যাম্পে স্থানান্তর করা হলো। কারাগারে তাঁকে উলঙ্গ করে অত্যন্ত ঘৃণিত শাস্তি দিল। তাঁকে উল্টোভাবে ঝুলিয়ে পানিতে ডুবিয়ে দেওয়া হলো। (রেডিওথেরাপি) বেদম বেত্রাঘাত করল, দাড়িকে অপদস্ত করা হলো। মোট কথা তিনি আলেম হওয়ার কারণে তাঁর সঙ্গে ঘৃণ্য আচরণ করা হলো।

কিন্তু যে শাস্তিটা তাঁর জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক ছিল তা হলো, তাঁর হাত বেঁধে একটি অন্ধকার ছোট বাংকারে নিক্ষেপ করা হলো। একটু পরই সে অনুভব করল, তাঁর দেহে কোনো কিছু বেয়ে উঠছে। কারাপ্রকোষ্ঠে থাকতে থাকতে যখন চক্ষু অন্ধকারে অভ্যস্ত হয়ে গেল। তখন সে দেখল, এই ছোট কামরার বিছানাগুলো বিক্ষিপ্তভাবে পরে আছে এবং তা অজস্র লাল পিঁপড়ায় (যা অত্যন্ত বিষাক্ত) ভরপুর ছিল। এই লাল পিঁপড়াগুলো দশ থেকে শত-কোটি হয়ে তাঁর শরীরে বেয়ে উঠছে। শুধু তা-ই নয়; বরং বিড়ালের মতো মাংসাশী প্রাণী ও ক্ষুধার্ত ইঁদুরও ছিল, যেগুলো তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে কামড়াত। এই ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থা দেখে তাঁর মুখ দিয়ে চিৎকার বেড়িয়ে এল। তিনি সজোরে চিৎকার করে জেল কর্মকর্তাদের ডাকতে লাগলেন। কিন্তু কর্মকর্তারা তাঁর চিৎকারে কর্ণপাত করেনি। তারপর তিনি আল্লাহর জিকির শুরু করলেন।

যতক্ষণ তিনি জিকির করেন, ততক্ষণ তাঁর দেহ এমন অনুভূতিহীন থাকে যে, কোনো পোকামাকড় তাঁর শরীরে বেয়ে ওঠা কিংবা কোনো ইঁদুরের কামড় তিনি অনুভবই করতেন না। আর যখন তিনি ওই পোকামাকড়গুলো দেখে ভয়ে জিকির ছেড়ে দিয়ে চিৎকার করতেন, আবারও কষ্ট শুরু হতো। সুতরাং তিনি আল্লাহর জিকিরকেই মূল আশ্রয়স্থল বানিয়ে নিলেন এবং এই কষ্টগুলো সহ্য করা সহজ হয়ে গেল।

এর চেয়েও বিস্ময়কর ঘটনা হলো, যখন ওই আলেম নামাজ পড়তেন এবং সিজদায় যেতেন, তখন সেখানের হাজারো লাল পিঁপড়া ও বড় বড় ইঁদুর ঢেউয়ের মতো ডানে-বাঁয়ে সড়ে যেত এবং তাঁর জন্য জমিতে কপাল রাখার জায়গা ছেড়ে দিত। যখন তিনি সোজা হয়ে বসে পড়তেন, পুনরায় কীটপতঙ্গগুলো ছেয়ে যেত। ওই ভাইয়ের বিবরণ ছিল– প্রাণিকুল ও কীটপতঙ্গদের মধ্যে একজন দুর্বল মুজাহিদের জন্য এমন পরিক্রমা দেখে আমার শক্তি সঞ্চয় হলো এবং দৃঢ় বিশ্বাস হলো যে, আমি সত্যের ওপর অবিচল রয়েছি। আল্লাহর সাহায্য ও তাঁর প্রাণিকুলের ভালোবাসা আমার সঙ্গে রয়েছে।

মার্কিনদের বন্দিশালায় বিশাল সুসংবাদ

আমাকে শায়খ আবু ইয়াহইয়া আল লিব্বি (হাফিজাহুল্লাহ) নিজেই এ ঘটনা শুনিয়েছেন। যখন তাঁকে করাচি থেকে গ্রেপ্তার করে আফগানিস্তানের বাগরাম কারাগারে নিয়ে গেল, তখন প্রাথমিক মাসগুলোতে রিমান্ড ও শাস্তির মাত্রা বেশি থাকে এবং বন্দি নিজেও জেলের পরিবেশের সঙ্গে অপরিচিত থাকে। ফলে এ মাসগুলোতে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হয় এবং আল্লাহর বিশেষ সাহায্যে দিনাতিপাত করতে হয়।

শায়খ বলছেন, সম্ভবত মার্কিনদের বন্দিশালায় চতুর্থ মাসের ঘটনা। জেলের সংকীর্ণ ও অন্ধকার কুঠুরিতে দিন-রাত অতিবাহিত হচ্ছিল। আল্লাহ ছাড়া আর কারো সাহায্যের অবকাশ ছিল না। এক রাতে এমন এক ঈমান জাগানো স্বপ্ন দেখলাম, যার ফলে সব দুশ্চিন্তা বিদূরিত হয়ে গেল। আল্লাহর সাহায্য ও নৈকট্যের অনুভূতি দুর্বল আত্মাকে প্রাঞ্জল করে দিল।

শায়খ বর্ণনা করছেন, আমি দেখতে পেলাম এমন একটি মসজিদে প্রবেশ করছি, যেখানে জুমার নামাজের পর শিক্ষাদীক্ষার আসর চালু থাকে। সৌদি আরবের প্রসিদ্ধ অন্ধ আলেমে রাব্বানী শাইখ হামুদ বিন উকলা রহ.* পায়ের পাতায় ভর করে বসে দরস দিচ্ছেন এবং মুজাহিদদের আগত বিপদাপদ ও পরীক্ষার কথা উল্লেখপূর্বক তাদের সান্ত্বনার বাণী শোনাচ্ছেন।

শায়খ বলছেন, শায়খ হামুদ বিন উকলার কথা শ্রবণ করতে করতে মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসি। তখনো অনুভব হলো যে, মসজিদ থেকে যে ধ্বনি আসছিল, হুবহু সে ধ্বনি আকাশে চলে গেল। আকাশ থেকে এ রকম স্পষ্ট আওয়াজ আসছে যে ধৈর্য ধারণ করো। কেননা তোমরা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছ। ধৈর্য ধারণ করো, কেননা তোমরা আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত লোক।

শায়খ বলছেন, আমি সামনে অগ্রসর হয়েছিলাম এবং এই ধ্বনি বারবার

---

* (১) হযরত শাইখ হামুদ উকলা শাবি রহ. আরব বিশ্বের সেসব বড় আলেমদের মধ্যে গণ্য হতেন, যাঁরা আফগানিস্তানে ইসলামী ইমারত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাঁর সমর্থনে ফতোয়া জারি করেছিলেন। আরব ভূখণ্ড থেকে আমেরিকান সৈন্যদের বের করে দেওয়া ওয়াজিব হওয়ারও ফতোয়া দিয়েছিলেন। ১১ সেপ্টেম্বরের পর এই মহান কাজের বৈধতা এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদ ফরজে আইন হওয়ার ফতোয়া প্রদান করেছিলেন। সত্যকথা বলার অপরাধে সৌদি সরকার এই বুজুর্গ অন্ধ আলেমকে খাদ্যে বিষ মিশ্রণ করে শহীদ করে দিয়েছে। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং জান্নাতের সুউচ্চ আসনে তাঁকে অধিষ্ঠিত করুন। আমিন!

(২) স্মরণীয় যে, এটি সে মহাবিপদের সময়কার ঘটনা, যখন ইমারতে ইসলামীর পতনের পর পাকিস্তানে অল্প দিন পর মুজাহিদদের বড় কোনো কমান্ডারের গ্রেপ্তারের সংবাদ মুজাহিদদের হিম্মত পরীক্ষা করছে।

শুনছিলাম। এমনকি আমি দেখলাম যে, লিবিয়ায় আমি আমার বাড়িতে প্রবেশ করেছি এবং চলতে চলতে আমার ঘরের গোসলখানার দিকে অগ্রসর হলাম। গোসলখানার বন্ধ দরজা খুলে দেখি সেখানে আগে থেকেই শায়খ হামুদ বিন উকলা রহ. উপস্থিত রয়েছেন এবং আবৃত পোশাকে গোসলে ব্যস্ত রয়েছেন।

শায়খ মুচকি হেসে আমার দিকে তাকাতেই আমি লজ্জায় দরজা বন্ধ করে দিই। দরজা বন্ধ করতে করতে একটি আওয়াজ আসে, 'হয়তো মুজাহিদরা বিপদগ্রস্ত'। আমি জানি না যে এই আওয়াজ শায়খ হামুদ রহ., না আকাশ থেকে আসে। কিন্তু কথাগুলো স্পষ্ট আকাশ থেকে আসতে শোনা যায়। আকাশ থেকে আওয়াজ আসে যে 'মুজাহিদদের খুশি করতে এ কথা কি যথেষ্ট নয় যে, আমি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছি। কখনো রাগান্বিত হব না! তাঁরা আমার কাছে যা চায় সব কিছু দেব'। অর্থাৎ বিজয় এবং আরো অনেক কিছু!

এই সুসংবাদমূলক স্বপ্ন জেলে বন্দি সব ভাইকে উদ্দীপনা বাড়িয়ে দিল, অন্তরে প্রশান্তি ও স্থিরতা এনে দিল এবং এ কথা স্পষ্ট করে দিল যে, ইসলামের শত্রুরা মুজাহিদদের দেহকে বন্দি করতে পারে; কিন্তু তাদের অন্তর ও স্বাধীন আত্মাগুলোকে আকাশের উঁচুতে উড়ে বেড়াতে এবং আল্লাহর সঙ্গে প্রেমালাপ করতে বাধা দিতে পারে না।

এক আহত সঙ্গীর ওপর আল্লাহর রহমত

'বানা' এলাকার 'ক্লোসার' মধ্যে মুজাহিদদের একটি ঘাঁটিতে ড্রোন বিমান বোম্বিং করল। ছয় আফগান ও দুই পাকিস্তানি সঙ্গী শাহাদাতবরণ করল এবং কতিপয় সঙ্গী আহত হলো। পাঞ্জাবের (আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে) ইয়াসিন ভাইও আহতদের মধ্যে ছিলেন। তাঁর পায়ের নলা ও নিতম্বের হাড় বোম্বিংয়ে ভেঙে গিয়েছিল। ফলে পায়ের নলা সামান্য নড়াচড়া করলেও তাঁর অসহ্য কষ্ট হতো এবং পুরো হাসপাতাল তাঁর চিৎকারে প্রকম্পিত হয়ে উঠত। এ অবস্থায় আমি চিন্তিত হলাম যে, এই ভাইটি টয়লেটে কেমনে যাবে? নিজের প্রয়োজন কিভাবে পূর্ণ করবে? কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই ভাইয়ের প্রতি বিশেষ মেহেরবানি করেছেন, দুই সপ্তাহের কাছাকাছি ওই ভাই সব ধরনের খাওয়াদাওয়া করেছেন, পেট ভরে তিনবেলা খেয়েছেন, কিন্তু তাঁর একবারও টয়লেটে যাওয়ার প্রয়োজন হয়নি। এই ভাই কষ্টের প্রাথমিক দুই সপ্তাহ সাচ্ছন্দ্যে বিছানায় অতিবাহিত করেছেন। যখন পায়ের নলার আঘাত কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠল এবং কষ্ট সামান্য কমে গেল, তখন থেকে প্রাকৃতিক প্রয়োজনাদি স্বাভাবিক হয়ে গেল। *[একটি ম্যাগাজিন অবলম্বনে]*

আফগানদের সঙ্গে আমার পরিচয়

যেদিন আমি আফগানিস্তানের বাসিন্দাদের দেখেছি, সেদিন থেকে আমি অনুভব করেছি মুসলমানরাই বিশ্বের সর্বাধিক প্রভাবশালী মানুষ, যাকে পরাজিত করা অসম্ভব এবং মুসলমান এমন একটি উঁচু পাহাড়, যা কখনো স্বীয় জায়গা থেকে এদিক-সেদিক দোলে না। এ কারণেই বিশ্ব সত্যিকারের মুসলিম মুজাহিদকে ভয় করে। আমি একজন ফিলিস্তিনি, যে পরাজয়ের পর পরাজয়ের শিকার হয়েছে। আমার পরিবারকে দেখেছি, তারা একের পর এক দেশ ত্যাগের যন্ত্রণা সহ্য করেছে। আমি আমার মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে আমার দেশে বিশ বছর কাটিয়েছি। আমি একটি গ্রামে বাস করতাম। ইহুদিরা প্রায় রাতে আমাদের ঘরে হানা দিত। কিন্তু তাদের মুখে গুলি ছুড়বে এমন কাউকে পাওয়া যেত না। গুলি ছুড়লে তাকে পুলিশের কোয়ার্টারে নিয়ে কঠোর শাস্তি দেওয়া হতো। আমি ফিলিস্তিনে বাস করেছি ও তার অবস্থা দেখেছি। ১৯৬৭ সালে আমি ফিলিস্তিনে। আমার সম্মুখ দিয়ে ইসরায়েলি ট্যাংক আমার গ্রামে প্রবেশ করেছে। কিন্তু তাদের দিকে গুলি ছোড়ার মতো কেউ ছিল না। এ অবস্থায় একদিন আমি এমন এক মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝে এসে পৌঁছলাম, যারা নিজেদের খাদ্য জোগাড় করতে সক্ষম নয়, তাদের পায়ে জুতা নেই, পেটে খাবার নেই, পকেটে টাকা নেই। কিন্তু ইজ্জত ও সম্মান রক্ষায় তাদের শির এত উন্নত যে তা মেঘের সঙ্গে টক্কর খাচ্ছে। তাদের প্রত্যেকেই যেন রাশিয়ার বিশাল বাহিনীর সম্মুখে এ কথা উচ্চারণ করছে—

مُسْلِمٌ يَا صِعَابُ لَنْ تَتْهَرِيْنِيْ صَارِمِيْ قَاطِعٌ وَعَزْمِيْ حَدِيْدٌ

كُلُّ بَذْلٍ إِذَا الْعَقِيْدَةُ رِيْعَتْ دُوْنَ بَذْلِ النُّفُوْسِ نَذْرٌ زَهِيْدٌ

ওহে বাধার পাহাড়! পারবে না আমাকে তুমি করতে পরাজিত
আমি মুসলিম তরবারি আমার ধারাল, সংকল্প দৃঢ় লোহার মতো।
আকিদায় আঘাত এলে প্রাণ উৎসর্গ ব্যতীত
সব ত্যাগই হলো তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতর।

আল্লাহর কসম, ১৯৬৭ সালে ইহুদিদের হাতে মসজিদুল আকসার পতন হওয়ার সময় পার্শ্ববর্তী আরব দেশসমূহ থেকে আগত সৈন্যদের দশজনও নিহত হলো না। মক্কা ও মদিনার পর মুসলমানদের সবচেয়ে পবিত্র ভূমিকে রক্ষার জন্য দশজন লোকও নিহত হলো না। আমি ইসরায়েলি রেডিওতে শুনেছি, জুনের পঞ্চম দিন ট্যাংক বহর গিয়ে আমাদের শহর দখল করে নিয়েছে। অন্যদিকে

প্রেসিডেন্ট আবদুন নাসের বাদশা হোসাইনকে সম্বোধন করে বলছে, আমরা শত্রুদের বিমানের এক-তৃতীয়াংশ ভূপাতিত করেছি। এখন আমাদের বিমানগুলো তেলআবিবের ওপর। মাননীয় বাদশাহ, শান্তি চুক্তির জন্য প্রস্তুত হোন।

মসজিদুল আকসায় প্রবেশের পর আমি ইহুদিদের বলতে শুনেছি, মুহাম্মদ মারা গেছে, মুহাম্মদ মারা গেছে এবং কিছু মেয়ে রেখে গেছে। জর্দানের সৈন্যদের প্রতিরোধের দ্বিতীয় সেক্টরে ফিরে যাওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পর এক ইহুদি জোয়ান মসজিদুল আকসায় প্রবেশ করল এবং বলল, উরশিলিম (জেরুজালেম) থেকে ইয়াসরব (মদিনা) পর্যন্ত। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বিনগোরিন বলল, অঙ্গীকার ভূমিতে (ফিলিস্তিন) আসার পর এটাই আমার সবচেয়ে ভালো দিন। কারণ, এটা সে দিন, যে দিন পবিত্র রাজধানীর উভয় অংশ একীভূত হয়েছে।

রাশিয়া পরাজিত

আমি ওই তিক্ততা ও যন্ত্রণায় জীবন কাটিয়েছি। হঠাৎ আমি এমন এক মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝে এসে পৌঁছলাম, যারা বন্দুক নিয়ে রাশিয়ার ট্যাংকের মোকাবিলা করছে। বিদ্যমান পরিস্থিতির চাপ ও প্রাচ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রের আঘাতে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত আরব বিশ্বের লোক আফগানরা যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, তা বিশ্বাসই করতে চাচ্ছিলাম না। আফগানিস্তানে আসার এক বছর পর আমি সৌদি আরবে গেলে শায়খ আবদুল মজিদ জান্দানিকে বললাম, বিজয়ের পাল্লা ভারী। তিনি বললেন, রুশ বাহিনীর? আমি বললাম, মুজাহিদ বাহিনীর। তিনি বললেন, শায়খ আবদুল্লাহ আযযাম, আফগানদের প্রতি আপনার সীমাতিরিক্ত ভালোবাসার কারণেই এ কল্পকথা বলছেন।

আমি বললাম, হায়! যদি আমার দেশের লোক আফগানদের এ বিজয়ের কথা জানত! আমি তাদের বললাম, ওহে লোক সকল, ওখানে এক সফল ব্যবসা শুরু হয়েছে। ওখানে অসম সমর ও তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। তার পরও মুজাহিদরা বিজয় লাভ করছে। তারা বলল, রাশিয়া কি মুজাহিদদের প্রতিরোধকে দ্রুত গুঁড়িয়ে দিতে সক্ষম নয়! রাশিয়া তো অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান ও ক্ষেপণাস্ত্রের অধিকারী। রাশিয়া ১৯৮৫ সাল নাগাদ তার স্টককৃত সব অস্ত্র আফগানিস্তানে ব্যবহার করেছে। এরপর সে নবনির্মিত অস্ত্র ব্যবহার শুরু করে। অস্ত্র ও বোমা তৈরির এক সপ্তাহ পর তা আফগানিস্তানে ব্যবহার করেছে।

১৯৮৫ সালে আমাদের ওপর যে বোমাগুলো ফেলানো হয়েছে, তাতে ১৯৮৫ লেখা ছিল। সে মিগ ২১, ২৫, ২৭ যুদ্ধবিমান আফগাস্তিানে ব্যবহার করেছে। এখন মিগ ২৭ ব্যবহার করছে, যা ২৫০ কিলোমিটার দূর থেকে নির্ভুলভাবে নিশানায় আঘাত করছে। লোকজন বলছে, তিন সপ্তাহ হয়ে গেছে, এখনো কি জালালাবাদের পতন হয়নি? অথচ তারা মুজাহিদদের মাথার ওপর এসে পৌঁছা ক্ষেপণাস্ত্রের কথা ভুলে যাচ্ছে। এ ক্ষেপণাস্ত্র কাবুল থেকে ছোড়া হয়। এর ওজন সাড়ে পাঁচ টন ও দৈর্ঘ ১১ মিটার। এটি যেখানে গিয়ে পড়ে, সেখানে এক কিলোমিটার পর্যন্ত ধ্বংস করে। গতকাল বা এর আগের দিন এ রকম ৯টি ক্ষেপণাস্ত্র মুজাহিদদের ওপর ছোড়া হয়। এর একটি তোরখামে এসে পড়ে। তোরখাম হচ্ছে খাইবার যাওয়ার করিডোর। এ ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে অনেক মানুষ নিহত হয় ও অনেক মানুষ আহত হয়।

মানুষ জানে না যে, এখন কাবুলে কমিউনিস্ট প্রশাসনের নাভিশ্বাস শুরু হয়েছে। এখন নজীব ও গর্বাচেভ চিৎকার করে বলছে, কোথায় জাতিসংঘ ও কোথায় জেনেভা চুক্তি? কোথায় পর্যবেক্ষকরা? গর্বাচেভ এখন আফগান সমস্যা সমাধানের জন্য চিৎকার করছে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের জন্য, যাতে তাকে আফগানিস্তানে আটকে পড়া অবস্থা থেকে উদ্ধার করা যায়। আর অন্যদিকে সম্মেলনের আবেদন জানাচ্ছি। চিন্তা করে দেখুন, উভয়ের মাঝে কত পার্থক্য। তবে মুজাহিদরা এমনি এমনি এ পর্যায়ে এসে পৌঁছেনি। তারা এ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে অনেক ত্যাগ ও দীর্ঘ রক্তনদী অতিক্রম করে। এ যুদ্ধে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা নব্বই শতাংশই শাহাদাতবরণ করেছে। আফগান মুহাজিরদের সংখ্যা এখন ১২ মিলিয়ন। তম্মধ্যে সাত মিলিয়ন আফগানিস্তানে। তারা ঘর-বাড়ি ছেড়ে বন-জঙ্গল ও পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে। সাড়ে তিন মিলিয়ন পাকিস্তানে, দেড় মিলিয়ন ইরানে। আকিদার কারণেই তাদের এ অবস্থা। নতুবা তারা গ্রাম ও শহরে বাস করতে পারত। নজীব কয়েক বছর ধরে তাদের পাকিস্তান থেকে ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু তারা যায়নি। কারণ তারা দীনদার ও আকিদাধারী। তাদের এ যুদ্ধ প্রথম দিন থেকে আকিদার ওপর ভিত্তি করেই সংঘটিত হয়েছিল। পশ্চিমা ও বামপন্থী মিডিয়া আরববিশ্বে এ ধারণা ছড়িয়ে দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে যে, আফগানিস্তানের এ যুদ্ধ গৃহযুদ্ধ। হ্যাঁ, এ যুদ্ধ আফগানদের সঙ্গে আফগানদের যুদ্ধ বটে। তবে তা দীন ও আকিদাকেন্দ্রিক যুদ্ধ, মুসলিম ও কাফিরের যুদ্ধ, মুমিন ও মুরতাদের যুদ্ধ এবং আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠাকামী ও কমিউনিস্টদের যুদ্ধ। পৃথিবীতে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য এদের সঙ্গে যুদ্ধের বিকল্প নেই।

রাশিয়া আফগানিস্তানের পরাজয়ের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে আমেরিকাকে বলল, আমরা আফগানিস্তান থেকে চলে আসতে চাই। তবে আফগানিস্তানে ক্ষমতায় বসানোর জন্য বিকল্প একজনকে দেন। এ কট্টর মৌলবাদীরা আমাদের জন্য যেমন ক্ষতিকর, তেমনি আপনাদের জন্যও ক্ষতিকর। এরপর তারা জেনেভায় সম্মেলন করে চুক্তি করল যে মুজাহিদদের জিহাদের সব ফল থেকে বঞ্চিত করা হবে।

তারা মাত্র এক বছর আগে মুসলিম ও আরববিশ্বে এসে বলেছে, এ আফগানদের ব্যাপারে আমাদের সহায়তা করুন। আফগানযুদ্ধ, উপসাগরীয়যুদ্ধ ও ফিলিস্তিন সমস্যা একই সূত্রে গাঁথা। তারা বলছে, যদি আমাদের আফগানযুদ্ধ বন্ধকরণে সাহায্য করেন, তাহলে আমরা উপসাগরীয় যুদ্ধ বন্ধ করব এবং ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানের জন্য একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডাকব। তারা জিয়াউল হকের কাছে একজন আরব শাসক পাঠাল, যাতে তিনি তাঁকে জেনেভা চুক্তিতে স্বাক্ষর করাতে রাজি করতে পারেন। তিনি এসে তিন ঘণ্টা পর্যন্ত জিয়াউল হকের কাছে জেনেভা চুক্তিতে স্বাক্ষরের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে বোঝালেন। জিয়াউল হক তাঁকে বললেন, এত দিন আপনারা কোথায় ছিলেন? শেষ মুহূর্তে এসে আফগান বা জিহাদকে লেবাননের লড়াই ও ইসরায়েলি গাড়ির নিচে মাইন পুঁতে রাখার সঙ্গে তুলনা করতে এসেছেন? আফগানিস্তানের জিহাদ দশ বছরের অধিককাল ধরে চলে আসা একটি রক্তাক্ত যুদ্ধ এবং রাশিয়া এতে পরাজিত। তিনি বললেন, রাশিয়া পরাজিত? জিয়াউল হক বললেন, হ্যাঁ, রাশিয়া পরজিত।

আমেরিকা ও পাকিস্তান মিডিয়ার রেকর্ডকৃত যুদ্ধের চিত্র ও ক্ষয়ক্ষতি আমাদের হতবাক করেছে। ১৯৮৮ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত রেকর্ডকৃত হিসাব অনুযায়ী রাশিয়ার ৪১৬০টি যুদ্ধ বিমান ধ্বংস হয়েছে। ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর তিন গুণ সেনাবাহিনী রাশিয়া এ পর্যন্ত আফগানিস্তানে হারিয়েছে। ট্যাংক হারিয়েছে ২০৮০টি। অস্ত্র হারিয়েছে ২১ হাজার। রাশিয়ার দাবিমতে, নিহত ও আহত রাশিয়ান সৈন্যের সংখ্যা ৫০ হাজার। যুদ্ধে রাশিয়ান সৈন্যদের পেছনে প্রতিদিন ব্যয় হয়েছে ৪৫ মিলিয়ন রুপি। জিয়াউল হক তাঁকে বললেন, আপনি কী ভাবছেন? আফগানিস্তানের জিহাদকে কি আপনি ফিলিস্তিন সমস্যার মতো মনে করেছেন? ১৯৭৮ থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত জিহাদ বিরামহীনভাবে চলছে। কাবার তাওয়াফের মতো আফগানিস্তানে জিহাদও একমুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়নি। দিন কিংবা রাত, গ্রীষ্মকাল কিংবা শীতকাল কখনোই কাবার তাওয়াফ একমুহূর্তের জন্যও বন্ধ হয় না। অনুরূপ আফগানিস্তানেও একমুহূর্তের জন্যও জিহাদ বন্ধ হয়নি। কোনো না কোনো এলাকায় গুলি ছোড়া হচ্ছে। আমি মনে

করি না এ দীর্ঘ ১৪ বছরে এক মুহূর্তের জন্য আফগানিস্তান লড়াই থেকে মুক্ত ছিল। তাই মনে করবেন না যে, রাশিয়া এমনিতে বের হয়ে গেছে। পত্রিকায় লেখা হচ্ছে, রাশিয়া আফগানিস্তান থেকে তার সৈন্য প্রত্যাহার করে নিয়েছে। রাশিয়া তার সৈন্যদের এমনিতে প্রত্যাহার করে নিচ্ছে না। সে লজ্জাকর পরাজয় বরণ ও নিজেকে ধ্বংস করার পর আফগানিস্তান থেকে বের হতে যাচ্ছে।

এক রাশিয়ান সৈন্যের স্বীকারোক্তি
আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে রাশিয়ান সৈন্যের কাপড় নষ্ট

কাবুল থেকে ফিরে যাওয়া একজন রাশিয়ান সৈন্যের কাছে রাশিয়ান টেলিভিশন প্রশ্ন করেছে, আফগানিস্তানে তোমাদের দিনকাল কেমন কেটেছে? সে বলল, যখন আমরা আল্লাহু আকবার হুংকার শুনতাম, তখন আমরা কাপড়ের মধ্যে প্রস্রাব করে দিতাম। এ কথা রাশিয়ান টেলিভিশন প্রচার করেছে।

আফগান জিহাদ গর্বাচেভের অন্তরে কমিউনিস্ট চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটিয়েছে। সে এখন কমিউনিজমকে অস্বীকার করতে বসেছে। এ মাসের মধ্যেই তার থেকে কমিউনিস্ট চিন্তাধারা বিদায় নিয়েছে। পত্রিকায় তাদের বিবৃতি পড়ে দেখুন। গর্বাচেভ এখন নতুনভাবে চিন্তা করতে শুরু করেছে। তারা বলেছিল, ধর্ম মানুষের জন্য আফিম। কিন্তু দেখা গেল, এখন ধর্মই পৃথিবীর সর্ববৃহৎ শক্তিকে পরাজিত করছে। তারা বলেছিল, ধর্ম মানুষের রক্ত চোষণকারী জোঁক; কিন্তু দেখা গেল আফগানদের ধর্ম কমিউনিজমের শক্তিধর বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করছে।

ফরাসি সাংবাদিকের চোখে যুদ্ধের ময়দানে অদৃশ্য ট্যাংক

আফগান সীমান্তে আমার সঙ্গে একজন ফরাসি সাংবাদিকের দেখা হয়। সে যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য এসেছে। আমি তাকে বললাম, তুমি কি আল্লাহর ওপর ঈমান রাখো? সে বলল, আমি শুনতাম যে পৃথিবীর একজন সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন। কিন্তু আফগানরা আমাকে আল্লাহর ওপর ঈমান আনতে বাধ্য করেছে। আমি বললাম কিভাবে? সে বলল, যখন আফগানদের দেখি, তারা বিশাল বিশাল ট্যাংক বহরকে পরাজিত করছে। এর মানে যুদ্ধের ময়দানে অদৃশ্য একটি শক্তির হাত রয়েছে, যাকে আমরা দেখছি না। আর তিনি হচ্ছেন আল্লাহ। এটি ফরাসি সাংবাদিকের কথা। আমি তাকে বললাম, তুমি আফগানিস্তানে কত দিন অবস্থান করেছ? সে বলল, চার মাস। আমি বললাম,

তুমি কিভাবে মুজাহিদদের মতো জীবন যাপন করলে? বলল, এটা সহজ। সকালে একবার চা ও রুটি। দুপুরে আরেকবার চা ও রুটি। তবে আপনারা মনে করবেন না যে আফগানরা এত সহজে এ অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে।

আফগান জনগণের ট্র্যাজেডি

এখন আফগানিস্তানের প্রতিটি ঘর মাতম ও এতিমখানায় পরিণত। সবাই একে অপরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করছে। বলছে, আমার আব্বা কোথায়? বলা হচ্ছে, তারাকির আমলে নিহত হয়েছে। বলছে, আমার বড় ভাই কোথায়? বলা হচ্ছে, হাফিজুল্লাহ আমিনের আমলে নিহত হয়েছে। বলছে, আমার বোন কোথায়? আমার মা কোথায়? বলা হচ্ছে, অমুক জায়গায় লাশের সঙ্গে দাফন করা হয়েছে। আমাদের এখানে মুস্তারি নামে একজন ড্রাইভার আছে। লোকজন বলল, শায়খ আবদুল্লাহ, আপনি এর ঘটনা শুনেছেন? তখন আমি তাকে বললাম, তার ঘটনা খুলে বলতে। সে বলল, আমাদের পরিবারের লোকসংখ্যা ১২ জন। আমি বাজারে গিয়েছিলাম। আমি যাওয়ার পর বিমান এসে আমাদের ঘরের ওপর বোম ফেলে চলে যায়। আমি এসে দেখলাম ঘর ও লোকজন কেউ নেই। দেখলাম এদিক-সেদিক কিছু গোশতের টুকরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। আমি মাটির ওপর থেকে গোশতের টুকরাগুলো নিয়ে একত্র করতে লাগলাম। এতে ১২ জন লোকের ১২ কেজির মতো গোশত পাওয়া গেল।

উত্তর আফগানিস্তানে আমার দেখা আল্লাহর কিছু সাহায্য

আমি উত্তর আফগানিস্তানের একটি পাহাড়ে উঠেছিলাম। পাহাড়টি চার হাজার মিটার উঁচু। সেখানে বরফ জমেছে। পা রাখলে পিছলে যায়। কিন্তু আমাদের উঠতেই হবে। বাধ্য হয়ে আমি উভয় পায়ের সঙ্গে সঙ্গে উভয় হাতও মাটিতে রেখে ওপরে উঠতে লাগলাম। আফগানরা তাদের রসদ ও খাবার নিয়ে ওপরে উঠছে। আমি আমার জ্যাকেটটিও সঙ্গে নিতে পারলাম না। ওঠার পথে কিছু মৃত ঘোড়া ও গাধা দেখতে পেলাম। এগুলো ক্লান্ত হয়ে পাহাড়ের ওপর থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। তুমি উভয় পা ও হাত দিয়ে ওঠার সময় কোনো মাটি চেপে ধরতে বা কোনো মৃত গাধায় হেলান দিতে চাইবে। আমরা ফজরের নামাজ পড়ে রওনা দিয়ে মাগরিবের আজান পর্যন্ত পাহাড়ের চূড়ায় গিয়ে পৌঁছতে পারিনি। একজন লোককে দেখলাম, সে তার গাধাসহ পাহাড় থেকে পড়ে যাচ্ছে। সে গাধাকে থামানোর অনেক চেষ্টা করল। না পেরে গাধা তার

পিঠে থাকা মালামাল বাদ দিয়ে সে নিজে নিজে মৃত্যুমুখে পতিত হলো। তোমরা কি বিশ্বাস করবে, গাধা ও খচ্চর আত্মহত্যা করে? হ্যাঁ, আফগানিস্তানে অত্যধিক ক্লান্তির দরুণ গাধা, খচ্চর ও ঘোড়া নিজেদের আর স্থির রাখতে না পেরে পাহাড় থেকে পড়ে গিয়ে আত্মহত্যা করে।

৯০ থেকে ১০০ কেজি ওজনের এক আরব যুবক ক্লান্তির দরুণ বলল, আমি আর উঠতে পারব না। আমাকে ছাড়ুন, আমি মরলে এখানে মরব। তারা তাকে ছেড়ে চলে গেল। সে বরফের মাঝে ঘুমের ব্যাগের ওপর শুয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করছে। রাতে সে অদৃশ্য থেকে আওয়াজ শুনতে পায়, আল্লাহ তোমার সঙ্গে রয়েছেন। ক্ষুধা ও ঠাণ্ডায় তিন দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর ওই পথ দিয়ে যাওয়া একটি কাফেলা তাকে দেখতে পায়। তারা তাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু তার পা বরফের কারণে অবশ হয়ে গিয়েছিল। ফলে হাসপাতালে নেওয়ার পর তার পায়ের আঙুল কেটে ফেলতে হয়। এ রকম কত মানুষ বরফের মধ্যে মরে গেছে তার হিসাব নেই। এমনকি ছয় মাস পর বরফ গলে যাওয়ার পরও অনেক মৃতদেহ মানুষের নজরে আসে। এক মহিলা তার শিশুপুত্রকে নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার সময় ক্লান্তির দরুণ তাকে রেখে চলে যায়। কারণ তাকে নিয়ে উঠতে গেলে উভয়ের মৃত্যু নিশ্চিত। তাই সে বাধ্য হয়ে তার ছেলেকে রেখে চলে যায়। আট দিন পর সে মুজাহিদদের কাছে এসে বলল, পাহাড়ের অমুক জায়গায় বরফের নিচে আমার ছেলে রয়েছে। আপনারা তাঁকে খুঁজে এনে দাফন করলে ভালো হয়। মুজাহিদরা তার দেখানো জায়গায় গিয়ে বরফ ওঠালে দেখতে পায় যে তার ছেলে জীবিত।

বাস্তবেই আফগানিস্তানের কাহিনী খুব শোকাবহ ও দুঃখজনক। সঙ্গে সঙ্গে যারা পরাধীনতা থেকে মুক্ত হতে চায়, তাদের জন্য তা গৌরব ও ইজ্জতের লড়াইও বটে। তাই তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেন–

إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا○

আর তোমরা যদি কষ্টের সম্মুখীন হও, তাহলে তো ওরাও তোমাদের ন্যায় কষ্টের সম্মুখীন হচ্ছে এবং তারা আল্লাহর কাছে যা আশা করে না, তোমরা সেটার আশা করছ। *[নিসা ৫:১০৪]*

গুণ আফগানদের চিরসঙ্গী

আমি আফগানদের সঙ্গে আট বছর ধরে বাস করছি। দিন দিন তাদের প্রতি আমার বিশ্বাস ও ভক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। হ্যাঁ, তারা পৃথিবীর অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মতো একটি জনগোষ্ঠী। তাদের মধ্যে সর্বপ্রকার দোষও বিদ্যমান। আমি তাদের দোষের ব্যাপারে অবহিত। তবে তাদের গুণ, তাদের দৃঢ়তা, তাদের আতিথেয়তা, তাদের বীরত্ব ও তাদের লজ্জাবোধ সব দোষ-ক্রটিকে ঢেকে রেখেছে। তাদের মধ্যে চোর, মিথ্যুক ও মাদকসেবী রয়েছে। কিন্তু এসবের মাঝে একটি খাঁটি ও উন্নত জনগোষ্ঠীও রয়েছে। পৃথিবীর কোথাও এ রকম একটি জনগোষ্ঠী আছে বলে আমার জানা নেই।

আফগান যুবকদের থেকে আমি যা শিখেছি

আফগান যুবকরা আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। তারা আমাকে শিখিয়েছে ফিলিস্তিনকে ইহুদিদের হাত থেকে ফিরিয়ে আনা সহজ ব্যাপার। শুধু সহজ নয়, ইনশাআল্লাহ খুবই সহজ। আমি এ ব্যাপারে পূর্ণ আশাবাদী। আমাদের কাছে যদি দুই হাজার ফিলিস্তিনি যুবক এসে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে ও যুদ্ধের কৌশল শিখে নেয় এবং তাদের কাছ থেকে গোয়েন্দাদের ভয় দূর হয়ে যায়, তাহলে আমি নিশ্চিত, ফিলিস্তিনকে স্বাধীন করা সম্ভব। ফিলিস্তিনিরা যেখানে যায়, সেখানে গোয়েন্দাদের ভয়ে ভীত থাকে। আলহামদুলিল্লাহ। এখানে আমাদের গোয়েন্দাভীতি দূর হয়ে গেছে। জিহাদ মানুষের মনকে রিজিক ও মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্ত করে।

وَهَانَ فَمَا اُبَالِي بِالرَّزَايَا لِاَنِّي مَا انْتَفَعْتُ بِاَنْ اُبَالِي

বিপদকে ভয় করা সাজে না কখনো আমার
কেননা আমি বিপদকে ভয় করে পাইনি কোনো উপকার

এখানে এসে আরব যুবকদের অন্তর পরিপক্ব হয়েছে ও তাদের হিম্মত উন্নত হয়েছে। বিশেষ করে ফিলিস্তিন ও জর্দানের যুবকদের, যারা ইনশাআল্লাহ ফিলিস্তিন মুক্ত করার পবিত্র জিহাদের উপকরণ হবে বলে আশা করছি। আট বছর ধরে আমি এখানকার এ কণ্টকাকীর্ণ ও মিষ্টি পথে অবস্থান করার ফিলিস্তিনে আমার দেশবাসী বলাবলি করছে, শায়খ আবদুল্লাহ আয্যাম আফগান সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত। আফগান সমস্যা কি ফিলিস্তিন সমস্যা থেকে গুরুত্বপূর্ণ? হে যুবক ভাইয়েরা, হতে পার তুমি ফিলিস্তিন, আফ্রিকান, পাকিস্তান, ইরান, ইরাক,

ভারত বা বিশ্বের যেকোনো দেশের; তোমরা কি জান না, বিশ্বের সব মুসলিমই ভাই-ভাই? তাই এ খবরটি বিশ্বের সব যুবকের কানে কানে পৌঁছে দাও যে, আজই যুদ্ধের ডাক এসেছে, এক্ষুনি এবং এ মুহূর্তেই যার যার অবস্থান থেকে যেন যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। কারণ আজ ইহুদি বেঈমানরা বিশ্ব মুসলিমদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়নের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে। ইসলামকে তারা ধ্বংস করে দিচ্ছে। তাই আর বসে থাকার সময় নেই। আল্লাহর এ আয়াতের দিকে লক্ষ করে দেখুন, সময় হয়েছে কি না? যুদ্ধের প্রস্তুতির ব্যাপারে আল্লাহ বলেন–

> وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ.
>
> আর তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি অর্জন করবে। (বা প্রস্তুতি গ্রহণ করবে) অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে। এর দ্বারা তোমরা ভীতসন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ তায়ালার শত্রুকে এবং তোমাদের শত্রুকে। অন্যদেরও, যাদের তোমরা জান না কিন্তু আল্লাহ তায়ালা জানেন। আর তোমরা আল্লাহ তায়ালার পথে যা কিছু ব্যয় করবে, তার পূর্ণ প্রতিদান তোমাদের দেওয়া হবে এবং তোমাদের প্রতি একটুও জুলুম করা হবে না। *[আনফাল ৮:৬০]*

মহান আল্লাহ আরো বলেন–

> فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
>
> মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা করো, তাদের বন্দি করো ও অবরোধ করো এবং সর্বত্র তাদের জন্য ওত পেতে থাকো। এরপর যদি তারা তওবা করে এবং নামাজ আদায় করে, জাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান। *[তাওবা ৯:৫]*

আফগানিস্তান থেকে ফিলিস্তিন

হিন্দুকুশে আহত হওয়া মুজাহিদদের রক্ত বাইতুল মুকাদ্দাস মুক্তকারী ফিলিস্তিনের যুবকদের জন্যই প্রবাহিত হচ্ছে। আমি দেখছি হেলমন্দের আশপাশে আহত ও নিহত হওয়া শিশুরা গাজা, হাইফা, ইয়াফা, নাবলুস ও আল খলিলের শিশু ও বিধবাদের আর্তচিৎকার পুনরাবৃত্তি করছে। তোমরা কি আমাকে পাথর মনে কর, যার কোনো রক্ত নেই এবং দেশ পরিবার বাইতুল মুকাদ্দাস ও পবিত্র ভূমির প্রতি, যার কোনো টান নেই।

আমরা ও আফগানিস্তানে আসা প্রতিটি ফিলিস্তিনি ও জর্দানি যুবকের চিন্তা জিহাদের এ উজ্জ্বল চিত্র মসজিদুল আকসা, আল খলিল ও বেথেলহেমে ফুটিয়ে তোলা। আমরা আফগানিস্তানে এসেছি এখান থেকে আল্লাহ চাহে তো জিহাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন করে তা ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমিতে প্রয়োগ করার জন্য।

কামনা আমার শাহাদাত

গৌরব ও বীরভূমি আফগানিস্তানে শাহাদাতবরণকারী যুবকদের কথা মনে পড়লে আমার নিজেকে ছোটই মনে হয়। কারণ কয়েক বছর ধরে আমি শাহাদাতের সন্ধান করছি। এই যুবকদের কামনা তিনি পূরণ করেছেন। কিন্তু আমার কামনা আল্লাহর কাছে এখনো প্রত্যাখ্যাত হয়ে আছে। তাই আমার মনে হয়, আমি এখনো আল্লাহর কাছে সম্মানের পাত্র হইনি। যদি আমি তাঁর কাছে সম্মানের পাত্র হতাম, তাহলে এ যুবকদের মতো আমাকেও তিনি শাহাদাতের জন্য নির্বাচিত করতেন।

হে যুবক ভাইয়েরা, মুজাহিদের অনেক কারামত প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তারা কারামতের কারণে বিজয় অর্জন করেনি। তারা বিজয় অর্জন করেছে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের কারণে। তাদের আকিদা মানুষের অন্তরে নতুনভাবে জাগ্রত করেছে। তারা পৃথিবীর সবচেয়ে দুর্বল, পশ্চাৎপদ, দরিদ্র ও নিরক্ষর জনগোষ্ঠী। তাদের আল্লাহ পৃথিবীর সর্বাধিক সেনাবাহিনীর রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের মোকাবিলা করার জন্য নির্বাচিত করেছেন। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা সোভিয়েত ইউনিয়নকে পরাজিত করে আমাদেরকে তাঁর এ কথার সত্যতা দেখিয়ে দিয়েছেন–

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

আল্লাহর হুকুমে অনেক ক্ষুদ্র দল অনেক বড় দলের ওপর বিজয় লাভ করেছে। আল্লাহ রয়েছেন ধৈর্যশীলদের সঙ্গে। *[বাকারা ২:২৪৯]*

এক মুজাহিদ ভাইয়ের কারামত

কথা অনেক দীর্ঘ। আমি এখন একজন যুবক মুজাহিদের কারামতের ঘটনা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। যুবকটির নাম আহমাদ ফাইজ। সে পাঞ্জশিরের রণক্ষেত্রে আহত হওয়ার খবর পেয়ে তার পরিবারের লোকজন এসে তাকে একটি গাছের খাটে তুলে নেয়। রাস্তা দুর্গম ও উচুঁ-নিচু হওয়ায় তারা তাকে রশি দিয়ে খাটের সঙ্গে বেঁধে নেয়, যাতে পড়ে না যায়। রুশ বাহিনী তাদের দেখার পর গুলি করে সবাইকে হত্যা করে। ভাই আহমাদ ফাইজ এবারসহ দুবার গুলিবিদ্ধ হলো। গুলিতে তার পেটে ছিদ্র হয়ে যায়। কিন্তু সে তখনো জীবিত। সে বলল, আমি চোখ খুললাম। চোখ খুলে দেখি আমি রশিতে বাঁধা। আমার পা ভেঙে যাওয়ায় নড়াচড়া করা সম্ভব হচ্ছিল না। আর আমার শরীরে বাঁধা রশিগুলোও খোলা সম্ভব হয়নি। তখন আমি বললাম, আল্লাহ, আপনি যেভাবেই হোক আমাকে বাঁচান। বলে আমি আশা ছেড়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। অতঃপর জাগ্রত হয়ে দেখলাম রশিগুলো খুলে গেছে। তখন আমি চাইলাম নদীর ওপারে যেতে।

নদী ছিল বড় ও প্রবহমান। সুস্থ হলেও আমার পক্ষে এ নদী পার হওয়া সম্ভব ছিল না। আর এখন যেহেতু পেটে ভর দেওয়া ছাড়া আমার পক্ষে নড়াচড়া করাও সম্ভব নয়, সেহেতু এ নদী পার হওয়া তো কল্পনাতীত ব্যাপার। তাই আমি আশাহত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর দেখি আমি নদীর ওপারে। এরপর আমি তেরো দিন পেটে ভর দিয়ে চললাম। আমার কাছে কোনো খাবার ছিল না। এ সময় ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর দেখতাম যেন আমি এখনই খাবার খাওয়া শেষ করলাম। এরপর আমি আরেকটি নদীর সম্মুখীন হলাম। তখন আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম থেকে উঠে দেখি আমি নদীর ওপারে। অতঃপর আরো তেরো দিন বুকে ভর দিয়ে চললাম। এরপর একটি পরিত্যক্ত ঘর দেখে তাতে প্রবেশ করলাম। সেখানে একটি দুধের থলে ছাড়া আর কিছুই ছিল না। দুধের থলেটা যেন আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। দুধগুলো পান করে নিলাম। রাতে মুজাহিদরা এ ঘরে ঢুকে একটি রক্তাক্ত ও কর্দমাক্ত আজব প্রকৃতির মানুষ দেখতে পেয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়। তখন আমি ডাক দিয়ে বললাম– আস, আমি আহমাদ ফাইজ।

মুজাহিদরা আমাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি কিভাবে বেঁচে গেলে? আমরা তো মনে করেছি তুমি মারা গেছ। এরপর সে তাদের তার ঘটনা খুলে বলল। আহমদ ফাইজ এখনও মুজাহিদদের সঙ্গে জিহাদরত। যেদিন সে তার মুজাহিদ ভাইদের এ ঘটনা বলেছে, সেদিন রাতে অদৃশ্য থেকে একটি আওয়াজ আসে যে, তুমি এটা মানুষকে বলে বেড়িও না। এটা আমার ও তোমার মধ্যকার গোপন ব্যাপার। আমি এ কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং আমার ও তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ওয়াস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এরপর শহীদ আয্যাম রহ. এভাবে দোয়া করলেন–

اللهُمَّ مَكِّنْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ الْأَرْضِ. اللهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى. اللهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ. اللهُمَّ أَحْيِنَا سُعَدَاءَ وَأَمِتْنَا شُهَدَاءَ. وَاحْشُرْ فِيْ زُمْرَةِ الْمُصْطَفَى. صَلَّ اللهُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. اللهُمَّ انْصُرِ الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ أَفْغَانِسْتَانَ وَفِيْ فَلِيسطِيْنَ وَفِيْ لُبْنَانَ وَفِيْ كُل مَكَانٍ. اللهُمَّ ارْفَعْ رَايَةَ الإِسْلَامِ وَحَكِّمْ دَوْلَةَ الْقُرْآنِ وَاجْعَلْنَا مِنْ جُنُوْدِ الْقُرْآنِ. وَصَلَّي اللهُ عَلي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه وَسَلَّمَ.

হে আল্লাহ, মুমিনদের পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দান করুন। হে আল্লাহ, আমরা আপনার কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ জান্নাত ফিরদাউস কামনা করছি। হে আল্লাহ, আমাদের আপনার স্মরণ, কৃতজ্ঞতা ও সুন্দরভাবে ইবাদত করার তাওফিক দিন। হে আল্লাহ, আমাদের পুণ্যবান জীবন ও শহীদি মৃত্যু দান করুন এবং মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দলভুক্ত করে পুনরুত্থিত করুন। হে আল্লাহ, মুজাহিদদের আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন ও লেবাননসহ সব স্থানে বিজয় দান করুন। হে আল্লাহ, ইসলামের ঝাণ্ডাকে উন্নত রাখুন, কুরআনের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে দিন এবং আমাদের কুরআনের সৈনিকদের অন্তর্ভুক্ত করুন। হে আল্লাহ, আমাদের নেতা মুহাম্মদ, তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবিদের ওপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা কী চায়

কিছু লোক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে। তাদের বলতে চাই, আমরা কি আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু প্রাণকে সামান্য ভূখণ্ডের জন্য উৎসর্গ করব? ফিলিস্তিনের মাটি আর ফুজাইরার মাটির মূল্য তো একই। ঘর তো আমার, যেখানে ইচ্ছা সেখানে নির্মাণ করা সম্ভব। ব্যাপার তো জমি আর মাটির নয়। ব্যাপার হচ্ছে দীনের, আকিদার, পবিত্র ভূমির, মসজিদুল আকসার ও সেসব লোকের, যারা হুর ও জান্নাত লাভের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। যদি জান্নাত ও হুর না পাই, তাহলে কেন আমি নিজের প্রাণ উৎসর্গ করব? যেসব বামপন্থী ফিলিস্তিনের প্রচারমাধ্যম দখল করে রেখেছে, তারা ফিলিস্তিনের পবিত্র সন্তানদের ১৯৬৯ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত ফিলিস্তিনের জিহাদে অংশগ্রহণ করিয়েছিল। তখন তাদের রেডিওতে বলা হতো, যুবকরা ইমবিরিয়ালিয়ার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে লড়েছে। অথচ যুবকরা ইমবিরিয়ালিয়া কি চেনে না। তাদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় ইমবিরিয়ালিয়া কী? তাহলে হয়তো সে ভাববে ইমবিরিয়ালিয়া রাশিয়ার একটি শহর। আমি কি আমার প্রাণ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসর্গ করব? যেমন তুরস্ক, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ ও সরকারি চাকরি করতে গেলে হিজাব খুলে যেতে হয়। জর্জ হাবশ, রায়াহ গাদি ও নায়েফ হাওয়াতিমা এখন আরব আমিরাতে। আমি জানিনা এরা ফিলিস্তিনে কী করতে চায়? এরা ফিলিস্তনের সন্তানদের তাদের দীন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। এরা ফিলিস্তিনের নামে পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা ১৯৬৯ সালে জিহাদ করার সময় যখন আল্লাহু আকবার বলতাম, তখন নায়েফ হাওয়াতিমার গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বলত–

اِنْ تَسْأَلْ عَنِّي فَهٰذِهِ قِيَمِي   اَنَا مَارْكَسِيْ لِيْنِيْنِي اُمَمِيْ

> আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো, আমার মূল্যবোধ কী? তাহলে শোন,
> আমি মার্কসবাদী, লেনিনবাদী ও জাতীয়তাবাদী।

এরা ফিলিস্তিনের যুবকদের নষ্ট করেছে। এখনো তারা ধর্মনিরপেক্ষবাদ, বামপন্থা ও সমাজবাদের নামে যুবকদের ধ্বংস করছে। রেডিওর প্রোগ্রাম শুরু হয় এই বলে–

اَنَا يَا أَخِي اٰمَنْتُ بِالشَّعْبِ الْمُضِيْعِ وَالْمُكْبِلِ

وَحَمَلْتُ رَشَاشِي لِتَحْمِلَ الاَجْيَالُ مِنْ بَعْدِنَا مِنْجَلْ

> হে ভাই, আমি ঈমান এনেছি ধ্বংস ও বিতাড়নের শিকার

জনগোষ্ঠীতে এবং নিয়েছি অস্ত্র হাতে, যাতে নিতে পারে পরবর্তী প্রজন্ম কাস্তে হাতে।

ফিলিস্তিনের লড়াই কি কমিউনিজমের আন্তর্জাতিক প্রতীক কাস্তের জন্য? ওহে বস্তুবাদীরা, তোমরা তোমাদের প্রাসাদে থেকে মনে করছ যে ফিলিস্তিনের যুবকরা তোমাদের পক্ষ নিয়েছে। তোমরা বোকার স্বর্গে বাস করছ। এ ফিলিস্তিনি যুবকদের আন্দোলিত করছে ইসলাম, মসজিদুল আকসা ও শাহাদতস্পৃহা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন–

لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ سَبْعُ خِصَالٍ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ، وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُحَلَّى حُلَّةَ الإِيمَانِ، وَيُزَوَّجُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الأَكْبَرِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيَشْفَعُ فِي سَبْعِينَ إِنْسَاناً مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ.

শহীদের জন্য তার প্রভুর কাছে সাতটি পুরস্কার রয়েছে। তার রক্ত প্রবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ক্ষমা করা হবে, তার জান্নাতের আসন দেখানো হবে, কবরের আজাব থেকে তাকে রক্ষা করা হবে। কিয়ামতের বিভীষিকা থেকে নিরাপদ রাখা হবে, একটি সম্মানের তাজ পরানো হবে, যার একটি ইয়াকুত দুনিয়া ও তাতে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম, বাহাত্তরটি ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুরের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হবে ও তার পরিবারের জাহান্নামে প্রবেশযোগ্য সত্তরজনকে ক্ষমাকরণে তার সুপারিশ গৃহীত হবে। *[হাদিসটি সহিহ ও ইমাম আহমদ তিরমিজি ও ইবনে হাব্বান কর্তৃক বর্ণিত]*

ইসরায়েল ধ্বংসের জন্য দুই হাজার মুজাহিদ যথেষ্ট

এ ব্যাপারে শত ভাগ নিশ্চিত যে, যদি আমার হাতে আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়নকারী ও শাহাদাত কামনাকারী দুই হাজার মুজাহিদ থাকে, তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা ইসরায়েলকে ধ্বংস করতে সক্ষম হব। প্রশ্ন আসতে পারে, আমরা কিভাবে ইসরায়েল পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হব? এর উত্তর একটাই– যদি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা আমাদের সততা ও নিষ্ঠা দেখেন, তাহলে তিনি অবশ্যই আমাদের জন্য পথ খুলে দেবেন, যেমন খুলে দিয়েছেন

আফগানিস্তানে। চিরঞ্জীব আল্লাহ ব্যতীত আমাদের কোনো কিছু করার ক্ষমতা নেই।

আফগান জিহাদে আল্লাহর সাহায্যের নমুনা

আমি বলছি, আফগানিস্তান তার ত্যাগের বিনিময়ে গন্তব্যে পৌঁছে গেছে। মানুষ এখন আফগানিস্তান নিয়ে আশঙ্কায় ভুগছে। আবার এও ভাবছে, আল্লাহর সাহায্য আমাদের সঙ্গে আছে। বিশ্বাস করুন, রাশিয়া, আমেরিকা ও চীন থেকে শুরু করে গোটা পৃথিবী মুজাহিদদের হাতে ক্ষমতা না যাওয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী কার্লচলিকে ন্যাটোর প্রতিরক্ষামন্ত্রীরা এক বৈঠকে বলল, মনে হচ্ছে গর্বাচেভ পাশ্চাত্যের ব্যাপারে তাঁর রাজনীতিতে পরিবর্তন আনছেন। কারণ, তিনি ঘোষণা দিয়েছেন যে, পূর্ব ইউরোপ থেকে তিনি শিগগিরই ১০ লাখ সৈন্য ফিরিয়ে নেবেন। কার্লচলি বললেন, আপনারা কি এটা বিশ্বাস করেন, আফগানরা বিশ্ব নিয়ে গর্বাচেভের যে চিন্তাধারা ছিল তাতে পরিবর্তন এনে দিয়েছে?

রিগ্যান হেকমতিয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য কত চেষ্টা করেছে! কিন্তু হেকমতিয়ার তা বারবার প্রত্যাখ্যান করেছেন। পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত বললেন, আপনি কি পাগল? ৬০ জন রাষ্ট্রপ্রধান রিগ্যানের সঙ্গে সাক্ষাতের আবেদনের তালিকায় রয়েছেন। কিন্তু রিগ্যান তাঁদের সময় পিছিয়ে দিচ্ছেন এবং না করে দিচ্ছেন। আর আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাওয়ার পরও আপনি তা প্রত্যাখ্যান করছেন! হেকমতিয়ার বললেন, হ্যাঁ! যদি তোমরা বেশি চাপাচাপি কর, তাহলে আমি এখনই আমেরিকা ছেড়ে চলে যাব। জাতিসংঘ প্রতিনিধি কর্ডফেজ ইউনুস খালিসের সঙ্গে কতবার সাক্ষাৎ করতে চেয়েছেন। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। রাশিয়ার পররাষ্ট্র প্রতিনিধি ফ্রান্টসফ গত অক্টোবরে জাতিসংঘের শেষ অধিবেশনে বলেছেন, আমি রব্বানির সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ করতে চাই। রব্বানি বললেন, না। সাক্ষাৎ করলে প্রকাশ্যে ও পৃথিবীর লোকেরা জানে এভাবে করতে হবে। বললেন, তাহলে রাশিয়ায় হোক। রব্বানি বললেন, না, কোনো ইসলামী রাষ্ট্র– যেমন পাকিস্তান বা সৌদি আরবে হতে হবে। এ কথা বলে রব্বানি জাতিসংঘ থেকে সৌদি আরবে চলে এলেন। সৌদি আরবে আসার পর টেলিফোন এল যে, রাশিয়ানরা রব্বানির সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য সৌদি আরবে যেতে প্রস্তুত। কিন্তু কিভাবে আসবে? সৌদি আরবে তো তাদের দূতাবাস নেই! বাদশা ফাহাদের কাছে অনুমতি চাও। রাশিয়া বাদশা ফয়সালের আমলে দূতাবাস খোলার অনুমতি চেয়ে ব্যর্থ হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, যারা

আল্লাহকে চেনে না, তাদের আমরাও চিনি না।

অনুমতি চাওয়ার পর বাদশা তাদের প্রবেশের অনুমতি দেন। ফ্রান্টসফ তার দল নিয়ে এলেন। রব্বানি বললেন, আমাদের তিনটি শর্ত। প্রথমত, সম্মেলনকক্ষে তোমাদের আগে প্রবেশ করতে হবে, যাতে আমরা প্রবেশ করলে তোমরা দাঁড়িয়ে আমাদের সম্মান করতে পার। তাঁরা বললেন, ঠিক আছে। দ্বিতীয়ত, আমরা তোমাদের সঙ্গে করমর্দন করব না। তৃতীয়ত, আফগানিস্তানের ভবিষ্যৎ সরকার গঠনে তোমরা কোনো প্রভাব খাটাতে পারবে না। নজিবের সরকারই তোমাদের শেষ সরকার। আলোচনা শুরু হলো। ফ্রান্টসফ শুধু একটি আবেদনই করলেন। আর তা হচ্ছে, নজিবের সরকারে মুজাহিদদের পক্ষ থেকে তিনজন ক্ষমতাসীন হওয়া, যাতে আমরা বিশ্বকে বলতে পারি, আমরা মুজাহিদদের সঙ্গে চুক্তি করে আফগানিস্তান থেকে বের হয়ে এসেছি। তাঁর এ কথায় তাঁকে বলা হলো, ইসলাম যেখানে মুরতাদকে বেঁচে থাকার অধিকার দেয় না, সেখানে আমরা কিভাবে কমিউনিস্ট নজিবকে আমাদের সঙ্গে দেশ শাসনের অধিকার প্রদান করতে পারি? আমরা একজন কমিউনিস্টকেও আমাদের সরকারে গ্রহণ করব না। দেখুন, ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়াকে আঁকড়ে ধরে মুজাহিদরা মর্যাদার কত শীর্ষে আরোহণ করেছেন।

এ যুদ্ধ কেবল আকিদা ও দীনকেন্দ্রিক যুদ্ধ

জিহাদের প্রতি বিদ্বেষ ও ভয়ের কারণে বিশ্ব সম্প্রদায় এখন বলা শুরু করেছে যে, আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ চলছে। আমরা বলতে চাই, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু জাহলের মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সেটাও তাহলে গৃহযুদ্ধ। কারণ আবু জাহল ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ে মক্কার অধিবাসী ছিলেন। অতএব, বদর, উহুদ, খন্দকসহ প্রায় যুদ্ধই গৃহযুদ্ধ ছিল। এখন তাহলে মুসলমানরা এসব যুদ্ধকে কোন ধরনের যুদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করবে? মূলত আমাদের দীন গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করেছে। তবে এ যুদ্ধ কেবল আকিদা ও দীনকেন্দ্রিক যুদ্ধ।

আল্লাহর সাহায্যে আফগানিস্তানের কমিউনিস্টদের পরিণাম

আফসোস, যদি আরববিশ্বের বামপন্থীরা এসে আফগানিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির পরিণাম দেখে যেত! রাশিয়া যখন তার সৈন্যদের ফিরিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দিল, তখন রুশ সৈন্যরা এসে মুজাহিদদের কাছে আফগান

কমিউনিস্টদের বিক্রি করার প্রস্তাব দেয়। একজন কমিউনিস্টের মূল্য আড়াই ডলার পর্যন্ত পৌঁছেছে।

এরা তাদের ছাগলের মতো বিক্রি করে দেওয়া শুরু করে। এরা যাওয়ার আগে মুজাহিদদের কাছে একজনকে পাঠিয়ে প্রস্তাব দিত যে, অমুক কেন্দ্রে ১০০ জন কমিউনিস্ট আছে। আড়াই শ ডলার দিয়ে ওদের যা ইচ্ছা তাই করুন। প্রথমে আমি এটা বিশ্বাস করতাম না। কাবুলের যেসব মুজাহিদ নেতাদের সঙ্গে এ ঘটনা ঘটেছে, তারা যদি আমাকে সরাসরি না বলতেন, তাহলে এটাকে আমি কখনোই বিশ্বাস করতাম না। মুজাহিদরা কমিউনিস্টদের অর্থ দিয়ে কিনে হত্যা করেছে। রুশ সৈন্যরা তিনটি মুরগির বিনিময়ে কমিউনিস্ট পার্টির অফিস বিক্রি করে দিয়েছে। রাশিয়া আফগানিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টিকে মুজাহিদদের সামনে যেন বাঘের সামনে ছাগল রেখে যাওয়ার মতো রেখে চলে গেছে। তা যদি আরববিশ্বকে ধ্বংসকারী কমিউনিস্ট জর্জ হাবশ, মাহমুদ দরবেশ ও হেনা আলজাবেরিরা এসে প্রত্যক্ষ করে যেত!

মানুষ আফগানিস্তান নিয়ে শঙ্কা বোধ করছে যে, ভবিষ্যতে মুজাহিদদের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হবে। মুজাহিদরা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। অবশ্যই এ নিয়ে পুরো বিশ্বে হইচই শুরু হয়ে গেছে। রাশিয়া ধ্বংস হওয়ার জন্য যে আমেরিকানরা এ জিহাদ নিয়ে ছয়-সাত বছর ধরে আনন্দিত, তারা পর্যন্ত মুজাহিদদের ব্যাপারে আশঙ্কায় ভুগছে।

মসজিদুল আকসা পুনরুদ্ধারই মূল উদ্দেশ্য

আমেরিকা মুজাহিদদের প্রতি সন্তুষ্ট নয়। কারণ তারা মৌলবাদী ও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অনড়। তারা তাদের রাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম ধারায় উল্লেখ করছে, আমাদের রাষ্ট্র জিহাদের রাষ্ট্র, যার প্রথম করণীয় হচ্ছে মসজিদুল আকসাকে উদ্ধার করা। আমেরিকা সৌদি আরবকে বলেছে, মুজাহিদদের সরকারকে তোমরা কিভাবে স্বীকৃতি দান করলে, অথচ আমরা এখনো তাদের স্বীকৃতি দিইনি। তোমরা এ মারাত্মক কাজ কিভাবে করলে?

জিহাদের প্রভাব

প্রায় এক বছর ধরে আমেরিকা মুজাহিদ নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। সাইয়াফ আমেরিকান প্রতিনিধি লামকোস্টকে বলেছেন, তোমরা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দুষ্ট লোক। তোমরা ইসলামকে ঘৃণা কর। তোমরা রক্ত

পিপাসু। তোমরা আমাদের জিহাদের ফল থেকে বঞ্চিত রাখার ষড়যন্ত্র করছ।

মার্কিন পররাষ্ট্র প্রতিনিধি সাইয়াফকে বলেছে– তিনি জংলি লোক, আমি যে মার্কিন পররাষ্ট্র প্রতিনিধি তা সবাই জানে কিন্তু এ লোক জানেন না। তার কথায় সাইয়াফের চেহারা লাল হয়ে যায়। সাইয়াফ বললেন, আমরা ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে চাই। আমাদের কাছে তোমাদের প্রয়োজন নেই। তোমরা চলে যাও। অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করবে, কর। আফগানরা অর্থনৈতিক অবরোধকে ভয় করে না। তারা রুটি ও চিনি ছাড়া চা খেয়ে থাকতে পারে। তাদের দেশে চা উৎপন্ন হয়। হ্যাঁ, পশ্চিমা দেশগুলো গম, চাল ও চিনি উৎপন্ন করে, যা আফগানদের প্রয়োজন মেটায়। এর পরও দুনিয়াকে তারা সালাম জানিয়ে দেশ পরিচালনা করতে পারবে। তাদের রাষ্ট্রীয় বাজেট কোনো দেশের প্রতি মুখাপেক্ষী নয়। লোগারে তাদের কাছে তামার খনি আছে। রাশিয়া এ তামার মূল্য থেকে প্রতিবছর এক বিলিয়ন ডলার নিয়ে নিত। শিবরগানে তাদের গ্যাসের খনি আছে। তা থেকে বছরে সত্তর বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপন্ন হয়। রাশিয়া তা থেকে নিজের প্রয়োজন সেরে প্রতিবছর পশ্চিমা দেশগুলোকে পাঁচ শ মিলিয়ন ডলারের মতো বিক্রি করত। কান্দাহারে তাদের ইউরেনিয়ামের খনি আছে। পাঞ্জশিরে মরকত (মণি) উৎপন্ন হয়, যার অর্ধাঙ্গুল পরিমাণ একটি টুকরা বিক্রি হয় অর্ধ মিলিয়ন ডলারে। জাইয়ুন নদীর তীরে স্বর্ণ উৎপন্ন হয়। বামিয়ানে রয়েছে লোহার খনি। এ লোহা পৃথিবীর সবচেয়ে পরিষ্কার লোহা। তাদের আর কিসের প্রয়োজন?

জিহাদভীতি

গোটা পৃথিবী রণাঙ্গনে পরিপক্বতা লাভকারী ইসলামী আন্দোলনের এ যুবকদের ভয় করছে। আল্লাহ তাদের আফগানিস্তানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য জীবিত রাখুন, যাতে তারা মানুষের দীন, সম্পদ ও ইজ্জতের নিরাপত্তাস্থল হতে পারে। আফগানিস্তান বিশ্ব-মুসলিমদের জিহাদের ঘাঁটিতে পরিণত হওয়ার ভয় করছে পশ্চিমারা। তারা ভয় করছে আফগানিস্তান বিভিন্ন দেশ থেকে বিতাড়িত ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের আশ্রয়কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার। আমেরিকায় লেখালেখি হচ্ছে যে, শিগগিরই মুজাহিদরা পূর্ব সোভিয়েত ইউনিয়নের ইসলামী অঞ্চলগুলোতে তাদের জিহাদ ছড়িয়ে দেবে। অতঃপর সোভিয়েত ইউনিয়নকে টুকরা টুকরা করে ইউরোপ পর্যন্ত চলে আসবে এবং ইউরোপের অঞ্চলগুলো আবার জিজিয়া দিতে বাধ্য হবে, যেমন দিয়েছিল তুর্কিদের। ইহুদিরা পশ্চিমাদের এসব বলে সতর্ক করছে। আমি কয়েক বছর ধরে উপলব্ধি করছি যে, ইহুদিরা

ফিলিস্তিনের জিহাদকে প্রচণ্ড ভয় করছে। তাদের ভাষায় ইন্তাফাদা নামের এ জিহাদ ফিলিস্তিনিদের নতুনভাবে জাগিয়ে তুলেছে। আলহামদুলিল্লাহ ফিলিস্তিনিরা এখন আল্লাহু আকবারের ধ্বনিতেই আন্দোলিত হচ্ছে। হামাস ইসলাম থেকে বিচ্যুত যুবকদের সিরাতুল মুস্তাকিমে ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু করেছে। আমাদের ওপর যে বিভিন্নভাবে চাপ আসতে শুরু করেছে তা আমি অবশ্যই টের পাচ্ছি। ইহুদিরা জেনেভা সম্মেলনে পাকিস্তানের মুজাহিদ প্রশিক্ষণ ক্যাম্পগুলো বন্ধ করার দাবি জানিয়েছে, যাতে কোনো আরব সেখানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে না পারে। অধিকৃত ভূমিতে আফগানিস্তানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এক যুবকের অপারেশনে ইহুদিরা হতবাক হয়ে গেছে।

বর্তমানে পাকিস্তানি ভিসার ব্যাপারে যেসব কড়াকড়ি পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা আমেরিকান ও পশ্চিমা চাপের ফলে হচ্ছে। চার বছর আগেও পৃথিবীর যেকোনো দেশ ও যেকোনো ধর্মের লোক পাকিস্তানে ভিসা ছাড়া প্রবেশ করতে পারত। বর্তমান পেট্রো ডলারের দেশগুলোতে প্রবেশ করা পাকিস্তানে প্রবেশ করার চেয়ে অনেক সহজ। পাকিস্তানে প্রবেশের ব্যাপারে এসব কড়াকড়ি আন্তর্জাতিক চাপের ফলে করা হচ্ছে। এয়ার লাইন্স কোম্পানিগুলোর প্রতি নির্দেশ এসেছে, ভিসা ছাড়া কাউকে পাকিস্তানে নিয়ে যাবে না। যদি পাসপোর্ট চেক করার পর কারো ভিসা পাওয়া না যায়, তাহলে তাকে ফেরত পাঠাবে। অনেক যুবককে ভিসা না থাকার কারণে বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হয়েছে। ফেরত পাঠানোর খবর শুনে কোনো কোনো যুবক জিহাদের প্রতি অত্যধিক অনুরাগের ফলে বিমানবন্দরে বেহুঁশ পর্যন্ত হয়ে গেছে।

হে বিশ্বের মুসলিমরা, তোমরা শুনে রাখ, আফগানিস্তান হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষালয়, এর প্রতি মনোযোগ দেওয়া এবং এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা মুসলমানদের কর্তব্য। কথা অনেক দীর্ঘ। জিহাদের আলোচনা মনের কাছে খুব প্রিয়। কিন্তু সব এখানে বলে শেষ করা যাবে না। আমি জিহাদের ব্যাপারে মনকে এ কথা বলে প্রবোধ দিই–

وَقَفَ الْهَوَىٰ بِيْ حَيْثُ أَنْتَ :: فَلَيْسَ لِيْ مُتَأَخَّرٌ عَنْكَ وَلَا مُتَقَدَّمُ

أَجِدُ الْمَلَامَةَ فِيْ هَوَاكَ حُبًّا :: لِذِكْرِكَ فَلْيَلُمْنِيْ اللُّوَّمُ

তোমার ভালোবাসা স্থান করে নিয়েছে আমার মনে,
সে তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছে না আমাকে কোথাও যেতে।
তোমার ভালোবাসার কারণে পাওয়া তিরস্কার আমাকে
উৎসাহিত করছে বারবার স্মরণ করতে তোমাকে।

অতএব, যার ইচ্ছা করুক তিরস্কার আমাকে
এ করে সে পারবে না আমাকে তোমায় ভোলাতে।

আমি এখন তোমাদের মধ্যে উপস্থিত। কিন্তু আমার মন এখন আফগানিস্তানে, জালালাবাদে। আমি যখন ক্যাম্প থেকে পেশোয়ারে আমার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে আসি, তখন আমার কষ্ট লাগে। অথচ আমি যাচ্ছি পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে। যদি আমাকে ইসলামাবাদে যেতে হয়, তাহলে পথের দূরত্বের কারণে আমার কষ্ট আরো বেড়ে যায়। এমনকি হজের সময় যখন বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করি, তখনো আমার অন্তর ঘুরে বেড়ায় আফগানিস্তানের মুজাহিদ ক্যাম্পে।

হেরেমে অবস্থানের চেয়ে জিহাদের পথে থাকা উত্তম

আফগানিস্তান রণাঙ্গনে অবস্থান করা হেরেমে অবস্থান করার চেয়ে অনেক উত্তম। যেমন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لَأَنْ أُرَابِطَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ سَاعَةً أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَقُوْمَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

আল্লাহর রাস্তায় কিছুক্ষণ পাহারাদারি করা আমার কাছে লাইলাতুল কদরে হাজরে আসওয়াদকে সামনে নিয়ে ইবাদত করার চেয়ে অধিক প্রিয়। *[ইবনে হাব্বান]*

আল্লাহর রাস্তায় এক দিন ব্যয় করা কেবল ইমারাত, জর্দান ও কায়রো নয়, সারা দুনিয়া থেকেও উত্তম। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

رِبَاطُ يَوْمٍ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا

আল্লাহর রাস্তায় একদিন অবস্থান করা দুনিয়া ও তাতে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম। *[বুখারি]*

জিহাদের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানো

আফগান জিহাদের ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী একটি আতংকও সৃষ্টি হয়েছে। তাই তারা ইসলামের সন্তানদের অন্তরে প্রোথিত জিহাদের এ পবিত্র শপথকে বিনাশ করার জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছে। স্টিংগার ক্ষেপণাস্ত্রের বিষয়টি গোটা বিশ্বের সাংবাদিকদের গল্পগুজবের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে

দাঁড়িয়েছে যে, এ পবিত্র জিহাদ সিআইএ কর্তৃক পরিচালিত একটি মার্কিন খেলায় পরিণত হয়েছে। মুজাহিদদের কলঙ্কিত করতে তারা বিভিন্ন নেতিবাচক ছবি তুলে মুজাহিদদের নামে প্রচার করছে। এ উদ্দেশ্যে তারা একটি ছবি তৈরি করেছে যে জনৈক আবদুল কাদির নামে কান্দাহারের একজন ডাকাত মাদক সেবন করছে। এরপর সে একটি ক্যাম্পে হামলা করছে। ওরা আফগানিস্তানের জিহাদকে পতিপয় মাদকসেবী আবদুল কাদির প্রমুখের ব্যাপারে পরিণত করেছে, যারা মাদক খেত ধ্বংস ও নিষিদ্ধ করতে আসা কমিউনিজমের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এদের শিরা-উপশিরায় চলাচল করা সুপ্ত জিহাদ বিদ্বেষের ঘৃণ্য প্রকাশ ঘটেছে আইআরসির হাসপাতালে। এ হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করতে যাওয়া মহিলাদের শতকরা ৩৭ জনের জরায়ু কেটে ফেলা হয়েছে, যাতে তারা আর কখনো সন্তান জন্ম দিতে না পারে। উম্মাহর বীর সন্তানদের অন্তরে সৃষ্ট কিতালের ভালোবাসার প্রতি খ্রিস্টবাদীদের সুপ্ত বিদ্বেষ তখন দেখা গেছে, যখন তারা কান্দাহারে আহত মুজাহিদদের সেবা করতে গিয়ে বলল, তোমার পা কেটে গেছে, তার জন্য তো তোমাকে আজীবন বেকার ও পরের বোঝা হয়ে থাকতে হবে।

আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের রূপ এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি। এ ষড়যন্ত্রকারীরা জার্মান ও জাপানের মতো আফগানিস্তানকেও অস্ত্রমুক্ত করতে চায়। জার্মানরা যখন ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করল এবং এরপর ২৫ বছরের ব্যবধানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করল, তখন তারা বলল, জার্মানদের অন্তরে সৃষ্ট যুদ্ধের দাবানল নিভিয়ে ফেলার জন্য তাদের খণ্ডবিখণ্ড করার বিকল্প নেই। তারা জার্মানদের দুই ভাগে ভাগ করে ফেলল। এক ভাগ রাশিয়ার ও আরেক ভাগ আমেরিকার। অতঃপর তারা জার্মানদের অর্থ ও কারিগরি কাজে ডুবিয়ে রাখে এবং অস্ত্রমুক্ত দেশে পরিণত করে। এভাবে তারা সফল হলে আফগাস্তিানকেও অর্থ ও শিল্পকাজে ডুবিয়ে রাখবে। আমি মনে করি তারা সফলকাম হবে না। আল্লাহ তাদের ষড়যন্ত্র তাদের দিকেই ছুড়ে মারবেন। আল্লাহ বলেন–

وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ

> আল্লাহ তার কাজে সফল। কিন্তু মানুষের অধিকাংশই তা জানে না। *[সুরা ইউসুফ ১২:২১]*

আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিলের কাছে তারা প্রস্তাব রাখেছে, আফগানিস্তানকে অর্থ, কারিগরি ও চাষাবাদ প্রকল্পে ডুবিয়ে রাখতে এবং অস্ত্রমুক্ত করতে। ফলে

আফগানিস্তান প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়বিহীন দেশে পরিণত হবে। কারণ তারা বিগত শত বছরে কয়েকবার আফগানদের হাতে মার খেয়েছে। এ যুদ্ধ ইউরোপিয়ানদের বিরুদ্ধে আফগানদের চতুর্থ যুদ্ধ। সব যুদ্ধে তারা আফগানদের হাতে পরাজিত হয়েছে।

আফগানদের প্রতিরোধযুদ্ধসমূহ

১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে আফগান মুসলিম জনতা ১৭ হাজারের ব্রিটিশ বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে খতম করেছে। কেবল ডা. ব্রাইডান নামের একজনকে না মেরে জীবিত রেখেছিল, যাতে সে মানুষের কাছে তাদের নির্মম পরাজয়ের কথা প্রচার করতে পারে। ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে চার হাজারের ব্রিটিশ বাহিনী কাবুলে খতম হওয়ার পর তারা বুখারায় আশ্রয় গ্রহণকারী একজন বন্দি নেতা আবদুর রহমান খানকে আফগানিস্তানের ক্ষমতায় বসায়, যাতে সে ব্রিটিশদের ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করতে পারে। ১৯১৯ সালে যখন আফগান ইসলামী বাহিনী ভারতের সীমানা পার হয়ে 'তিল' পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং ইংরেজ সরকার তাদের দ্বিতীয়বার দিল্লি পৌঁছে যাওয়ার আশঙ্কা করল, তখন টিসার্সেল লন্ডন থেকে আফগানিস্তানের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। অতঃপর ধর্মহীন একজন আমানুল্লাহ খানকে আফগানিস্তানের ক্ষমতায় বসায়, যে আফগানিস্তানকে কামাল আতাতুর্কের তুরস্কের পথে নিয়ে যেতে চেয়েছিল।

আফগান মহিলাদের জরায়ু কর্তন

জার্মান ও ফ্রান্সের অনেক চিকিৎসক চিকিৎসার নামে আফগান মহিলাদের জরায়ু কেটে ফেলে, যাতে তারা গর্ভবতী হতে না পারে। মহিলারা বাচ্চা প্রসবের জন্য তাদের চিকিৎসালয়ে গেলে বাচ্চা প্রসব শেষে তাদের জরায়ু কেটে ফেলা হয়। কারণ তারা আফগানদের বংশ বৃদ্ধিতে শঙ্কাগ্রস্থ। জন্ম নিয়ন্ত্রণের ট্যাবলেট আফগানিস্তানে খুব জোরেশোরে বিতরণ করা হচ্ছে। আফগান মহিলারা তাদের কাছে এসে মাথাব্যথার কথা বললে তারা জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি খাইয়ে দেয়।

আমাদের ভাই ডাক্তার সালেহ মাজার শরিফ ও বলখে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, আমি সেখানে যে জিনিসটি বেশি বিতরণ করতে দেখেছি, সেটা হচ্ছে জন্মনিয়ন্ত্রণ ও বন্ধ্যাকরণ ট্যাবলেট এবং মাদক। পাশ্চাত্যের চিকিৎসকরা মুজাহিদদের মাঝে মাদক বিতরণ করছে। কেউ এসে পেটের ব্যথার কথা জানালে তারা তাকে মাদকের ট্যাবলেট খাইয়ে দেয়। কারণ তারা আফগানদের ইউরোপ দখল করার ভয় করছে।

আন্তর্জাতিক মিডিয়ার খবরদারি

আমি তোমাদের কসম করে বলতে চাই এবং এ কথা কসম করে বললে আমার কাফফারা দিতে হবে না যে, আল্লাহর শত্রুরা পৃথিবীর অন্য কোনো অঞ্চলকে আফগানিস্তানের মতো ভয় পায় না এবং তারা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের লোককেও আফগান ও তাদের দেশে জিহাদ করতে আসা লোকদের মতো আশঙ্কার দৃষ্টিতে দেখে না। তোমরা মনে করছ, তোমরা এখানে বসে আছ এবং পৃথিবীর লোকরা তোমাদের ব্যাপারে বেখবর। কতিপয় বাদে পৃথিবীর সব মিডিয়া পরিকল্পনা এঁটেছে, কিভাবে জিহাদ নির্মূল করা যায়, কিভাবে রণাঙ্গনে এসব যুবকের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করা যায়! এসব মিডিয়া রাত-দিন চিন্তায় মশগুল থাকে, কিভাবে এ জিহাদ ও তার ধারক-বাহকদের কলুষিত করা যায়! কিভাবে জিহাদ করতে এগিয়ে আসা যুবকদের এ ফরজ কাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলা যায়! তাই মার্কিনরা শুরুতে এ ভেবে আনন্দিত ছিল যে রাশিয়া আফগানিস্তানে পরাভূত হয়ে গেছে। আর পরাভূত হওয়ার এ আঘাত রাশিয়াকে রক্তশূন্য করে ছাড়বে। যেমন গর্বাচেভ সম্প্রতি স্বীকার করেছেন, আফগানিস্তান আমাদের স্থায়ী ক্ষত। মিটরানও কিছুদিন আগে বলেছে, আফগানিস্তান রাশিয়ার দেহে প্রবেশ করা সেই ক্যান্সার, যা তাকে খেয়ে নিঃশেষ করবে।

ফ্রান্স, ব্রিটেন ও আমেরিকা এ ভেবে আনন্দিত যে তারা এ যুদ্ধের মাধ্যমে আফগানদের নিঃশেষ করে দিতে পারবে। আফগানরা পৃথিবীর সবচেয়ে মজবুত মুসলিম জনগোষ্ঠী, তারা কষ্ট ও কঠিনতা সবচেয়ে বেশি সহ্য করতে পারে এবং তারা যুদ্ধে তাদের কঠোরতা ও দৃঢ়তার জন্য খ্যাত। আর ওরা মনে করছে আফগানদের নিঃশেষ করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়াকেও নিঃশেষ করে দেওয়া যাবে। কিন্তু তারা দেখতে পেল, এ জিহাদ পুরো মুসলিম উম্মাহকে প্রভাবিত করেছে।

জিহাদ থেকে দুটি বস্তু বিচ্ছুরিত হয়। এক. আগুন। দুই. আলো। আগুন জালিমদের ধ্বংস করে, আর আলো মুমিনদের অন্তরকে আলোকিত করে। তাই আলো ছড়িয়ে পড়া শুরু করেছে, আর আগুন তাদের ঘরের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। ফলে তারা চিৎকার করে বলছে, প্রতিদিন রাশিয়ার দুটি করে বিমান ভূপাতিত হচ্ছে, দশটি করে ট্যাংক ধ্বংস হচ্ছে, পঞ্চাশজন করে সৈন্য নিহত হচ্ছে ইত্যাদি। রুশ ও আফগান কমিউনিস্টরা নিহত হচ্ছে, পুড়ে মরছে, আহত হচ্ছে ও বন্দি হচ্ছে; আমেরিকার জন্য এটা ভালো। কারণ এতে রাশিয়ার দৈনিক প্রায় ৩৬ মিলিয়ন ডলার ব্যয় হওয়ার কারণে রাশিয়া গরিব হয়ে যাচ্ছে। আমেরিকার

জন্য এটা বিরাট সাফল্য।

আমেরিকা থেকে আমদানি করা গমের টাকা রাশিয়া এখন লিবিয়াতে প্রদান করার জন্য বলছে। হ্যাঁ, লিবিয়া আমেরিকাকে গমের মূল্য পরিশোধ করবে। বিনিময়ে রাশিয়ার কাছ থেকে অস্ত্র পাবে। দেখুন, আমেরিকাকে পর্যন্ত রাশিয়ার কাছে গম বিক্রি করতে হচ্ছে। রাশিয়ার কাছে এখন গম কেনার অর্থও নেই। রাশিয়া নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। তাই তারা এ প্রকট সংকট থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমেরিকা দেখতে পেল, এ জিহাদ মুমিনদের অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভরসাকে দৃঢ় করেছে, মুসলিম উম্মাহর অন্তরে নব জীবনের সঞ্চার করেছে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসকে ফিরিয়ে এনেছে। এ জিহাদের ময়দানে তোমাদের আগমন তাদের ভীতি আরো বৃদ্ধি করেছে। আর তারা যে আরব জনগোষ্ঠীসমূহকে ভোগ বিলাস ও অর্থ সম্পদে ডুবিয়ে রেখেছে বলে মনে করছে, তাদের একটি বড় অংশ জিহাদ ও ত্যাগের এ ভূমিতে চলে এসেছে। এর ফলে তাদের ভীতি আরো অনেক বেড়ে গেছে।

ইবাদত হয়ে গেল রাজনৈতিক অপরাধ

তুরস্কে শিশুদের কুরআন মুখস্ত করানো রাজনৈতিক অপরাধ ছিল, যার জন্য গ্রেফতার হতে হত। সত্তরের দশকে সালামত পার্টির নেতা (যার বর্তমান নাম রিফাহ পার্টি) নজমুদ্দীন আরবাকানকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল। তাকে সামরিক আদালতে বিচারের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, শুধু মানুষের সামনে নামায পড়ার অপরাধে। কারণ, রাজনৈতিক নেতাদের জন্য জনসমক্ষে নামায পড়া আইনসিদ্ধ ছিল না।

অবাক করা সাহায্য : রাখে আল্লাহ্ মারে কে

১৯৬৯ সালে আমি ফিলিস্তিনী যুবকদের একটি প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে ছিলাম। প্রসিদ্ধ মুসলিম সাংবাদিক মুহাম্মদ শওকাত আমাদের সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। ঐ সময় প্রেসিডেন্ট সুলাইমান ডেমেরিল সৌদি আরবে গিয়েছিলেন একটি অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পাদন করার জন্য। এ সময় সুলাইমান ডেমেরিল গোপনে উমরা করতে চাইলেন। সৌদি সরকারের নিকট আবেদন জানালেন, যাতে তার এ উমরার কথা কেউ জানতে না পারে এবং কেউ যেন ইহরামের কাপড়ে তার কোন ছবি না তোলে। কারণ, তা রাজনৈতিক অপরাধ। প্রধানমন্ত্রীর কাছে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। সাংবাদিক বললেন, কেউ যদি আমাকে সুলাইমান

ডেমরিলের ইহরাম পরিহিত অবস্থার ছবি দিতে পারে, তাহলে আমি তাকে যে পরিমাণ অর্থ চাইবে দান করব।

এরকম অবস্থা বিরাজ করছিল তুরস্কে। ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের এ লেলিহান শিখা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সর্বক্ষেত্রে বিরামহীনভাবে জ্বলছিল। টুপি ও পাগড়ি ছিল শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কারণ, তা যে তুর্কীদেরকে এ দীন নিয়ে আসা আরবদের সাথে সদৃশ্য করে দেয়।

মিন্দরিসে আল্লাহর আশ্চর্যময় সাহায্য

একবার তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী জাস্টিস পার্টি অব তুরস্ক-এর প্রধান আদনান মিন্দরিস বিমানযোগে কোথাও যাচ্ছিলেন। হঠাৎ করে বিমানের ইঞ্জিন অচল হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন ঘোষণা দিলেন, বিমানের বিপর্যয় নিশ্চিত। সবাইকে জীবন রক্ষাকারী বা প্যারাসুট জ্যাকেট দেয়া হল। আদনানও জামা পরিধান করল এবং আল্লাহর কাছে এ বলে মানত করল যে, হে আল্লাহ যদি তুমি আমাকে রক্ষা কর এবং তুরস্কের শাসন ক্ষমতা আমার হাতে থাকে, তাহলে আমি তুরস্কের বুকে পুনরায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা করব। আল্লাহ এ ধরণের লোকদের ব্যাপারে বলেছেন–

حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ.

> তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে এবং অনুকূল বাতাস তাদেরকে চালিয়ে নিয়ে যায় আর তারা এ নিয়ে আনন্দবোধ করে, এমন সময় হঠাৎ ঘূর্ণিঝড় আসে এবং চতুর্দিক থেকে ঢেউ আক্রমণ করে আর তারা মনে করে যে, তারা ধ্বংসের কবলে পতিত হয়েছে, তখন তারা আল্লাহকে শিরকমুক্ত ইবাদত সহকারে ডাকে। *[ইউনুস ১০ : ২২]*

সে আল্লাহকে এভাবে ডাকল। বিমান বিধ্বস্ত হল। সকল যাত্রী পুড়ে মারা গেল কিন্তু আশ্চর্যভাবে মিন্দরিস বেঁচে গেল। এটাই হলো আল্লাহর কুদরতি সাহায্য। পরে মিন্দরিস নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করল। তার নির্বাচনী অঙ্গীকারগুলো এত নগণ্য ছিল যে, আমাদের আরব দেশে যদি কেউ কারো মুখ থেকে তা শুনে, তাহলে হাসাহাসি ও ঠাট্টা করবে। মিন্দরিসের নির্বাচনী ইশতিহার ছিল, সে আরবী ভাষায় আযান দেয়ার অনুমতি দিবে, বিভিন্ন মক্তব পুনরায় চালু করবে

এবং আয়া ছুফিয়া যাদুঘরকে পুনরায় মসজিদে রূপান্তরিত করবে। নির্বাচন হল। নির্বাচনে কামাল আতাতুর্কের দলের ভরাডুবি হল। সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়ে মিন্দরিস মন্ত্রীসভা গঠন করল এবং নিজে প্রধানমন্ত্রী হল।

তুর্কী জনগণের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণের সময় হল। রমযানের প্রথম দিন মিন্দরিস তুরস্কবাসীকে আরবি ভাষায় আযান উপহার দেয়। মানুষ কান্নারত অবস্থায় বাজারের দিকে বের হয়। কনস্টানটিনপল বিজয়ের পর আজকের মত আনন্দের দিনের সাথে তারা আর কখনো পরিচিত হয়নি। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ধ্বনি ইস্তাম্বুলের হাজারো মিনার থেকে এক যোগে বের হয়ে আকাশ-বাতাস মুখরিত করছে। আজ থেকে ২৬ বছরের অধিক কাল যাবত এ মিনারসমূহ থেকে আল্লাহু আকবার ধ্বনি বের হওয়া নিষিদ্ধ ছিল। মিন্দরিস জনগণের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করায় পশ্চিমাদের অন্তরে অস্থিরতা শুরু হয়। ওয়াশিংটনে এ ব্যাপারে চাপ প্রয়োগের কথা ওঠে এবং ফ্রিম্যানসনবাদীরা এর বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠে। অতঃপর মিন্দরিসের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানো হয় এবং তার এ কাজকে মহা বিশ্বাসঘাতকতা ও সংবিধান বিরোধী বলে অপবাদ দিয়ে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

তুরস্কের অভিজ্ঞতা একটি অদ্বিতীয় ও সফল অভিজ্ঞতা ছিল। তাই ইউরোপ ও মার্কিনীরা এ অভিজ্ঞতা থেকে ইসলামের উৎখাতের জন্য এমন এক পদ্ধতিতে কাজ করতে শিক্ষা অর্জন করে, যা আগের চেয়ে অধিক সহজ। তারা বলে যে, আজ থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করা যাবে না। এমন লোকদের দিয়ে এ দীন ধ্বংস করতে হবে, যারা তার অনুসারী, যারা আরবীতে কথা বলে ও যারা বাহ্যিকভাবে নামায পড়ে কিন্তু এ দীনের মুলোৎপাটনে তারা আমাদের সাথে একমত।

আফগান নেতৃবৃন্দের প্রতি আল্লাহর সাহায্য

হে আফগান নেতৃবৃন্দ! হে বিশ্বের মুসলিম নেতৃবৃন্দ! রক্তের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। আল্লাহকে ভয় করুন অশ্রু ও খণ্ড-বিখণ্ড লাশের ব্যাপারে। আল্লাহকে ভয় করুন নির্যাতিত নিপিড়ীত মুসলিম মা-বোনদের ব্যাপারে যারা আজ চিৎকার করে বলছে– 'আমাদেরকে বাঁচাও, আমাদেরকে এ জুলুমের হাত থেকে মুক্ত কর।' জিহাদ অব্যাহত রাখুন। ইনশাআল্লাহ, আমরা আপনাদের সাথে আছি এবং থাকব। আমরা আপনাদেরকে কখনো অসহযোগিতা করব না। আমরা সব সময় আপনাদের পাশেই থাকব। আপনারা সততা ও দৃঢ়তার সহিত এগিয়ে যান বিশ্বের সকল তাগুতি শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যান, দেখবেন

বিশ্বের সকল মুসলিম জামাত আপনাদের পাশে এসে দাঁড়াবে এবং আল্লাহর সাহায্যও আপনাদের পাশে থাকবে ইনশাআল্লাহ। আর মনে রাখবেন, বিশ্বের সকল মুসলিম এক সুতোতে গাঁথা। সকল মুসলিম ভাই ভাই।

اَلْمُسْلِمُ اَخُوْ الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ

> মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। কেউ তার ভাইকে শত্রুর হাতে ছেড়ে দেবে না এবং তার উপর যুলুম করবে না। *[বুখারী ও মুসলিম]*

আমরা আপনাদেরকে মধ্যপথে ছেড়ে চলে যাব না। আল্লাহর কাছে দৃঢ়তা কামনা করি। ইনশাআল্লাহ, সবাই অস্ত্র ত্যাগ করলেও আমরা অস্ত্র হাত থেকে ফেলবো না। মহান রাব্বুল আলামীন বলেছেন–

وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

> আল্লাহ তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন যে তাঁকে সাহায্য করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও ক্ষমতাধর। *[হজ ২২:৪০]*

তিনি অন্যত্র আরও বলেন–

وَاللهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

> আল্লাহ তোমাদের সাথে রয়েছেন। তিনি কখনো তোমাদের কর্মের প্রতিদান হ্রাস করবেন না। *[মুহাম্মদ ৪৭:৩৫]*

তিনি আরো বলেন–

أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ○ وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ○ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ○

> আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা আপনাকে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যান্য উপাস্যদের ভয় দেখায়। আল্লাহ

যাকে পথ ভ্রষ্ট করেন, তাকে পথ দেখানোর কেউ নেই। আর আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন, তাকে পথভ্রষ্টকারী কেউ নেই। আল্লাহ কি পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন? যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আসমান ও জমিন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে– আল্লাহ। বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি আল্লাহ আমার অনিষ্ট করার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে ডাক, তারা কি অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে তারা কি সে রহমত রোধ করতে পারবে? বলুন, আমার পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁরই উপর নির্ভর করে। *[যুমার ৩৯:৩৬-৩৮]*

তারা আল্লাহর অনুগ্রহকে রোধ করতে পারবে না এবং আল্লাহর ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারবে না। অতএব বলুন- 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট'।

হে আরব যুবকেরা, তোমরা দুনিয়াকে তালাক দিয়ে দাও। পথ চল এবং সীমান্ত অতিক্রম কর। তাহলে দুটি কল্যাণের কোন একটি প্রাপ্ত হবে– হয়তো বিজয়, নতুবা আল্লাহর ইচ্ছায় শাহাদত বরণ। তোমাদের ভাইয়েরা তোমাদের অপেক্ষায় হিন্দুকুশের চূড়ায় প্রহর গুণছে।

হে বিশ্বের মুসলিম ভাই ও বোনেরা! হে বিশ্বের যুবক ভাইয়েরা! তোমরা কি ভুলে গেছ রাসূলের সা. এর কথা? যেখানে তিনি নিজেই বলেছেন–

أَنَا نَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ، أَنَا نَبِيُّ السَّيْفِ

আমি যোদ্ধা নবী, আমি তরবারীওয়ালা নবী।

তোমরা কি ভুলে গেলে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের কথা? কত রাগান্বিত হয়ে বলেছিলেন–

أَيُّهَا الْقَارِىءُ الَّذِي لَبِسَ الصُّوفَ :: وَأَمْسَى يَعُدُّ فِي الزُّهَّادِ

إِلْزَمِ الثَّغْرَ وَالتَّعَبُّدَ فِيهِ :: لَيْسَ بَغْدَادُ مَنْزِلُ الْعُبَّادِ

হে পশমী পোশাক পরিধানকারীরা, যারা নিজেদেরকে আবেদ ও জাহেদ মনে করছ, চল জিহাদের মোর্চার ভেতর। সেখানে গিয়ে সেজদা কর, ইবাদত কর, যেখানে দুশমনের পক্ষ থেকে তীর আসতে থাকে, তরবারী চলতে থাকে। বাগদাদ আবেদ ও জাহেদদের অবস্থান করার স্থান নয়।

বসে তো থাকবে ঐ সমস্ত লোক যারা দীনের নামে মানুষদের লুটেপুটে খায় এবং স্বীয় দীন বিক্রি করে মানুষ থেকে কিছু উপার্জন করে। আল্লাহর নবী তো আট বৎসরে সাতাইশ বার যুদ্ধের ময়দানে গিয়েছেন। আর তোমরা দাবি করছ যে, তোমরা সুন্নতের অনুসারী। অথচ একটি বারের জন্য তোমরা জিহাদে বের হওয়ার জন্য প্রস্তু নও। এই বুঝি তোমাদের বুজুর্গি? জীবনের এক মিনিট সময়ের হিসাব কি দিতে পারবে?

তোমরা কি ভুলে গেলে মহান রাব্বুল আলামীনের সেই নির্দেশকে, যেখানে তিনি নিজেই বলেদিয়েছেন−

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ.

> এবং তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো যতক্ষণ না অশান্তি দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ তায়ালার হুকুমত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা ক্ষান্ত হয়, তবে অত্যাচারীগণ ব্যতীত কারো সাথে শত্রুতা নেই। *[বাকারা ২:১৯৩]*

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন−

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

> তোমাদের উপর জিহাদ ফরজ করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। হতে পারে তোমাদের কাছে হয়তো কোনো একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। পক্ষান্তরে হয়তোবা কোনো একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহ তায়ালাই জানেন, তোমরা জাননা। *[বাকারা ২:২১৫]*

হে আফগান নেতৃবৃন্দ! এসব রক্ত, খণ্ডিত লাশ, এসব বিধবা, এতীম এবং ড. মুহাম্মদ উমর, মৌলভী হাবীবুর রহমান, রব্বানী আতিস, ইঞ্জিনিয়ার হাবিবুর রহমান ও গোলাম মুহাম্মদ নিয়াজির মত মনীষীদের রক্ত জহির শাহকে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রবাহিত হয়নি, জহির শাহর বিরুদ্ধেই হয়েছে। আফগানরা আফগানী দাউদ, তারাকি, হাবিবুল্লাহ ও বাবরাকের বিরুদ্ধে লড়েছে। এ লড়াই কেবল রাশিয়ার বিরুদ্ধে হয়নি। এ দ্বন্দ্ব রাশিয়া ও নজিবকে নিয়ে নয়, এ দ্বন্দ্ব

ইসলাম ও অনৈসলামের দ্বন্দ্ব। এ দ্বন্দ্ব আল্লাহর শাসন ও শয়াতানের শাসন প্রতিষ্ঠা নিয়ে। এ দ্বন্দ্ব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতবাদ প্রতিষ্ঠা এবং পুঁজিবাদ ও মার্কস-লেলিন-স্টালিনবাদ প্রতিষ্ঠার। ভাইয়েরা, আল্লাহকে ভয় করুন, পথ চলুন, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করুন, ইনশাআল্লাহ আমরা আপনাদের সাথে আছি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে দৃঢ়পদ রাখুন।

আফগানবাসীর অগ্নিপরীক্ষা

আফগানদের পরীক্ষা শুরু হয়। আফগানিস্তানে ইসলামী আন্দোলনের এ পরীক্ষা এখনো পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলনের জগতে অনন্য। এখানে রাজনৈতিক নেতৃত্বই প্রথমে গুলি ছুড়েছেন, তাঁরাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এঁরা রব্বানি, সাইয়াফ, হেকমতিয়ার। হেকমতিয়ারই কাবুলে ইসলামী আন্দোলনের সামরিক শাখার জিম্মাদার ছিলেন। আন্দোলনের প্রধান জিম্মাদার ছিলেন রব্বানি। সংগঠনের নাম ছিল আল জমইয়াতুল ইসলামিয়া। সাইয়াফ ছিলেন রব্বানির সহকারী। অতঃপর সামরিক শাখার প্রধান হন ইঞ্জিনিয়ার হাবিবুর রহমান। তিনি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকও। তার সামরিক অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়েছে। মিসরে আবদুন নাসের নিয়ে ইখওয়ানের অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটেনি। ইঞ্জিনিয়ার হাবিবুর রহমান সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। কিন্তু আল্লাহর সিদ্ধান্ত ও হেকমতের কারণে এ ঘটনা ফাঁস হয়ে যায়। ফলে ইঞ্জিনিয়ার হাবিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। অতঃপর তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। আহমাদ শাহ মাসউদই ইঞ্জিনিয়ার হাবিবুর রহমানের কাছে সেনা কর্মকর্তাদের উপস্থিত করতেন। কারণ পাঞ্জশিরের অনেক লোকই সেনা কর্মকর্তা ছিল। কারাগার থেকে ইঞ্জিনিয়ার হাবিবুর রহমান তাঁর কাছে পত্র দিয়ে জানিয়েছিলেন হেকমতিয়ারের সঙ্গে সেনাকর্মকর্তাদের সাক্ষাৎ করিয়ে দিতে। হেকমতিয়ার সেনাকর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। পরে তা ফাঁস হয়ে যায়। ফলে অভ্যুত্থান হতে পারেনি। পরে সরকার হেকমতিয়ারের পেছনে একজন সেনাকর্মকর্তা নিয়োগ করে। ফলে তারা যখনই অভ্যুত্থান ঘটাতে চেয়েছেন, তখনই ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ সরকার অভ্যুত্থানের জন্য নির্ধারিত ব্রিগেডকে অভ্যুত্থান সময়ের এক দিন আগে কাবুল থেকে অন্যত্র স্থানান্তর করত। এভাবে হেকমতিয়ারের তিনটি অভ্যুত্থান পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

পরে হেকমতিয়ার ও রব্বানি পেশোয়ারে চলে আসেন। পেশোয়ারে এসে হেকমতিয়ার সামরিক অপারেশন অব্যাহত রাখার ওপর জোর দেন এবং আফগানিস্তানে কয়েকটি গ্রুপ পাঠান। ওই গ্রুপে মৌলবি হাবিবুর রহমান, ড.

মুহাম্মদ উমর ও আহমদ শাহ মাসউদকে পাঠানো হয় পাঞ্জশিরে। আহমদ শাহ মাসউদই দাউদ সরকারের ট্যাংক পুড়িয়েছিলেন। ফলে ইসলামী আন্দোলনের সন্তানদের ধরে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু তাদের এ প্রচেষ্টাগুলো আন্তরিক ও নিষ্ঠাপূর্ণ ছিল। তবে সে সময় এ প্রচেষ্টা পূর্ণ অভিজ্ঞতা ও পরিপক্বতার আলোকে ছিল না। এতে যারা বেঁচে যায়, তারা বেঁচে যায়; আর যারা ধরা পড়ে তারা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়। আন্দোলনের নেতাদের হত্যা অব্যাহত থাকে। তবে তা প্রকাশ্যে নয়, কৌশলে, লুকিয়ে। অতঃপর দাউদের অভ্যুত্থান ঘটল। দাউদের অভ্যুত্থানের পর গোলাম মুহাম্মদ নিয়াজি ও সাইয়াফকে কারারুদ্ধ করা হয়। গোলাম মুহাম্মদ আন্দোলনের আধ্যাত্মিক পিতা ও প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচিত হতেন। সাইয়াফ রব্বানির সহকারী ছিলেন। হেকমতিয়ার ও রব্বানি রক্ষা পেয়ে পেশোয়ারে চলে আসেন। আন্দোলনের অর্ধেক বা অধিকাংশ নেতা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। রব্বানি ও হেকমতিয়ার পেশোয়ারে বসে কতিপয় যুবককে নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে লাগলেন। অতঃপর যখন তারাকির অভ্যুত্থান ঘটল, তখন আলেমরা ফতোয়া দিলেন যে, সে কাফের, তার বিরুদ্ধে জিহাদ ফরজ। তখন লোকজন বিদ্রোহ শুরু করে। গ্রামের আলেমরা জিহাদ শুরু করেন এবং সাধারণ লোকরা তাদের পক্ষে অস্ত্রধারণ করে। অতঃপর তারা হয়তো হেকমতিয়ারের আল হিজবুল ইসলামীয়ে যোগ দিত, নতুবা রব্বানির আল জমইয়াতুল ইসলামিয়ায় যোগ দিত। এ দুই দলই জিহাদের ময়দানে মূল স্তম্ভ বলে বিবেচিত হতে থাকে। এর পর যে দলগুলো জন্ম লাভ করেছে, তার কোনো একটাই এ দুই দলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে পারেনি। বছরের পর বছর জিহাদ উন্নতি অর্জন করতে থাকে। তিন বছর আগে ১৯৮৪-১৯৮৫ সালে, এক বছরের জন্য কিছুটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়। অতঃপর জিহাদ তার পুণ্যময় যাত্রা অব্যাহত রাখে। এরপর যখন জিহাদ মুসলিম উম্মাহকে নাড়া দেওয়া শুরু করে, পৃথিবীর প্রত্যেক মুসলমানের জন্য তা একটি জীবন্ত দৃষ্টান্তে পরিণত হয় এবং মুসলমানরা তার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া ও তার দিকে দলে দলে আগমন করা শুরু করে; সৌদি আরব, কুয়েত ও আরব আমিরাত থেকে ব্যবসায়ীরা মুজাহিদ নেতাদের হাতে স্বহস্তে অর্থ প্রদান করতে আগমন করেন, তখন পশ্চিমারা তাদের পর্যালোচনা শুরু করে।

রুশ সেনাদের নির্মমতায় আল্লাহর সাহায্যের বাস্তব নমুনা

আমেরিকা যখন আফগানিস্তানে বিমান হামলা করে, তখন আমি ছিলাম কাবুলে। আমিরুল মুমিনীন আমাকে কান্দাহারে তলব করলেন। প্রতিরোধ-কৌশলের

বিষয়ে পরামর্শ হলো। আমাকে নিয়োগ দেওয়া হলো কান্দাহারের পাঞ্জেওয়াই ও মায়বন্দ জেলায়, যেন ওখানকার প্রতিরোধ-শৃঙ্খলা মজবুত করি এবং স্থানীয় নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের বিষয়টি অবহিত করি। আমার পৌঁছার পর মায়বন্দ ও পাঞ্জেওয়াইতে মার্কিনরা বোম্বিং শুরু করে দিল। বিমানগুলো অনেক উঁচুতে থেকে বোমা নিক্ষেপ করত। আমাদের অস্ত্রের আওতার বাইরে ছিল বিমানগুলো। ফলে আমরা বিমান হামলা প্রতিহত করতে পারছিলাম না। মায়বন্দের সালেহান ও গর্মাবাক এলাকায় আরবদের অবস্থানসমূহকে লক্ষ্যস্থল বানিয়ে নেওয়া হলো। তিনটি গাড়ি বিধ্বস্ত হলো। নারী ও শিশুসহ ১২ জন আরব শহীদ হলেন। নওরোজি, বাগপুল, তালেকান ইত্যাদি এলাকায় বোমাবর্ষণে পাঁচজন শহীদ হলেন।

১০ দিন পর আমার নিয়োগ দেওয়া হলো বাগলানে। কেননা উজবেকিস্তানের পথে মাজার শরিফের মার্কিন হামলার পরিকল্পনার খবর আসছিল। যখন তালেবান ফৌজ উজবেক সীমান্তের কাছে হিরতান নৌবন্দর ও আমু নদীরর তীরে সমবেত হলো, তখন আমেরিকা মাজার শরিফের দক্ষিণে দুররায়ে সুফ এলাকায় হেলিকপ্টারের মাধ্যমে দোস্তামকে সহায়তা করতে শুরু করল। তাদের নতুন অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হলো। এমনকি ঘোড়ার জন্য নতুন লাগামও দেওয়া হলো, যাতে মাজার শরিফ অতর্কিতে আক্রমণ করে কবজা করে নেওয়া যায়। তালেবান ফৌজের এক বড় অংশকে উজবেক সীমান্ত থেকে সরিয়ে এনে মাজার শরিফের প্রতিরক্ষার জন্য দুররায়ে সুফে সংগঠিত হতে থাকা দোস্তাম মিলিশিয়াদের মোকাবিলায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। আমিও বাগলান থেকে ২০০ মুজাহিদের একটি বাহিনীসহ দুররায়ে সুফ পৌঁছলাম।

দুররায়ে সুফে আমেরিকা দোস্তামের সঙ্গে মিলে বিপুল শক্তি সঞ্চয় করে রেখেছিল। বড় বড় হেলিকপ্টারের সাহায্যে তাদের স্বতন্ত্রভাবে সহায়তা করা হচ্ছিল। আমাদের মোর্চাগুলোতে দোস্তাম মিলিশিয়াদের পক্ষ থেকে বিশেষ কোনো আক্রমণ হতো না। কিন্তু মার্কিন বিমানগুলো দিন-রাত বোমাবর্ষণ অব্যাহত রাখছিল। শেষ দিনগুলোতে পরিস্থিতি এমন হলো, সৈন্যরা সন্ধ্যায় মোর্চার হেফাজতের জন্য যেত, বোমাবৃষ্টির ফলে সকালে তারা শহীদ হয়ে যেত। আর যে তালেবান সকালে মোর্চার হেফাজতের জন্য যেত, সন্ধ্যায় খবর আসত যে তাদের অধিকাংশ সঙ্গী বোমাবর্ষণে শহীদ হয়ে গেছে। এহেন পরিস্থিতিতে মোর্চায় অবস্থান করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছিল। সুতরাং নতুন রণকৌশল হিসেবে আমরা পুরনো মোর্চা ছেড়ে দিয়ে নতুন জায়গায় প্রতিরোধ-মোর্চা বানিয়ে নিয়েছিলাম। ওখানে আমার গ্রুপের শুধু ১৭ জন সঙ্গী শহীদ হন।

বাগলানের নাহরাইন জেলা থেকে খবর এল, উত্তরাঞ্চলীয় জোটের সৈন্যরা আক্রমণ করতে যাচ্ছে। ওয়্যারলেসের মাধ্যমে সিপাহসালার মোল্লা ফজল আখন্দের তরফ থেকে আমার নাহরাইন পৌঁছার নির্দেশ এল। আমার সঙ্গীরা নাহরাইনে আগেই উপস্থিত ছিলেন। আমি দুররায়ে সুফ রণাঙ্গনের কামান আমার সহকমান্ডার আবদুল গাফফারকে সোপর্দ করলাম এবং নাহরাইন রওনা হয়ে গেলাম। নাহরাইন পৌঁছেই দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করার পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করা হলো। সব কমান্ডারকে সুবিন্যস্ত করা হলো, রাতের শেষ প্রহরে বিরোধীরা তীব্র আক্রমণ করল। প্রতি-উত্তরের জন্য আমরা প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো এবং দুই ঘণ্টার মধ্যে আমরা তাদের আক্রমণ ব্যর্থ করে দিলাম। আটটা লাশ, ডজন ডজন আহত লোক, প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও মৃত ঘোড়ার এক বিশালসংখ্যা ফেলে উত্তরাঞ্চলীয় জোট পালিয়ে গেল। তালেবানকে ঘেরাও করার জন্য দ্রুততার সঙ্গে ঘোড়সওয়াররা হামলা করেছিল, যা সফল হয়নি।

ওই দিনই মাজার শরিফের আশপাশে প্রচণ্ড বোম্বিংয়ের খবর আসছিল। আমেরিকা অ্যাটম বোমার পর সবচেয়ে বড় বোমা ব্যবহার করা শুরু করে দিয়েছিল। দুররায়ে সুফ ও 'শোলগেরাহ' অজস্র প্রাণ-ক্ষয়ের পর তালেবানকে ছাড়তে হয়েছিল।

পরের দিন সন্ধ্যায় মাজার শরিফ বিপর্যয়ের খবর আসে। মোল্লা ফজল আমাকে বাগলান পৌঁছার নির্দেশ দিলেন। যখন আমি বাগলান পৌঁছি, তখন সামানগানেরও বিপর্যয় হয়েছিল। মাজার শরিফ থেকে সরে আসা তালেবান পুল খমরিতে একত্র হয়, যখন তালেবানের একটি বড় অংশ বোমাবর্ষণে শহীদ হয়ে গেল। শুধু তাশকারগান থেকে পুল খমরি পর্যন্ত মার্কিন বিমানগুলো তালেবানের ৮৫টি গাড়িকে 'গাইডেড মিসাইল'-এর নিশানা বানিয়ে তাতে আরোহী তালেবানকে শহীদ করে দিল। এরপর তালেবান গাড়ি রাস্তায় ছেড়ে পায়দল সফর শুরু করে দেয়। সামানগানের গভর্নর মোল্লা আবদুল মান্নান হানাফি, পুলিশপ্রধান মোল্লা আবদুল আলী তাঁদের গাড়ি সামানগানে ছেড়ে দিয়ে পায়দল সফর করে পুল খমরি পৌঁছেন। কারণ মার্কিন বিমানসমূহ গাড়িগুলোকে সহজেই নিশানা বানিয়ে নিচ্ছিল।

পরবর্তী রাতে কমান্ডারদের পরামর্শ সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, পুরো উত্তরাঞ্চল খালি করে বামিয়ানের পথে কাবুল যেতে হবে। এই ধারাবাহিকতায় কুন্দুজ থেকে কাবুলগামী পথকে আট ভাগে বিভক্ত করা হলো এবং প্রত্যেক ভাগের নিরাপত্তার দায়িত্ব বিভিন্ন কমান্ডারকে অর্পণ করা হলো। কেননা আশঙ্কা ছিল,

বিরোধীরা পথ রুদ্ধ করে না দেয়। মোল্লা ফজল বাগলানের পুরনো শহর থেকে পুল খমরি পর্যন্ত পথের দায়িত্ব আমার জিম্মায় দিলেন। পুল খমরি থেতে দোশি পর্যন্ত পথের দায়িত্ব মোল্লা আবদুল মান্নান হানাফি ও মোল্লা আবদুল আলীর জিম্মায় দেওয়া হলো। দোশি থেকে জানজান পর্যন্ত মোল্লা শাহজাদা। দোশি থেকে দুররায়ে কিয়ান পর্যন্ত তিনি মোল্লা আবদুল বাকির সঙ্গী হিসেবে নিযুক্ত হলেন।

দুররায়ে কিয়ান থেকে 'তালাহ বরফক' পর্যন্ত কমান্ডার বাজ মুহাম্মদ ও মৌলবি আবদুস সালাম নিযুক্ত হলেন। বামিয়ানের দ্বিমুখী রাস্তা থেকে জলরিজ পর্যন্ত মোল্লা গোলাম নবী জিহাদ-ইয়ার নির্ধারিত হলেন। জলরিজ থেকে দুর্দাক শহরের রণাঙ্গন পর্যন্ত পথের নিরাপত্তার দায়িত্ব কমান্ডার গোলাম মুহাম্মদ দুর্দাকের জিম্মায় ছিল।

এ পরিকল্পনার পর, দ্বিতীয় দিন মনজিলাগিমি তালেবান সৈন্যদের কাবুলের দিকে রওনা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় দিন বেলা ২টায় খবর এল, করিম খলিলি ভারী শক্তি নিয়ে বামিয়ানে আক্রমণ করেছে এবং মৌলবি আবদুস সালামকে সঙ্গে নিয়ে বামিয়ান কবজা করে নিয়েছে। বামিয়ানের বিপর্যয়ে আমাদের সব পরিকল্পনা শেষ হয়ে গেল। উত্তরাঞ্চলে পুনরায় একবার তালেবানের এক বিশাল বাহিনী অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। এদিকে পুল খমরিতে মার্কিন বিমানবাহিনী প্রচণ্ড বোম্বিং শুরু করে দিয়েছিল। বিমানগুলো 'লেওয়ায়ে টেংক', 'যেরাহদার' ও পার্শ্ববর্তী এলাকায়, যেখানে তালেবান অবস্থান করছিল, 'অগ্নিবর্ষণ' শুরু করে দিয়েছিল।

মার্কিন বিমানবাহিনী তালেবানের বিভিন্ন ঘাঁটিতে বোমাবর্ষণ তীব্র করে দিল। বামিয়ানের পর সন্ধ্যায় জানজানেরও বিপর্যয় হলো। শুরায়ে নেজামের জেনারেল কবির 'নাহরাইন' থেকে আক্রমণ করে 'জানজান' দখল করার পর, দোশি ও পুল খমরির দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে দেয়। মোল্লা শাহজাদা, যিনি দোশি ও জানজানের প্রতিরক্ষায় ছিলেন, বামিয়ানের পথ রুদ্ধ হওয়ায় এবং নাহরাইন থেকে জেনারেল কবিরের অগ্রসর হওয়ার কারণে দোশিতে সময়ক্ষেপণ করা যথার্থ মনে করলেন না। তিনি মাগরিবের পর সঙ্গীদের জানজান থেকে বের করে পুল খমরির দিকে রওনা করলেন, যাতে তাঁরা অবরোধে না পড়েন। এদিকে রাত ১১টায় পুল খমরিও তালেবানের হাতছাড়া হয়ে গেল। বিরোধীদের একটি গ্রুপ গোপনে প্রবেশ করে শহরের কেন্দ্রীয় চৌকির আশপাশের ভবনগুলোতে মোর্চা তৈরি করে নিল। তালেবানের কয়েকটি গাড়ি তারা নিশানা করল। ইতিমধ্যে শহরে আত্মগোপনকারীরাও অস্ত্রসজ্জিত হয়ে লুটপাট ও গাড়ি

হাইজ্যাকের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। পুল খমরি থেকে বাগলানের জনসাধারণ বিদ্রোহ না করে তালেবানের সহযোগিতা করেছে। মোল্লা শাহজাদা নিজ কাফেলাসহ দোশি থেকে পুল খমরি পৌঁছলেন। বিরোধীরা তা কবজা করে নিয়েছিল। মূল শহরের দিকে অগ্রসর হতেই মোল্লা শাহজাদার বাহিনীর ওপর ফায়ারিং শুরু হয়। কতক সঙ্গী আহত হলেন এবং সবাই শহরের বাইরেই বাধাপ্রাপ্ত হলেন। পরিস্থিতি ভীষণ সংকটাপন্ন হয়ে গেল। হাইকমান্ডের তরফ থেকে মুহূর্তকালও বিলম্ব না করার নির্দেশ এসেছিল। শাহজাদা এহেন সঙ্গিন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ওখানে বেশিক্ষণ অবস্থান করা সমীচীন মনে করেননি। কেননা, দোশির দিক থেকে জেনারেল কবির বিরাম না দিয়ে এগিয়ে আসছিল। সম্মুখেও পথ রুদ্ধ; ওপর থেকে বিমানবাহিনী বোমাবর্ষণ করেই চলছিল। সব মুজাহিদ অবরোধে আটকে পড়ার ভয় ছিল। মোল্লা শাহজাদা ছিলেন নির্ভীক, অভিজ্ঞ ও উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন কমান্ডার। যুদ্ধে তিনি কয়েকবার আহতও হয়েছিলেন। তখনো তাঁর পাঁজরে ক্ষত ছিল। তিনি হিম্মত হারালেন না। গাড়ি ওখানেই রেখে পুল খমরির উত্তর দিকের পাহাড়-পর্বত ডিঙ্গিয়ে ৩৩০ জন মুজাহিদসহ বাগলানের দিকে চলে গেলেন। মোল্লা শাহজাদা পাহাড়ি পথ চেনার জন্য স্থানীয় এক লোককে জাগিয়ে তুলে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

পুল খমরির পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার পর তালেবান বাগলানও ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন। কেননা বিরোধীরা নাহরাইন কবজা করার পর বাগলানে অবস্থান করা মুশকিল ছিল। সুতরাং সবাই কুন্দুজ রওনা হন। আমি রাত ১টায় বাগলান থেকে কুন্দুজের উদ্দেশ্যে রওনা হই। মোল্লা ফজল বাগলান ও কুন্দুজের মধ্যবর্তী আলী আবাদ নামক স্থানে প্রতিরোধ-ক্যাম্প তৈরির সিদ্ধান্ত নিলেন এবং মোল্লা মুজাহিদকে সেই ক্যাম্পের দায়িত্ব দিয়ে দিলেন। মাজার শরিফ, তাখার, পুল খমরি ইত্যাদি এলাকা থেকে সরে আসা তালেবান কুন্দুজে সমবেত হয়ে গেল। বিরোধীরা বিভিন্ন দিক থেকে শহরে আক্রমণ শুরু করে দেয়। মার্কিন বিমানবাহিনী দিন-রাত কুন্দুজ ও তার চারপাশে বোমাবর্ষণ করতে থাকে। তালেবান স্থল হামলা তো প্রতিহত করে যাচ্ছিল, কিন্তু বিমান হামলা প্রতিরোধ করতে পারছিল না। বিমানবাহিনীর মোকাবিলা করা সাধারণ ব্যাপার ছিল না।

এমন সময় উত্তর আফগানিস্তানের কতিপয় শীর্ষস্থানীয় পশতুন ও উজবেক কমান্ডার, যারা তালেবানের ব্যাপারে বেশ সহমর্মী ছিল এবং তাদের মাঝে পারস্পরিক সুসম্পর্কও ছিল, তারা দোস্তামের প্রস্তাব নিজ দায়িত্বে তালেবানের সামনে পেশ করল যে, যদি তালেবান তাদের বড় অস্ত্রশস্ত্র ও গাড়িবহর দোস্তামের হাওলা করে, তাহলে সে তাদের মাজার শরিফ থেকে হেরাতের পথে

কান্দাহার যাওয়ার সুযোগ করে দেবে। দোস্তামের পক্ষ থেকে জামিনদাতা কমান্ডারদের মধ্যে আরবাব হাশেম, আমের লতিফ, পিরাম কল, গওছুদ্দীন, শামসুল হক ও কমান্ডার আবেদী অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা এ ব্যাপারে বেশ আশ্বস্ত করলে মোল্লা ফজল আখন্দ নিজ কমান্ডারদের পরামর্শ সভা ডাকলেন ও দোস্তামের প্রস্তাব সামনে রাখলেন।

দোস্তামের এ প্রস্তাবের বিষয়ে চিন্তা করা এ জন্যও উপযুক্ত মনে করা হলো যে, কুন্দুজে অবরুদ্ধ থেকে দীর্ঘ যুদ্ধের ফায়দা ছিল না। অস্ত্রশস্ত্র নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল, রসদপত্রও ফুরিয়ে আসছিল। পরামর্শ সভায় কমান্ডাররা ভিন্ন ভিন্ন মত দিলেন। কেউ বলছেন, আমরা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করে শহীদ হব। কেউ কেউ সন্ধির পক্ষে ছিল বিধায় পরস্পর মতপার্থক্য হতে থাকল। শেষে উলামায়ে কিরামের কাছে ফতোয়া প্রার্থনা করা হলো। মাওলানা আবদুল আলী দেওন্দী, মৌলবি সদওয়াজিয়ে আগা এবং মৌলবি নূর মুহাম্মদ টেলিফোনের মাধ্যমে জবাব দিলেন, যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে যদি বিজয়ের কোনো সম্ভাবনা না থাকে, তবে সন্ধি করা জায়েজ। উলামায়ে কিরামের ফায়সালা সব কমান্ডারকে ধারণ করে শোনানো হলো, যা সবাই স্বীকার করলেন।

যখন সন্ধির ফায়সালা হলো, তখন তালেবানের মাশহুর বাহাদুর কমান্ডার মোল্লা দাদ উল্লাহ মজলিশ থেকে উঠে দাঁড়ালেন এবং সবাইকে সম্বোধন করে নিজ কালাশনিকভ ও রুশ নির্মিত পিস্তল দেখিয়ে বললেন, 'আমি কিছুতেই আমার এ হাতিয়ার দোস্তামের হস্তগত করব না। জীবন থাকতে আমি দোস্তামের মুখ দেখতে চাই না।' মোল্লা দাদ উল্লাহ মোল্লা ফজলকে বললেন, 'আপনি আমাকে আল্লাহর সোপর্দ করে বিদায়ের অনুমতি দিন।' মোল্লা দাদ উল্লাহ সন্ধিচুক্তি বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই বলখের একজন কমান্ডারের গাড়িতে তিনজন সঙ্গীসহ রওনা হয়ে গেলেন। তিনি মাজার-ই শরিফ অতিক্রম করে বলখের এক গ্রামে গিয়ে অবস্থান নিলেন। মোল্লা দাদ উল্লাহ কুন্দুজে উত্তরাঞ্চলীয় জোটের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াই করেছিলেন। উত্তরাঞ্চলীয় জোটের লোকরা ছিল তাঁর জানী-দুশমন। দোস্তাম সন্ধির মাঝে শর্ত রেখেছিল যে, বিদেশি অর্থাৎ আরব, পাকিস্তান, উজবেকিস্তান ইত্যাদি এলাকার মুজাহিদীনকে সে যেতে দেবে না। সন্ধিচুক্তির প্রয়োগ শুধু 'আফগানিস্তানের' তালেবানের ক্ষেত্রে হবে, অন্যান্য বিদেশি মুজাহিদীনকে সে গ্রেপ্তার করবে। মোল্লা ফজল অনেক চেষ্টা করলেন, যেন দোস্তাম বিদেশি তালেবানকে যেতে দেয়। কিন্তু সে সম্মত হয়নি। আমরা বিদেশি মেহমান মুজাহিদদের ব্যাপারে কঠিন পেরেশানিতে পড়ে গেলাম। তাদের নিরাপত্তা সহকারে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা-তদবির চলতে থাকল।

শেষ পর্যায়ে মোল্লা ফজল বলখের কমান্ডারদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন এবং বিদেশি মুজাহিদীনকে গোপন পথে হেফাজতের সঙ্গে বের করে নেওয়ার ব্যবস্থা করে ফেললেন। দোস্তামের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি বাস্তবায়িত হওয়ার মাত্র এক দিন আগে মোল্লা ফজল আমাকে ডেকে পরিকল্পনার বিষয়ে অবগত করলেন এবং ৬০০ বিদেশি তালেবানকে আমার জিম্মায় দিলেন, যেন আমি তাদের গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিই। আমি হালকা অস্ত্রসহ বড় ট্রাক ও গাড়িগুলোতে বিদেশি মুজাহিদদের নিয়ে কুন্দুজ থেকে চার দুররাহ পৌঁছলাম। আমাদের বেশ সতর্কতার সঙ্গে সফর করতে হচ্ছিল। আঁধার ছড়িয়ে পড়তেই রাতেরবেলা সিপাহসালার মোল্লা ফজল আখন্দ আমাদের দোয়া করে ইয়ারগাং পুল পর্যন্ত বিদায় দিতে এলেন। আমরা মোল্লা ফজলের সঙ্গে বিদায়ী মুলাকাত করি এবং বিজন প্রান্তরে সফর শুরু করি। পথিমধ্যে বলখের শমকের কমান্ডারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, যিনি মোল্লা দাদ উল্লাহকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে কুন্দুজে ফিরে আসছিলেন। তিনি আমাদের পথপ্রদর্শনের জন্য নিজের সহযোগী কমান্ডার করিম আগাকে সঙ্গে দিয়ে দিলেন। রাতের শেষ প্রহরে আমরা তাশকারগান পৌঁছলাম। দোস্তামের প্রহরীরা আমাদের ফটকে আটকে দিল। কমান্ডার করিম আগা নেমে গিয়ে তাদের কাছে নিজের পরিচয় দিলেন। ফটক খুলে দেওয়া হলো। আমরা রওনা হলাম। আমাদের গন্তব্য ছিল বলখ। মাজার শরিফ দিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে 'হিরতান'-এর দ্বিমুখী পথ ঘুরে মাজার শরিফ থেকে বের হয়ে আমাদের কাঁচা রাস্তায় অতিক্রম করার কথা ছিল। কিন্তু শমকের কমান্ডার আমাদের হিরতানের দ্বিমুখী পথ দিয়ে সোজা মাজার শরিফ নিয়ে গেলেন। আমার সন্দেহ হলো... ।

মাজার শরিফ বিমানবন্দরের কাছে ফটকের সামান্য আগে আমাদের কাফেলা থেমে গেল। কমান্ডার করিম আগা এই বলে ফটকের দিকে চলে গেলেন যে, আমি সামনে দেখে আসি কী পরিস্থিতি! ফজরের সময় হয়ে গেল। আমরা সবাই তায়াম্মুম করে নামাজে নিমগ্ন হলাম। আমরা পানাহার ব্যতিরেকেই রোজাও রেখে দিয়েছিলাম। কামান্ডার করিম আগা ফিরে এসে সংবাদ দিলেন, দোস্তামের কাছে আমাদের আগমনের সংবাদ পৌঁছে গেছে। কিন্তু আমি মনে করছি, কমান্ডার করিম আগা গাদ্দারি করেছে। আমি নিশ্চিত, সে যেকোনো প্রকারে আমাদের আগমনের খবর দোস্তামের কাছে আগেই জানিয়ে দিয়েছিল। হালকা আলো ছড়িয়ে পড়লে রাস্তার দুই পাশের সাহারায় কিছু নড়াচড়া আমাদের অনুভূত হলো। আলো যখন কিছুটা বাড়ল, তখন টের পেলাম, আমরা পরিপূর্ণ ঘেরাওয়ে এসে গেছি। আমাদের চারদিকে দূরবর্তী ময়দানে সশস্ত্র সৈন্যরা নিজ

নিজ অবস্থান নিয়ে নিয়েছিল। মাজার শরিফের দিক থেকে ট্যাংক আসাও শুরু হয়ে গেল। আকাশে বিমান ও হেলিকপ্টার সাড়ম্বরে নিচু হয়ে উড়তে লাগল। বিশাল আকারের মার্কিন বিমানগুলো আকাশে চক্কর দিয়ে আমাদের ভীতসন্ত্রস্ত করতে লাগল। এসব এত দ্রুত ঘটল, যেন পূর্বপরিকল্পিত এবং নিশ্চিতভাবেই আগে থেকে তারা পরিকল্পনা করে রেখেছিল। এখন আমরা ওখান থেকে বের হয়ে কোথাও যেতে পারছিলাম না। আমরা বিদেশি মেহমান মুজাহিদদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়ার যে পরিকল্পনা করেছিলাম, তা মনে হয় ব্যর্থ হতে চলল।

আমি মোল্লা ফজল আখন্দ, মোল্লা আবদুল কাইয়ুম ও আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ ওমর মুজাহিদের সঙ্গে ওয়্যারলেসে যোগাযোগ করে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করলাম। মোল্লা আবদুল কাইয়ুম পরামর্শ দিলেন, অস্ত্র সমর্পণ না করে লড়ে যাও। মোল্লা ফজল ও আমিরুল মুমিনীন বললেন, এ মুহূর্তে যুদ্ধ করা অর্থহীন। কেননা কুন্দুজে অবস্থানরত তালেবানের ক্ষতি হবে। তোমরা যুদ্ধ না করে অস্ত্র সমর্পণ করো। মোল্লা ফজল বললেন, আমি বলে দিয়েছি, তোমরা অস্ত্র দিয়ে দাও, কমান্ডার আমের জান তোমাদের বলখ নিয়ে যাবেন।

দোস্তামের পক্ষ থেকে পাঁচজন ঊর্ধ্বতন প্রতিনিধি আমার কাছে আলোচনার জন্য এসেছিল। যাদের মধ্যে কমান্ডার নাদের আলী হাজারাহ, কমান্ডার আসাদ হাজারাহ, কমান্ডার হুমায়ুন ফৌজি, কমান্ডার আমের জান এবং আরেকজন ছিল কমান্ডার উস্তাদ আতার প্রতিনিধি। তিনটি আলোচনা বৈঠক হলো, যা চার ঘণ্টা স্থায়ী ছিল। তাদের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এই ছিল যে, তোমরা এদিকে কেন এসেছ, এখনো তো চুক্তি সম্পাদনার সময় বাকি আছে। তোমরা না জানিয়েই চলে এলে যে! আমি নিজের আগমনের বৈধতা বর্ণনা করে তাদের উত্তর দিলাম যে, মার্কিন বিমানগুলোর প্রচণ্ড বোম্বিং হচ্ছিল। ওখানে অবস্থান করা ছিল মুশকিল। এ কারণে আমরা এদিকে চলে এসেছি। তারা আমাদের অস্ত্র একত্র করতে লাগল। আরবরা অস্ত্র সমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানাল। তাদের জেদ ছিল যে, হয় অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে যাব অথবা শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করব। আমি মোল্লা ফজল আখন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করি। তিনি ওয়্যারলেসে কমান্ডার আমের জান, যিনি বলখের পাখতুন বংশোদ্ভূত ছিলেন, তাঁর সঙ্গে আলোচনা করলেন। কমান্ডার আমের জান অস্ত্র সমর্পণের ক্ষেত্রে মুজাহিদীনকে দোস্তামের হাওয়ালা করার পরিবর্তে নিজের সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেন। মোল্লা ফজল আমাকে নির্দেশ দিলেন, তুমি নিজের অস্ত্র কমান্ডার আমের জানের হাওয়ালা করে দাও। সে

তোমাদের বলখ পৌঁছে দেবে।

শীত ছিল তীব্র। আমরা পানাহার ব্যতিরেকেই রোজা রেখেছিলাম। দোস্তামের লোকেরা সিগারেট পান করছিল। গোটা দিন অজুর জন্য পানি মিলল না। আমরা জোহরের নামাজ পড়লাম তায়াম্মুম করে। আমাদের কাছ থেকে ছোট গাড়িগুলো নিয়ে নেওয়া হলো। তারপর কমান্ডারদের তাগাদায় মুজাহিদরা সমুদয় অস্ত্র এক জায়গায় জমা করতে শুরু করল। অস্ত্র রাখার পর দোস্তাম এল। সে দূর থেকে অস্ত্রের স্তূপ দেখল এবং মুজাহিদদের ট্রাকে তুলে রওনা হওয়ার নির্দেশ দিল। মুজাহিদদের তল্লাশি না নিয়ে এবং হাত না বেঁধে ট্রাকে তুলে দেওয়া হলো। শহরের প্রথম চেকপোস্টের কাছে দোস্তাম দাঁড়ানো ছিল। তার সঙ্গে কিছু মার্কিন সাংবাদিকও ছিল।

ফটক থেকে শহর এবং শহর থেকে কেল্লা-ই জঙ্গি পর্যন্ত সড়কের উভয় পাশে সশস্ত্র সদস্যদের দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অনেক বিদ্রূপকারীও উপস্থিত ছিল, যারা কয়েদিদের গাড়িতে পাথর মারত, তাদের থুথু দিত ও গালাগাল করত। কতিপয় লম্পট যুবক তাদের সদ্য মুণ্ডানো দাড়ির ওপর হাত বুলিয়ে ঠাট্টা করত যে 'রে তালেব! দেখ আমরা দাড়ি কামিয়ে ফেলেছি!' চেকপোস্ট অতিক্রম করতেই সড়কের উভয় দিকের সশস্ত্র বাহিনী ও গাড়িগুলোর গতি বলখের পরিবর্তে অন্য কোনো দিকে দেখে আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে, আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে। চুক্তি অনুযায়ী আমাদের যেতে দেওয়া হচ্ছে না।

লোকদের হাবভাব ও দোস্তামের বিশ্বাসঘাতকতা দেখে আমি ট্রাকে যেতে যেতে মনে মনে দোয়া করলাম– 'ইয়া আল্লাহ, তুমিই জান, আমি কেবল তোমার সন্তুষ্টির জন্য তোমার রাস্তায় তোমার দীনের শির উচ্চ করার জন্য বের হয়েছি। আমি নিজ গৃহ থেকে কোনো জায়গা, দোকান কিংবা পার্থির ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বের হইনি। তুমি আমাকে শাহাদাত নসিব করো অথবা রেহাই দান করো। আমি তোমার ফায়সালায় রাজি আছি।'

প্রত্যেক সঙ্গীর চোখে ছিল অশ্রু। ভাবাবেগ প্রকাশ পাচ্ছিল। সন্ধ্যার সময় আমাদের কাফেলা কেল্লা-ই জঙ্গিতে ঘোড়া যেখানে ছিল, ওখানে গিয়ে থামল। কোনো কয়েদির বিনা অনুমতিতে অবতরণ করার অনুমোদন ছিল না। সর্বাগ্রে নাম ডাকা হলো আমার। আমি নিচে নামলাম। কমান্ডাররা আমাকে তাদের সঙ্গে দাঁড় করিয়ে রাখল। মুজাহিদদের এক-এক করে গাড়ি থেকে নামানো হলো এবং পোশাক তল্লাশি করে যেতে লাগল।

কয়েদিদের তল্লাশি করে জমিনের একদিকে বসিয়ে দেওয়া হতো। তাদের পকেট থেকে বের হওয়া টাকা ও অন্যান্য উপকরণ চাদর বিছিয়ে তাতে রাখা হলো। কয়েদিদের বুট, কোট, টুপি, পাগড়ি, রুমাল ইত্যাদি ফেলা হচ্ছিল। ঘটনাস্থলে একজন মার্কিন পুরুষ সাংবাদিক ও মহিলা সাংবাদিক উপস্থিত ছিল, যারা ছবি তুলছিল। মাগরিবের নামাজের সময় সংকীর্ণ হয়ে আসছে দেখে আমি কমান্ডার আমের জান ও নাদের আলী প্রমুখের কাছে নামাজ পড়ার অনুমতি চাইলাম। তারা নামাজ পড়ার অনুমতি দিতে অস্বীকার করল। এরই মধ্যে আরব কয়েদিদের গাড়ির বহর এল। দুজন আরবের তল্লাশি নেওয়া হলো। তৃতীয়জন নেমে কিছুটা দূরত্বে গিয়ে সামান্য সময় থামল এবং তারপর হাতে হ্যান্ড গ্রেনেড ধরে সামনে বাড়াল, যা সে পকেটে লুকিয়ে রেখেছিল। আমার পাশে প্রায় চার মিটার সীমানার মধ্যে তল্লাশি গ্রহণকারীদের সঙ্গে মাজার শরিফের পুলিশপ্রধান কমান্ডার নাদের আলী, এবং হিজবে ওয়াহদাতের কমান্ডার আসাদ হাজারাত দাঁড়িয়ে তদারকি করছিল। আরব মুজাহিদ পিন বের করে হ্যান্ড গ্রেনেড হাতের তালুতে রাখল এবং বাহু বাড়িয়ে দিল। সামনে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হলো। আমি মাটিতে শুয়ে পড়লাম। আমার কোনো ধরনের চোট লাগেনি। পাশে দাঁড়নো পুলিশপ্রধান নাদের আলী ও কমান্ডার আসাদ হাজারাহ বিস্ফোরণের চোটে পাঁচ মিটার দূরে গিয়ে পড়ল। তাদের দেহ উড়ে গেল এবং বোমা নিক্ষেপকারী আরব মুজাহিদও শহীদ হয়ে গেলেন। ওরা মুহূর্তেই পলায়নপর হয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। হিজবে ওয়াহদাতের উভয় কমান্ডার নিহত হয়েছিল। হাজারাহ গোত্রের বন্দুকধারীরা আমাকে ধরে ফেলল এই বলে যে, আমাদের কমান্ডারদের তুমিই হত্যা করেছ। কারণ তুমি তাদের পাশে দাঁড়ানো ছিলে! তারা তো মারা গেল আর তুমি নিরাপদ থেকে গেলে। আমি ওদের বললাম, হামলাকারী জমিনে পড়ে থাকা এই আরব ছিল। ওরা আমাকে বন্দুকের বাঁট দিয়ে আঘাত করে নিজেদের রাগ ঝাড়ছিল।

এ অবস্থায় আমি আমার কমান্ডার পরিচয় প্রকাশ না করে নিজেকে সাধারণ তালেবান কয়েদিদের মধ্যে শামিল করে নিতে এবং তাদের সাথে মিশে যেতে

চেষ্টা করতে থাকি। কেননা, আমাকে তালেবান কমান্ডার হিসেবে শনাক্তকারী উভয় কমান্ডার নাদের আলী ও আসাদ হাজারাহ নিহত হয়েছিল। তাদের পর আমাকে আর কেউ চিনতে পারছিল না। হাজারাহ গোত্রের যুদ্ধংদেহিরা চরম ক্ষুব্ধতা নিয়ে নিজ কমান্ডারদের লাশের দিকে মনোযোগী হলো। আমি ধীরে ধীরে হেঁটে কয়েদিদের জমায়েতের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। ওরা আমাকে দেখে বন্দুক তাক করত, আমি মাটিতে শুয়ে পড়তাম। আবার উঠে বসতাম, ওরা সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক তাক করত। এভাবে আমি কয়েদিদের মজমায় পৌঁছে যেতে সফল হলাম। একসময় আমি কয়েদিদের মাঝে হারিয়ে গেলাম। আমি আমার সঙ্গীদের বুঝিয়ে দিলাম, এখন আমি কমান্ডার নই; বরং সাধারণ কয়েদি। আমি নাম পাল্টিয়ে দিলাম। এখন থেকে আমাকে আবদুল গাফফার নামে ডাকা হবে।

আমরা এই হিটলারবাজির সময় মাগরিবের নামাজ পৃথক পৃথকভাবে তায়াম্মুম করে পড়লাম। অন্ধকার ছেয়ে যাচ্ছিল। হাজারাহ গোত্রের সশস্ত্র লোকরা যুদ্ধংদেহি মনোভাব নিয়ে এল। তারা আমাদের ওপর বন্দুক তাক করে ফায়ার করতে যাচ্ছিল, এ অবস্থায় দোস্তামের উজবেক সিপাহিরা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। তারা আমাদের কঠোরতার সঙ্গে দূরে ঠেলে দিল। উজবেক সৈন্যরা যুদ্ধবাজ হাজারাহদের ওপর অস্ত্র তাক করল। তাদের পরস্পর সংঘর্ষ হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়ে গেল। আঁধার ছেয়ে যেতে থাকে। কেল্লায় উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। হিজবে ওয়াহদাতের কমান্ডারদের নিহত হওয়ার খবর শুনে দলে দলে সশস্ত্র বাহিনীর কেল্লায় প্রবেশ শুরু হয়ে যায়। সশস্ত্র যোদ্ধারা প্রতিশোধ নিতে অগ্নিশর্মা হয়ে কয়েদিদের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। কয়েদিরা দেয়াল ঘেঁষে ঘাসের ওপর ভয়ে ভয়ে বসে অনিশ্চিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছিল। বড় কমান্ডারদের অনুপ্রবেশে সাময়িকভাবে রক্তারক্তি থেমে গেল। আরো একবার কয়েদিদের ওপর তল্লাশির ধারা শুরু করা হলো।

নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করে দেওয়া হলো। তল্লাশিতে নির্দয়তা ও কঠোরতা অবলম্বন করা হতে লাগল। তল্লাশির পর ছয়শ কয়েদিকে একটি সংকীর্ণ ও অন্ধকার বাংকারে বন্দি করে রাখা হলো। এই ছোট বাংকারে জায়গা ছিল কম। সবাই বসে বসে রাত কাটালাম। পা লম্বা করে শুতে পারছিলাম না। স্থানের সংকীর্ণতা ও অন্ধকারের কারণে কষ্টের তীব্রতা আরো বেড়ে গেল। রুটি ছিল না, পানি ছিল না। সবার মুখ শুকিয়ে গেল, দুর্বলতা বেড়ে গেল।

আজ ছিল দ্বিতীয় রাত। আমরা ছিলাম ক্ষুধার্ত। দিনে রোজা রেখেছিলাম সাহরি না খেয়ে। প্রত্যেকে এশার নামাজ নিজ নিজ স্থানে বসে তায়াম্মুম করে ইশারায়

আদায় করলাম। সিজদার জায়গা পর্যন্ত ছিল না। আরব মুজাহিদীন আমাকে অভিযোগ করতে লাগল, আমরা আপনার কথায় তাদের কাছে অস্ত্র সমপূর্ণ করলাম, আর তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের গ্রেপ্তার করে কেল্লায় বন্দি করল। আমি আরব মুজাহিদদের উত্তরে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলতাম, এখন তো আমি অসহায়। কিছুই তো করতে পারছি না। আমিও আপনাদের সঙ্গে বন্দি।

তখন রাত প্রায় ১০টা। বাংকার প্রচণ্ড বিস্ফোরণে গর্জে উঠল এবং বারুদের ধোঁয়া ও গন্ধে ভরে গেল। উত্তরাঞ্চলীয় জোটের রক্তপিপাসু যোদ্ধারা বাংকারের ভেতরে হ্যান্ড গ্রেনেড ছুড়ে মেরেছিল, যার ফলে সাতজন তালেবান ঘটনাস্থলেই শহীদ হয়ে গেলেন। আহতদের এক বড় অংশ সারা রাত আঘাতের কারণে কাতরাচ্ছিল। অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছিল না যে কে কতটুকু আহত হয়েছে! রাতটা বসে বসে অস্থিরতার সঙ্গে যাপিত হলো। জিকির ও তিলাওয়াত করতে করতে ফজর হয়ে গেল। ফজরের নামাজ তায়াম্মুম করে বসে বসে আদায় করলাম।

২৫ নভেম্বর সকাল থেকেই একেক কয়েদিকে পর্যায়ক্রমে বাংকারের বাইরে এনে তল্লাশি করে ও হাত বেঁধে এলোপাতাড়ি মারতে মারতে অজ্ঞাত স্থানের দিকে নিয়ে যাওয়া শুরু হলো। কয়েদিদের আশঙ্কা ছিল, হত্যা করার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বেলা ১১টা বেজে গেল। বাংকারে আমরা স্রেফ ৫০ জন কয়েদি অবশিষ্ট ছিলাম। হঠাৎ বাইরে থেকে তাকবির ধ্বনির সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে গুলি শুরু হলো। যুদ্ধ তখন শুরু হলো, যখন হিজবে ওয়াহদাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হাজারাহ বংশের এক যুদ্ধবাজ এক আরব মুজাহিদের তল্লাশিকালে তার পকেট থেকে পবিত্র কুরআন বের করে জিজ্ঞাস করল যে এটি কী? আরব মুজাহিদ জবাবে বলল, এটি কুরআন মাজিদ। বদবখত হাজারাহ যুদ্ধবাজ অবজ্ঞার সুরে অপবিত্র উচ্চারণ করতে করতে পবিত্র কুরআন দূরে ছুড়ে মারল। আরব মুজাহিদ কুরআন পাকের লাঞ্ছনা বরদাশত করতে পারল না। সে পেছনে দাঁড়ানো অন্য এক আরব মুজাহিদকে ইঙ্গিত করল, যে আগে থেকেই হ্যান্ড গ্রেনেড লুকিয়ে রেখেছিল। সে হ্যান্ড গ্রেনেডের পিন বের করে হাজারাহ যোদ্ধাদের দিকে ছুড়ে দিল। বিস্ফোরণে কয়েকজন উড়ে গেল। অবশিষ্ট যোদ্ধারা ব্যস্তসমস্ত হয়ে নিজেদের গান ওখানে ফেলে ভীতবিহ্বল হয়ে উল্টো দিকে পালাতে লাগল। আগে থেকে ছাদে মোতায়েনকৃত বন্দুকধারীরা চারদিক থেকে তালেবানের ওপর ফায়ার শুরু করল। আরব মুজাহিদরা তাদের বন্দুক ছিনিয়ে নিল এবং নিচু হয়ে অস্ত্র তুলে বীর পুরুষোচিত মোকাবিলা শুরু করল।

ফায়ারিং তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছিল। এত প্রচণ্ড ফায়ারিং শুরু হয়ে গেল যে, আমরা মাথা তুলে বাইরে তাকাতে পারছিলাম না।

কেল্লার চারদেয়ালে ও চূড়ার ওপর দাঁড়ানো উত্তরাঞ্চলীয় যোদ্ধারা পিছমোড়া করে বাঁধা নিরস্ত্র কয়েদিদের ওপর বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ করতে লাগল। এভাবে জোহরের নামাজের সময় হয়ে গেল। আমরা নামাজ পড়লাম। সুরা ইয়াসিন পাঠ করলাম। আল্লাহর কাছে মদদ চেয়ে সব সঙ্গী পরস্পর গলাগলি করে মাফ বিনিময় করলাম এবং আখেরি মুলাকাত হিসেবে মিলতে লাগলাম। আমরা নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলাম যে, বের করা সব কয়েদিকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। আর এখন আমাদেরও হত্যা করা হবে। আচমকা বাংকারের বন্ধ দরজা খুলে গেল এবং এক আরব মুজাহিদ ভেতরে প্রবেশ করল। সে তার উভয় হাতে পাথর উঠিয়ে নিয়েছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কী হলো? সে বলল, আলহামদুলিল্লাহ, কামিয়াবি, শুকরান। আমি আরব মুজাহিদের কথা শুনে দাঁড়ালাম এবং তার সঙ্গে বাইরে বের হলাম। বাকি সঙ্গীদের অপেক্ষা করার জন্য বলে দিলাম। যখন বাংকার থেকে বের হলাম, তখন বাইরে ছিল 'কিয়ামতে সুগরা'র (ছোট কেয়ামতের) দৃশ্য। কেল্লার মাঝখানে শহীদদের লাশ বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে ছিল। শহীদদের হাত পিছমোড়া বাঁধা ছিল (আরব মুজাহিদ হয়তো শাহাদাতকে কামিয়াবি বলছিল)। শহীদদের মাঝখানে পড়ে থাকা অনেকে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে কাতরাচ্ছিল। ২০ জন নিরাপদে থাকা তালেবান সম্মুখস্থ দেয়ালের সঙ্গে বসা ছিল। তাদের হাত পেছনে বাঁধা ছিল। আর কিছু তালেবান গর্তের ভেতর লুকিয়ে ছিল। তাদের কাছে গান ছিল। তারা মোকাবিলা করছিল। চারদিক থেকে ফায়ারিং অব্যাহত ছিল। উত্তরাঞ্চলীয় জোট নিরস্ত্র কয়েদিদের প্রতিরোধ বরদাশত করতে পারছিল না। তখন তারা তাদের কাবু করার জন্য মার্কিন বিমানের সাহায্য তলব করল। জোহরের নামাজের পর বিমান সাড়ম্বরে কেল্লার দক্ষিণ দিকের অংশে বোমাবর্ষণ করতে লাগল। দোস্তামের ট্যাংক কেল্লার উত্তর দিকের অংশ থেকে সামনে এগিয়ে গোলাবর্ষণ করতে লাগল। বাইরে থেকে কেল্লার ভেতরে মর্টার তোপ থেকেও গোলা নিক্ষেপ করা হচ্ছিল। ট্যাংক, তোপ ও বিমান একযোগে অগ্নিবৃষ্টিতে লিপ্ত ছিল। চারদিক ধোঁয়া আর ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল। ধুলা উড়তে লাগল সবেগে। ওই ধুলাবালির কারণে আমাদের চলাফেরা সহজ হয়ে

গেল। এ থেকে সুযোগ গ্রহণ করে মোকাবিলাকারী মুজাহিদীন এদিক-ওদিক আসা-যাওয়া করছিল এবং দুশমনের গুলি থেকে নিরাপদে ছিল।

এরই মধ্যে একজন আহত আরব মুজাহিদ আমার কাছে এল, যার কর্তিত হাত শুধু চামড়ার সঙ্গে ঝুলছিল। তার কথা ছিল, আমার হাতটা কেটে ফেলো। হয়তো তার মনে হযরত মায়াজ রা.-এর সুন্নাতের ওপর আমল করার খেয়াল এসেছিল। আমি তার ঝুলন্ত হাত বাহুর সঙ্গে বেঁধে দিলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, খুব কষ্ট হচ্ছে না তো? সে বলল– 'আলহামদুলিল্লাহ শুকরান, জুড়েম জুড়েম' (আল্লাহর শোকর, আমি সুস্থ আছি, একদম সুস্থ আছি) বলতে বলতে ফের লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে খন্দকের (পরিখা) দিকে চলে গেল।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে বাংকার থেকে বের করে বাইরে আনা তালেবান ও আরব মুজাহিদদের কাতারে বসিয়ে মার্কিন সিআইএর দুজন অফিসার তদন্ত করছিল। সিআইএ এজেন্ট ছবি তুলছিল আর ভিডিও ফিল্ম তৈরি করছিল। ওই দুই অফিসারের হাঁটুতে পিস্তল বাঁধা ছিল। একজন আফগানদের বেশ ধারণ করেছিল আর দাড়িও রেখেছিল। অন্যজনের ছিল লম্বা গোঁফ। সে সকাল থেকে বিশেষভাবে আরব মুজাহিদদের কাছ থেকে তথ্য নিচ্ছিল। সে ক্যামেরা হাতে সাংবাদিকের রূপ ধারণ করেছিল। যখন বাংকারের পাশ থেকে বিস্ফোরণ ও ফায়ারিংয়ের আওয়াজ এল, তখন গোঁফওয়ালা সিআইএর এজেন্ট তার পিস্তল বের করে সোজা তালেবানের ওপর ফায়ার করতে উদ্ধত হল। কিন্তু ঠিক আগমুহূর্তেই তার পায়ের কাছে তদন্তের জন্য নিজের পালার অপেক্ষায় বসে থাকা আরব মুজাহিদ দ্রুত লাফ দিয়ে তার পিস্তল ধরা হাত কাবু করে ফেলল। এ সময় অন্য মুজাহিদরা সামনে গিয়ে তাকে চেপে ধরল এবং দেখতে দেখতেই তার 'কাম' শেষ করে দিল। মুহূর্তের মধ্যে সঙ্গীর জাহান্নামে চলে যাওয়ার দৃশ্য দেখে দ্বিতীয় এজেন্ট তার পিস্তল থেকে ফায়ার করতে করতে প্রাণ বাঁচাতে উল্টো দিকে ভাগতে শুরু করল।

মার্কিন বিমানগুলো কেল্লায় অবরুদ্ধ বন্দিদের ওপর ২০০০ পাউন্ড ওজনের বোমা নিক্ষেপ করতে শুরু করল। আগুন লাগার পর ভবনসমূহ ধসে পড়তে লাগল। ময়দানে গর্তের সৃষ্টি হলো। বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতায় একেক মুজাহিদ ২০ মিটার দূরে গিয়ে পড়ত। তাদের শরীর থেকে রক্তের ফোয়ারা বইতে থাকে। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে আমার কানের পর্দা ফেটে যায় এবং তা থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। আমেরিকা বিশেষ ধরনের রাসায়নিক বোমাও ব্যবহার করে। আমার শরীরে এখনো রাসায়নিক বোমার চিহ্ন আছে। আমার সারা শরীর ব্যথা

করছে। বিমানের বোমাবর্ষণ ও দোস্তাম বাহিনীর ট্যাংকের গোলা নিক্ষেপে কেল্লার অভ্যন্তরে বাঁধা তাদের শত শত ঘোড়া মারা যায় এবং আঘাতপ্রাপ্ত হয়।

এ সময় যেসব আরব মুজাহিদ অস্ত্রের জন্য উদগ্রীব ছিল, তারা আমার কাছে এসে জানতে চাইল কেল্লার অস্ত্রভাণ্ডার কোথায়? আমি যখন গাড়িতে করে কেল্লায় প্রবেশ করি তখন বাঁ দিকের একটি ওয়ার্কশপের দরজায় লাগানো সাইনবোর্ডে লেখা দেখেছিলম 'ওয়ার্কশপ হাওয়ান ডিপো'। অর্থাৎ মর্টার গানের গুদাম ও ওয়ার্কশপ। তাই গুলিবৃষ্টিতে দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করা আরব মুজাহিদদের নিয়ে সোজা অস্ত্রগুদামে পৌঁছলাম। দরজা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করলাম। এখানে একটি ভালো মর্টারগান, দুটি বড় মেশিনগান, একটি আরপিজির রকেট, একটি কালাশনিকভ এবং একটি এন্টি এয়ার ক্রাফট গান মিলে গেল। এগুলো দ্বারা আমাদের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন পূর্ণ হয়ে গেল। এখন আমরা রুদ্ধ হয়েও মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে পারছিলাম। আরবরা যেহেতু অতিপরিশ্রমী এবং অস্ত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হয়ে থাকে, সেহেতু আমি একজন আরব মুজাহিদকে ট্যাংকবিধ্বংসী রকেট এবং আরেকজনকে অ্যান্টি এয়ার ক্রাফট দিয়ে কেল্লার দরজার কাছে পাঠিয়ে দিলাম, যে পথে ট্যাংকসমূহ আসার সম্ভাবনা ছিল। বাদবাকি অস্ত্র অন্যান্য মুজাহিদের মধ্যে বণ্টন করে বিভিন্ন অবস্থানে পাঠিয়ে দিলাম। এখন কেল্লা আমাদের দখলে। শত্রুর বড় দলটা কেল্লার বাইরে সমবেত হলো। তারা কেল্লার চারদিক ঘিরে ফেলল। ট্যাংক ও সাঁজোয়া যানও আনা হলো, যাতে মার্কিন ও ব্রিটিশ সাঁজোয়া যানও অন্তর্ভুক্ত ছিল। শত্রুপক্ষ থেকে নিক্ষিপ্ত ট্যাংক এবং গোলার জবাবে আমরা কেল্লার অস্ত্রগুদামে পড়ে থাকা পুরনো গোলা ও রকেটে আগুন লাগিয়ে ছুড়ে মারতাম। তা কেল্লার বাইরে গিয়ে প্রচণ্ড আওয়াজে বিস্ফোরিত হতো। এই কঠিনতম যুদ্ধের সময় এক আরব মুজাহিদ কেল্লাভ্যন্তরে ঘুরে ঘুরে উচ্চ আওয়াজে পূর্ণ জোশের সঙ্গে বলে যাচ্ছিলেন–

وَاللهِ رَائِحَةُ الْمِسْكِ، وَاللهِ رَائِحَةُ الْمِسْكِ!

আল্লাহর কসম, মিশকের সুগন্ধ আসছে, আল্লাহর কসম মিশকের সুগন্ধ আসছে!

মুজাহিদরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে লড়ে যাচ্ছিলেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকল। যখন গোলাবর্ষণ কিছুটা কমল, তখন আমরা পানি দিয়ে ইফতার করলাম এবং মাগরিবের নামাজ পড়লাম। আমাদের দলের সঙ্গীরা জিজ্ঞেস করতে লাগল, এখন কী করা যায়? আমাদের কাছে লড়াই করার জন্য পর্যাপ্ত অস্ত্র ও রসদ নেই। সাফল্যের কোনো পন্থা দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। আমি যেহেতু

মাজার শরিফের সব এলাকা সম্বন্ধে অবগত ছিলাম, আমি পরামর্শ দিলাম যে, কেল্লার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত চূড়ায় হামলা করে তা কবজা করা যায়। ওই চূড়ার নিকটবর্তী বসতি পশতুনদের। রাতের আঁধারে ওখান থেকে বের হওয়া সহজ হবে। একপর্যায়ে আমরা দক্ষিণ-পশ্চিম চূড়ায় হামলা করে বসলাম, যেখানে দোস্তামের সৈন্যরা মোর্চা তৈরি করেছিল। তারা কিছুক্ষণ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তারপর চূড়া থেকে পিছু হটে পালিয়ে গেল। আমরা চূড়া দখল করে নিলাম। এবার কেল্লার বাইরে থেকে সেই চূড়ার ওপর গুলিবর্ষণ হতে লাগল। চূড়ায় ট্যাংকের গোলা এসে আঘাত করার আগে আমরা অন্ধকারের সুযোগ গ্রহণ করে কেল্লা থেকে অবতরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম।

চূড়া থেকে পাগড়ি ঝুলিয়ে একেকজন সঙ্গীকে দেয়ালের বাইরে নামানো হচ্ছে। দু-তিনজন করে ধীরে গা বাঁচিয়ে বসতিতে ঢুকে পড়ল। দুশমনের লোকরা ডানে-বাঁয়ের অলিগলিতে উপস্থিত ছিল। কিন্তু তাদের সম্পূর্ণ মনোযোগ ছিল কেল্লার দিকে। তারা এদিকেই গুলি চালিয়ে যাচ্ছিল। প্রায় ৩০ জন আরব, পাক ও আফগান মুজাহিদ কেল্লা থেকে বাইরে লাফিয়ে পড়তে সফল হলো। আমি বাকি আরব মুজাহিদদেরও বের হওয়ার পরামর্শ দিলে তারা– اما الفتح, واما الشهادة (হয় বিজয়, না হয় শাহাদাত) বলে বেরিয়ে যেতে অস্বীকৃতি জানাল। যখন তারা কোনো মতেই যেতে সম্মত হলো না, তখন শেষ পর্যন্ত আমিও কেল্লা থেকে নেমে ধীরে ধীরে গ্রামের দিকে পা বাড়ালাম। কেল্লার বাইরে আরো সৈন্য সমবেত হচ্ছিল। অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে মাজার শরিফ থেকে বের হয়ে আমরা তিনটি দলে বিভক্ত হলাম। দুই দল চার বুরজকের দিকে রওনা হলাম এবং একদল বলখের দিকে। আমরা সারা রাত চলে সকালবেলা বলখের এক গ্রামে পৌঁছে গেলাম। যখন আমরা ওই গ্রামবাসীকে বললাম যে, আমরা জঙ্গি কেল্লা থেকে এসেছি; তখন তারা আমাদের অবস্থা দেখে কাঁদতে লাগল। তারা আগুন জ্বালল, গরম পানি আনল, আমাদের হাত-মুখ ধুইয়ে দিল। বারুদ, ধোঁয়া ও মাটির কারণে আমাদের অবস্থা ছিল শোচনীয় এবং কয়েক প্রহর থেকে খানা না-খাওয়ায় দুর্বলতাও ছিল অনেক। গ্রামবাসী আমাদের রুটি দিল। আমরা রোজা রাখলাম। আজানের পর ফজরের নামজ পড়ে ফের রওনা হয়ে গেলাম। স্থানীয় কমান্ডারের গ্রামের ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতে তাঁর আস্তানায় পৌঁছে গেলাম। এখানে তালেবানের সাবেক কমান্ডার ইন চিফ মোল্লা দাদ উল্লাহ, সামারগানের গভর্নর মোল্লা আবদুল মান্নান হানাফি ও মোল্লা আবদুল আলী আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন। তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে অনেক আনন্দিত হলাম এবং আমরা তিন দিন পর্যন্ত তার ডেরায় কাটালাম।

তৃতীয় দিন সংবাদ পেলাম, দোস্তাম মার্কিন সেনাদের সাহায্যে কেল্লা-ই জঙ্গি দখল করে ফেলেছে এবং শত শত মুজাহিদকে শহীদ করে দেওয়া হয়েছে। কয়েকজনকে জীবিত গ্রেপ্তার করে নেওয়া হয়েছে। মার্কিনরা বাংকারে ধোঁয়া ও পানি দিয়ে ভরে দেয়। ঠাণ্ডা পানি এবং ধোঁয়ার কারণে আহত মুজাহিদরা শহীদ হয়ে যান। যারা বেঁচে ছিল, তারা সারা রাত হিমশীতল পানিতে দাঁড়িয়ে থাকায় তাদের পা অবশ হয়ে যায়। তারা নড়াচড়া করতে পারছিলেন না। সকালবেলা রেডক্রসকর্মীরা তাদের বাইরে নিয়ে এল। তারপর তাদের গ্রেপ্তার করা হলো।

আহতদের সঙ্গে খুবই খারাপ আচরণ করা হলো। ভারী পাথর দ্বারা তাদের মাথা চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়া হলো। তাদের পেট চিড়ে দেওয়া হলো। আমার কাছে এ খবরও এসেছিল যে, দোস্তাম মুজাহিদীনের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য তৃতীয় দিন কমান্ডার মোল্লা ফজল আখন্দকে কেল্লা-ই জঙ্গিতে নিজের সঙ্গে নিয়ে এসেছিল, যেন তিনি মুজাহিদীনকে অস্ত্র সমর্পণ করতে বলেন এবং যাঁরা জীবিত লুকিয়ে ছিলেন তাঁরা হামলা না করেন। দোস্তাম মোল্লা ফজল আখন্দকে এটা দেখানোর জন্য নিয়ে এল যে, তিনি যেনো দেখেন, তালেবানরা বিদ্রোহ করেছে। অথচ আমরা জানতাম, ওখানে কী ঘটেছিল!

কমান্ডারের অনুপস্থিতিতে তাঁর ডেরায় বসে আমাদের কাছে সব খবরাখবর পৌঁছতে থাকে। তৃতীয় দিন আমরা রাতেরবেলায় গোপনে রওয়ানা হলাম। আমাদের শঙ্কা ছিল, কমান্ডার লোভে পড়ে আমাদের দোস্তামের হাতে তুলে দেবে। মোল্লা দাদ উল্লাহ অন্য কোনো দিকে চলে গেলে আমি দুজন সঙ্গীসহ পার্শ্ববর্তী এক গ্রামে আশ্রয় নিলাম। আমি যাদের ঘরে অবস্থান করলাম তাদেরকে দুটি কালাশনিকভ ও একটি ওয়্যারলেস সেট দিয়ে দিলাম। তারা যারপরনাই আনন্দিত হলেন।

তৃতীয় দিন খবর ছড়িয়ে পড়ল, দোস্তাম বাহিনী ট্যাংকসহকারে গ্রাম ঘেরাও করতে শুরু করেছে। ঘেরাও সম্পূর্ণ হওয়ার আগে ঘরের মালিক নিজের ছেলের সাথে আমাদেরকে অন্য আশ্রয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করিয়ে দিলেন। গ্রামের পেছনের দিক থেকে অন্য গ্রামে তাদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল। ওখানে কিছুক্ষণ বিরতি নিলাম। এরপর পরস্পর পরামর্শ করে আমার দুজন সঙ্গী ওখানে অবস্থান করল। আমি আবার আগের বাড়িতে চলে এলাম। আমি ওখানে প্রায় তিন মাস অবস্থান করি। একবার ঘরে বসা ছিলাম। এ অবস্থায় রেডিওতে বলখ থেকে দোস্তামের বক্তব্য প্রচার শুরু হলো, যাতে সে সুবারগানের জেলে বন্দিদের সম্বোধন করে বলল যে, তোমরা মোল্লা ফজল ও মোল্লা দাদ উল্লাহর সঙ্গী এবং আমার সঙ্গীদের শহীদ (!) করেছ। কাজেই

তোমরা নিরপরাধ নও। তোমাদের কখনো মাফ করা যাবে না ইত্যাদি। রেডিও থেকে আজেবাজে গান প্রচারিত হতে থাকে। অথচ তালেবান আমলে এসব ছিল না।

জোহরের পর একদিন আমি গ্রাম থেকে বের হলাম। তখন লোকেরা আমাকে বলল, আপনার আরো একজন মুজাহিদ সঙ্গী আছেন, যিনি ওই নিকটবর্তী জমিতে কাজ করছেন। আমি যখন ওই জমিতে গেলাম, তখন ওখানে এক আরব মুজাহিদ ছিলেন, যাঁর কাঁধে ক্ষত ছিল। তিনি আহত অবস্থায় কেল্লা থেকে বের হতে সফল হয়েছিলেন। তিনি উজবেকি পোশাক পরে একজন কৃষানের রূপ ধারণ করেছিলেন। এক হাতে তিনি কোদাল, আরেক হাতে চরকির লাঠি ধরে ছিলেন। তিনি ছিলেন তায়েফের অধিবাসী। একটা ক্ষেতের পাশে বসে আমাদের আলোচনা হলো। পুনরায় তিনি তার গ্রামে এবং আমি আমার গ্রামে চলে আসি। চলে আসার সময় আমি তাকে ১৫০০ (পনের হাজার) রুপি পকেট খরচ দিলাম। রোজার ঈদের পর দোস্তাম বাহিনী অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে সেই আরব মুজাহিদ ও আমার দুজন তালেবান সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করল। আমি আবার বেঁচে গেলাম। এ গ্রামে আমার নাম ছিল আবদুল গাফফার।

এভাবে আমি আর কদিন গা বাঁচিয়ে থাকব! তাই অবশেষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো কাবুল যাওয়ার। এটা খুবই বিপজ্জনক সফর ছিল, যাতে কদমে কদমে গ্রেপ্তার হওয়ার আশঙ্কা ছিল। আমার আশ্রয়দাতাদের প্রচেষ্টা ও দুঃসাহসের প্রশংসা করতে হয়। তারা বোরকা পরিহিত এক বৃদ্ধ মহিলা ও দুটি শিশুকে আমার সঙ্গী করে দেন এবং নিজেরাও পিছনে পিছনে আসতে থাকেন। আমি পোশাক-আশাক বদল করে পথিকের রূপ ধারণ করি। মাথায় পাঞ্জেশিনি টুপি পরে মুখে সিগারেট নিয়ে মাজার-ই শরিফ বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছলাম। ওখান থেকে ট্যাক্সিতে কাবুল রওনা হলাম। চেকপোস্টের কাছে এসে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে নির্দ্বিধায় বাচ্চাদের কোলে নিয়ে বসে থাকলাম। উত্তরাঞ্চলীয় জোটের প্রহরীদের থেকে গা বাঁচিয়ে কাবুল পৌঁছলাম এবং রাতটি হোটেলে কাটালাম। রাতেরবেলায় আশ্রয়দাতাদের কাছে নিজের বিস্তারিত পরিচয় দিলাম এবং নিজের পুরো কাহিনী শুনিয়ে দিলাম। তারা হতবাক হয়ে গেল। আমি তাদের তিন মাস পর্যন্ত সাবধানতাবশত নিজের সম্বন্ধে কোনো কিছু বলিনি। তারা আমার কাহিনী শুনে অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হলো। সকালে উঠে নামাজ পড়লাম। আশ্রয়দাতাদের সঙ্গে বিদায়ী মোলাকাত করলাম এবং তাদেরকে পুনরায় মাজার-ই শরিফের দিকে রওনা করিয়ে দিলাম।

এবার এখান থেকে সামনের দিকে আমি একা সফর করছিলাম। আমি কাবুল

থেকে গজনি পৌঁছলাম। বাসস্ট্যান্ডে নামতেই এক ব্যক্তি আমাকে দেখে কোনো কথাবার্তা ছাড়াই আমার হাত ধরে তার গাড়িতে নিয়ে সামনের দিকের আসনে বসিয়ে দিলেন। এ ট্যাক্সিচালক ছিলেন আমার পুরনো বন্ধু, যিনি রণাঙ্গনে আমার সঙ্গী ছিলেন। আজকাল হালাল রুজির তালাশে গাড়ি চালাচ্ছেন। রাস্তায় আমার ওই বন্ধুকে সব কাহিনী শোনালাম। তিনি খুব খুশি হলেন। রাত যাপন করলাম শহরে। সকালে কান্দাহার শহর নিরাপদে অতিক্রম করে নিজ বাড়িতে পৌঁছে গেলাম।

কুন্দুজে আমাদের সঙ্গে কী ধরনের প্রতারণা করা হয়েছে, কেল্লায় কী কেয়ামত চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া কয়েদিদের ওপর কী অত্যাচার চালানো হয়েছে– এসব আমি কখনো ভুলতে পারব না। শহীদানের একেক ফোঁটা রক্তের হিসাব কুদরত অবশ্যই নেবেন। মহান আল্লাহর দরবারে আশা করি, কেননা তিনিই অবস্থার পরিবর্তনকারী।

মরা লাশও কান্না করে

একবারের ঘটনা ডাক্তার বাবর শাহাদাত বরণ করল। পেশোয়ারে তার লাশ আনা হল। উদ্দেশ্য তার পরিবারের লোকেরা শেষ বারের মত তাকে দেখবে। তারপর পেশোয়ারেই তাকে দাফন করবে। তিনি একজন অত্যন্ত মুখলিস ব্যক্তি ছিলেন। একাধিক ব্যক্তি শপথ করে আমাকে বলেছে, তার ছেলেরা যখন মাদরাসা থেকে এসে তার লাশের সামনে দাঁড়াল তখন তিনি কেঁদে ফেললেন আর তার অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। এ সময় তার মা এসে সামনে দাঁড়াল। বলল, হে বৎস! তুমি তো দীর্ঘ সফরে রওয়ানা হয়ে গেছ। সুতরাং তুমি তোমার হাত বাড়াও আমি মুসাফাহা করব। তোমাকে শেষ বিদায় জানাব। তখন সে তার হাত প্রসারিত করে মায়ের সাথে মুসাফাহা করল। একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে শহীদ জুল মুহাম্মদের ব্যাপারেও। জুল মুহাম্মদ পাকতিয়া প্রদেশে শাহাদাত বরণ করেন। উমর হানীফ ছিলেন কমান্ডার। তিনি আমাকে বলেছেন- আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি জুল মাহাম্মদের লাশের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তার পিতা এসে তার লাশের সামনে দাঁড়াল। আবেগপ্লুত হয়ে রোরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, হে ছেলে! তুমি যদি সত্যই শহীদ হয়ে থাক তাহলে আমাকে তার নিদর্শন দেখাও। সাথে সাথে সে হাত প্রসারিত করে তার পিতার সাথে মুসাফাহা করল। সে প্রায় পনের মিনিট তার পিতার হাত ধরে রাখল।

এক সেনাপতি বোকা বনে যাওয়ার ঘটনা

একবার শাইখ তামীম শহরে গেলেন। কিন্তু রাশিয়ার সৈন্যরা পথ বন্ধ করে দিয়েছে। কাউকে শহরে ঢুকতে দিচ্ছে না। কোন গাড়িও প্রবেশ করতে দিচ্ছে না। ড্রাইভার টহলরত সৈন্যকে বলল, ইনি কারী সাহেব। আরে কারী সাহেব চিনেন না, যিনি নামাজ পড়ান। টহলরত সৈন্য বলল, না এখন কাউকে যেতে দেওয়া যাবে না। উপরের নির্দেশ। এখন শাইখ তামীম আসবে বলে সংবাদ পৌছেছে। আমরা তাকে খুঁজছি। অথচ কী অবাক ব্যাপার! শাইখ তামীমই তখন চোখে চশমা দিয়ে গাড়িতে দিব্যি বসে আছেন। সৈন্য বলল, এখন যেতে পারবেন না। বিকাল পাঁচটার পর যেতে হবে।

ড্রাইভার বলল, নিশ্চয়ই সেনাপতি সাহেব ক্যাম্পেই আছেন। আচ্ছা, কারী সাহেব তার সাথেই কথা বলবেন। শাইখ তামীম সেনাপতির সাথেই কথা বললেন। শাইখ তামীম তো আর পশতু ভাষা জানেন না, তাই ইনিয়ে বিনিয়ে কিছু বলতে চেষ্টা করলেন। তখন ড্রাইভার বলল, আমাদের কারী সাহেব ফারসী ভাষায় কথা বলেন। পশতু ভাষা জানেন না। সেনাপতি আর কিছু চিন্তা করল না, বলল, এদের ছেড়ে দাও। পথ ছেড়ে দিলে তাদের গাড়ি ছুটে চলল। কিছুদূর যাওয়ার পর সেনাবাহিনীর আরেকটি ক্যাম্পের নিকট পৌছলেন। এবার তো আরো মহা সমস্যা। একেবারে পাথর ফেলে রাস্তা বন্ধ করে সৈন্যরা টহল দিচ্ছে। সৈন্যরা বলল, এখন তোমরা যেতে পারবে না। কিন্তু টহলরত সৈন্যদের প্রধান এগিয়ে এসে বলল, কেউ যাওয়ার অনুমতি দিলে আমি তাকে কুত্তার বাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চা বলে গালি দিতাম। কিন্তু আমি আপনাদের চিনি। আমি আপনাদের যাওয়ার রাস্তা খুলে দিচ্ছি। তারপর রাস্তা থেকে পাথর সরিয়ে ফেলা হল। তাদের নির্বিঘ্নে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হল।

মার্কিন অত্যাচারের
রক্তাক্ত দাস্তান

এক আইরিশ সাংবাদিকের হৃদয় কাঁপানো তথ্য

আফগানযুদ্ধের ব্যাপারে আমেরিকার বিরোধিতার পেছনে তার মনের ভেতরের রহস্য সম্পর্কে আপনারা এ রিপোর্ট থেকে জানতে পারবেন, দৈনিক পাকিস্তান যার তরজমা প্রকাশ করেছে।

এ রিপোর্টে আমেরিকার যে হিংস্রতা এবং আরব ও পাকিস্তানি মুজাহিদীন ও তালেবানের ওপর আপতিত রক্তাক্ত অত্যাচারের যে কাহিনী পেশ করা হয়েছে, এ থেকে বোঝা যায়, আমেরিকার নির্মমতায় মানবতা কেঁপে উঠেছে। সে তার অপরাধের ওপর পর্দা ফেলার সর্বতো প্রচেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু এক আইরিশ সাংবাদিক প্রামাণিক দলিল সহকারে সেসবের অনুসন্ধান নিতে সফল হয় এবং সে আমেরিকার হৃদয় কাঁপানো বন্য আচরণ সম্পর্কে দুনিয়াকে অবগত করে। দেখা যাক, কখন কুদরতের হাত নড়ে ওঠে এবং চেঙ্গিসি আচরণের হিসাব-নিকাশ হয়ে যায়।

১২ জুন আয়ারল্যান্ডের এক সাংবাদিক জিমি ডোরান জার্মান পার্লামেন্টে ২০ মিনিট স্থায়ী এক ফিল্ম প্রদর্শন করেন, যাতে মাজার-ই শরিফ ও শাবারগানের কাছে সন্ধান পাওয়া দুটি গণকবর দেখানো হয়, যাতে প্রায় এক থেকে তিন হাজার তালেবান ও আল-কায়েদার জানবাজ মুজাহিদ চিরনিদ্রায় শায়িত। উভয় কবর থেকে মানুষের অস্তিত্ব সুস্পষ্টভাবেই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। সেসব লাশের ওপর মাংসাশী বিহঙ্গগুলোর এবং কুকুরের নখর আঁচড়ের স্পষ্ট আলামত বিদ্যমান ছিল । এসব কবরে কে দাফন হয়েছে? এরা আফগানিস্তানের কোন জাতি-গোত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল? এদের হত্যা করেছে কে? কেন করেছে? এই ফিল্মে এসব প্রশ্নের জবাব সম্পূর্ণ বিদ্যমান।

পজিশন ফর হিউম্যান রাইটসের ডেপুটি ডাইরেক্টর বিবিসিকে বলেছেন, কোনো শক্তি এমন আছে যে এই লাশগুলোর বিস্তারিত পর্যবেক্ষণের অনুমতি না দিয়ে বা কোনো বিশেষ গ্রুপ নিজেকে যুদ্ধাপরাধ থেকে বাঁচাতে চায়? পজিশন ফর হিউম্যান রাইটস (পিএইচআর) দাবি করে, যুদ্ধাপরাধের এই গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্যকে ওই সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হোক, যতক্ষণ পর্যন্ত না এ মোকদ্দমা মানবতাবিরোধী অপরাধের আন্তর্জাতিক আদালতে পেশ করা হবে। তম্মধ্যে একটি গণকবর শাবারগান শহর থেকে আধা ঘণ্টার ব্যবধানে অবস্থিত, যেটা এক লাখ ৪০ হাজার ৬২৫ চতুর্ভুজ ফুট। অর্থাৎ ৩২ কানাল বা ১৪ একর

ক্ষেত্রফল এবং এটা চতুর্ভুজ আকৃতিবিশিষ্ট। কবরের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৪৭৫ ফুট এবং এতে প্রায় এক থেকে তিন হাজার লাশ দাফন করা হয়েছে। এই এলাকা উজবেক জঙ্গি কমান্ডার আবদুর রশিদ দোস্তামের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। নিষ্ঠুরতায় দোস্তাম হল আন্তর্জাতিকভাবে কুখ্যাতিপ্রাপ্ত। পিএইচআরের মতে, এ লাশগুলো জানুয়ারি বা ডিসেম্বরে এখানে দাফন করা হয়েছিল, ফেব্রুয়ারির শুরুতে যাদের সন্ধান পাওয়া যায়। সে সময় এ কবরগুলো থেকে পঁচে-গলে যাওয়ার দরুন সৃষ্ট দুর্গন্ধ এতই তীব্র ছিল যে, তা সহজেই অনুভব করা যেত। ফেব্রুয়ারির শেষনাগাদ রিপোর্টটি তৈরি করা হয়।

১ মার্চ হামিদ কারজাইয়ের কাছে ওই কবরগুলোর সংরক্ষণ, হত্যাকারীদের সম্পর্কে অনুসন্ধান ও তাদের চিহ্নিতকরণ সম্পর্কে জানার জন্য দরখাস্ত পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু কারজাই অদ্যাবধি সে চিঠির জবাব দেননি। যা দ্বারা এই ফলফল বের করা কঠিন নয় যে, কারজাই সরকার এ সমস্যার ওপর যবনিকাপাত ঘটাতে চায়। সংস্থাটি এই আশঙ্কা করছে যে, এ কবরগুলোকে হত্যাকারী গ্রুপ কোথাও আবার গায়েব করে না দেয়। তাদের এ রিপোর্ট প্রকাশ করে ২ মে। পিএইচআর মার্কিনদের কাছ থেকে এটি জানার চেষ্টা করছে যে তারা এই গণহত্যা সম্পর্কে কতটুকু ওয়াকিবহাল। কিন্তু পেন্টাগন রহস্যজনক বিকৃতির মাধ্যমে কাজ নিয়েছে। কারণ তারা জানে, এটি একটি ভয়ংকর রাজনৈতিক বিস্ফোরণ, যা শুধু আফগানিস্তান নয়, মার্কিন গণরায়কেও তাদের বিরুদ্ধে পাল্টে দিতে পারে এবং আফগানিস্তানে মার্কিনবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির বহ্নিমান স্ফুলিঙ্গে পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। পিএইচআর তার রিপোর্টে বলেছে, এই গণহত্যা ওই সময় করা হয়, যখন আকাশে মার্কিন বোমারু বিমান ও মার্কিন সৈন্যরা তৎপর ছিল। পিএইচআরের মেম্বার অব বোর্ড ডক্টর জিনি লিং সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচানা করতে গিয়ে বলেছেন, মার্কিনরা এ ব্যাপারে কতটুকু জানে, এটা বোঝা মোটেই মুশকিল নয়।

সানডে মিররের এক সাম্প্রতিক সংখ্যায় মার্কিন, ইউরোপীয় ও আফগানি যৌথবাহিনীর বন্দি তালেবানের সঙ্গে নির্যাতন ও পাশবিকতার এক হৃদয়বিদারক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, যা মধ্যযুগের চেঙ্গিস ও হালাকু খানকেও ছাড়িয়ে গেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী কুন্দুজে মার্কিন বাহিনীর সামনে প্রাণভিক্ষা দেওয়ার প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে আট হাজার তালেবান ও আল-কায়েদার জানবাজ যোদ্ধারা হাতিয়ার ফেলে দিয়েছিল। যাদের মধ্যে আরব, পাকিস্তানি ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ওইসব মুজাহিদ শামিল ছিলেন, যারা তালেবানের সঙ্গে মিলে ভিনদেশি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জিহাদরত ছিলেন। ডোরান তার ফিল্মে ওই সাক্ষ্যগুলোকে ফিল্মবন্দি

করেছিল, যাঁরা বলছেন, এ কবরগুলোতে কে চিরনিদ্রায় শুয়ে আছে? তাদের কোন অপরাধে হত্যা করা হয়েছে? ফিল্মে কেল্লা-ই জঙ্গিতে শহীদ করা এমন তালেবান ও আল-কায়েদা মুজাহিদীনকেও দেখানো হয়, যাদের মাথায় যখন গুলি করা হয়, তখন তাদের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা ছিল, যাতে তাদের মৃত্যু নিশ্চিত করা যেতে পারে। এই ফিল্ম জনসমক্ষে চলে আসার পর মার্কিন ও উত্তরাঞ্চলীয় জোটের সৈন্যদের বর্বরতা ও পাশবিকতার ওপর কঠোর সমালোচনা শুরু হয়ে যায়।

ডোরান তাঁর ফিল্মে প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার রেকর্ড করেছেন, যারা তিন হাজার তালেবান কয়েদির গণহত্যা খোদ সচক্ষে দেখেছে। বালুকাময় এ ময়দানে যেখানে এই ফিল্ম তৈরি করা হয়, তালেবান মুজাহিদদের মাথার খুলি, তাদের কাপড়, হাড়, তসবিহ, নামাজের টুপি, জুতা, ক্ষতবিক্ষত মানব শরীরগুলো স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে ছিল। মহাযুদ্ধের সময় নাজিদের জুলুম ও বর্বরতা এবং রুশদের হাতে বন্দিহত্যার তামাম দাস্তানও এই মার্কিন উৎপীড়নের সামনে বিবর্ণ হয়ে যায়।

ইউরোপে এই ফিল্ম মার্কিন পশুত্ব ও কয়েদিদের সঙ্গে ভীতিকর আচরণের এক মস্তবড় দস্তাবেজ হিসেবে সামনে এসেছে। ইউরোপের সব সংবাদপত্রে এই মানবতাদাহক আচরণের ব্যাপারে দীর্ঘ প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ইউরোপের দুটি বড় টেলিভিশন কোম্পানি ডোরানের সাক্ষাৎকারও প্রচার করে। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, মার্কিন টিভি চ্যানেল ও কেব্‌ল নেটওয়ার্কসহ আমেরিকার বিখ্যাত পত্রিকা লসঅ্যাঞ্জেলাস টাইমস, নিউইয়র্ক টাইমস ও ওয়াশিংটন পোস্ট এ ঘটনার ব্যাপারে চুপ মেরে আছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, কেল্লা-ই জঙ্গিতে পাঁচ থেকে ছয়শ পর্যন্ত মুজাহিদীনের শাহাদাতের পর মার্কিন বাহিনীর অধীনে তিন হাজার মুজাহিদকে শহীদ করা হয়েছে। কুন্দুজ বিপর্যয়স্থলে আট হাজার তালেবান জানবাজ উত্তরাঞ্চলীয় জোটের সৈন্যদের সামনে জীবনের নিরাপত্তা পাওয়ার প্রতিশ্রুতিতে হাতিয়ার ফেলে দেয়। উত্তরাঞ্চলীয় জোটের কমান্ডার রশিদ দোস্তামের এক জেনারেল আমিরজান ফিল্মে এটি স্বীকার করে বলেছে যে, মুজাহিদীন (তার ভাষায় ইসলামী সিপাহি) এই শর্তের ওপর হাতিয়ার ফেলে ৪৭০ জন তালেবান কয়েদিকে মাজার শরিফের কেল্লা-ই জঙ্গিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

৭৫০০ কয়েদিকে কেল্লাযাইন নামক জেলের দিকে পাঠিয়ে দিয়ে প্রকাশ্য বিদ্রোহের আড়াল নিয়ে মার্কিনরা প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করে। মার্কিন ও ব্রিটিশ সৈন্যরা উত্তরাঞ্চলীয় জোটের সঙ্গে মিলে শত শত কয়েদিকে শহীদ করে।

তাদের মধ্য থেকে কতক কয়েদির ঘাড় মটকে দিয়ে অকুস্থলেই শহীদ করে দেওয়া হয়। কেল্লা-ই জঙ্গিতে মার্কিন হিংস্রতার সময়ে ৮৬ জন মুজাহিদ কেল্লার নিচে বসে মাথা নিচু করে লুকিয়ে থাকার কারণে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। তাদের মধ্যে আবু জর সুলাঈমান আল ফারেস, আবদুল হামিদ ও জন ওয়াকারও শামিল ছিলেন। গোপনে ধারণকৃত এক ভিডিওতে জন ওয়াকারকে হাঁটু গেড়ে বসে থাকা অবস্থায় দেখানো হয়েছে, যেখানে তালেবান কয়েদিদের দীর্ঘ সারি লেগে আছে। এক মার্কিন অফিসার বিদেশি মুজাহিদ জন ওয়াকারকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল। তদন্তকারী মার্কিন অফিসারের আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল। সে বলছে, ব্যাপার হলো, এ সিদ্ধান্ত ওয়াকারকে করতে হবে যে সে জীবিত থাকতে চায় কি না? যদি সে এখানে মরতে না চায়, তবু তাকে এখানেই থাকতে হবে। আমরা ওকে এখানেই ছেড়ে যাচ্ছি, যেখানে তাকে আজীবন কারাভ্যন্তরেই থাকতে হবে।

যেসব তালেবান জানবাজরা আমেরিকানদের সামনে হাতিয়ার ফেলে দিয়েছিল, সেই সাড়ে সাত হাজারের মধ্যে তিন হাজার কয়েদিকে পৃথক করে ফেলা হয় এবং তাদের শাবারগান নামক জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, যা কুন্দুজ থেকে তিন দিনের দূরত্বে অবস্থিত। অক্সিজেনরোধক এক একটি সামুদ্রিক কন্টেইনারে দুই বা তিন শ কয়েদিকে ওঠানো হয়। একজন ড্রাইভারের সাক্ষ্যমতে, ১৫০ থেকে ১৬০ জন কয়েদি কন্টেইনারের ভেতরে সফরের কষ্ট ও দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে শহীদ হয়ে যান। কয়েদিদের সঙ্গে চলমান সেনাবাহিনীর এক রক্ষী তার সাক্ষ্য রেকর্ড করাতে গিয়ে বলেছে, কয়েদিরা অক্সিজেনশূন্যতার কারণে চিৎকার শুরু করে দিলে মার্কিন কমান্ডার তাকে নির্দেশ দিয়েছিল কন্টেইনারের ওপর গুলি করে ছিদ্র করে দিতে, যেনো বাতাস প্রবেশ করতে পারে। একজন টেক্সিড্রাইভার তার বর্ণনা রেকর্ড করাতে গিয়ে বলেছে, আমি কন্টেইনারের একটি দীর্ঘ সারি প্রত্যক্ষ করেছি। ওই কন্টেইনারগুলো থেকে রক্ত বেয়ে বেয়ে পড়ছিল। এ দৃশ্য দেখে আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায়।

শাবারগান জেলের এক কয়েদি তার বর্ণনা রেকর্ড করাতে গিয়ে বলেছে, তার সামনে মার্কিন সৈন্য একজন কয়েদির ঘাড় মটকে ভেঙে দেয়, আর তড়পাতে থাকা লাশের ওপর আঘাত করতে থাকে। নিজের সাক্ষ্য রেকর্ড করাতে গিয়ে সে আরো বলেছে, তার চোখের সামনে মার্কিন সৈন্যরা তালেবান কয়েদিদের মাথা মুণ্ডিয়ে দিত। অতঃপর তাদের মাথায় গরম পানি ঢালত, অথবা তার সঙ্গে মিশ্রিত বস্তু ঢেলে দিত। যার দরুন কয়েদিরা তড়পাতে থাকত। এগুলো দেখে মার্কিন সৈন্যরা উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়ত। একজন সৈন্য তার সাক্ষ্য রেকর্ড

করতে গিয়ে বলেছে, মার্কিন সৈন্যরা তালেবান কয়েদিদের আঙুল ও জিহ্বা কেটে দিত। অতঃপর তাদের মাথায় গরম পানি ঢালত। মার্কিনরা এগুলো চিত্ত বিনোদনের জন্য করত। মার্কিনরা জেল থেকে কয়েদিদের বের করত। তাদের দাড়ি মুণ্ডিয়ে দিত। তাদের এহেন উৎপীড়নের নিশানা বানাত যে তারা বেহুঁশ হয়ে যেত, অথবা মার্কিনরা মারতে মারতে নিজেরাই ক্লান্ত হয়ে যেত, তারপর তাদের পুনরায় জেলের ভেতর বন্দি করা হতো। অনেক সময় মার্কিনরা জেল থেকে কয়েদিদের বের করে সঙ্গে করে নিয়ে যেত। এ রকম কয়েদি আর কখনো ফিরে আসত না। আমার উপস্থিতিতে কতক কয়েদি গায়েব হয়েছে।

এক আফগান সৈনিক তার বর্ণনা রেকর্ড করাতে গিয়ে বলেছে, মার্কিনরা এ কাজ স্যাটেলাইট ক্যামেরা থেকে এড়িয়ে করত। এক মার্কিন কমান্ডার শাবারগান জেলে দাঁড়িয়ে কন্টেইনারের ট্রাকড্রাইভারদের নির্দেশ দিল, 'ক্যামেরার নজরে আসার আগেই এই কন্টেইনারগুলোকে 'দশতে লায়লা' নিয়ে যাও, আর ওখানে উপস্থিত জীবিত ও মৃত তালেবান কয়েদিদের দাফন করে দাও। দুজন সাধারণ শহুরে ট্রাকড্রাইভার ঘটনার সত্যায়ন করতে গিয়ে বলেছে, তারা তিন হাজার কয়েদিকে সাহারায় নিয়ে যায়, যেখানে তাদের জীবিত দাফন করে দেওয়া হয়। একজন ড্রাইভার তার সাক্ষ্য রেকর্ড করাতে গিয়ে বলেছে, এই গণকবরে নিয়ে যাওয়া কয়েদিদের মধ্যে জীবিত কয়েদিদের মার্কিন বাহিনীর ৩০-৪০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে গুলি করে মেরে ফেলা হয় এবং তাদেরকে পাঁচ ফুট গভীর ও ১৪ অ্যাস্টক ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট কবরে নিক্ষেপ করা হয়। তারপর বুলডোজারের সাহায্যে মাটি চাপা দেওয়া হয়। এর পরও কুকুর ও অন্যান্য মাংসাশী হিংস্র বন্য জন্তুরা মাটি খুঁড়ে মানব অস্তিত্ব বের করে আনে এবং সেগুলো থেকে আঁচড়ে আঁচড়ে গোশ্‌ত ভক্ষণ করতে থাকে। উক্ত ফিল্মের শেষ দৃশ্যে মুজাহিদদের শরীরের অবশিষ্টাংশ ও বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে থাকা হাড়গুলো দেখানো হয়।

মাজার শরিফ বিমানবন্দরের কাছে একটি নিতান্ত অগভীর গণকবরের সন্ধান পাওয়া যায়। জাতিসংঘ প্রতিনিধির মতে, আফগানিস্তানের যত অভ্যন্তরীণ অঞ্চল পর্যন্ত জাতিসংঘের উপস্থিতি ঘটবে, আরো অনেক গণকবর পাওয়া যাবে। পিএইচআরের ডেপুটি ডাইরেক্টর এই গণকবরগুলো ওই সময় সফর করেন, যখন তা থেকে পঁচে-গলে যাওয়ার কারণে সৃষ্ট দুর্গন্ধ এতই তীব্র ছিল যে. তা অনেক দূর থেকে অনুভব করা যেত। তিনি অভিযোগ করে বলেন, এরা কবরগুলোকে সাধারণভাবে দেখার জন্য অনুমতি দিচ্ছে না, আর লাশগুলোর পোস্টমর্টেমও করতে দেওয়া হচ্ছে না। পোস্টমর্টেম ছাড়া এটি নির্ধারণ করা মুশকিল যে এরা কারা ছিল। পিএইচআর বলেছে, কারজাই ও আন্তর্জাতিক

শক্তিগুলোর মুখে সম্পূর্ণ রহস্যজনকভাবে নীরবতার মোহর লেগে আছে। কারণ তারা জানে, রহস্য উন্মোচিত হলে একটি বড় ধরনের রাজনৈতিক বিস্ফোরণ ঘটতে পারে।

পিএইচআরের রিপোর্ট মতে, যখন তারা এই গণকবর পরিদর্শন করে, তখন ওখানে তাজা মাটির স্তূপ বিদ্যমান ছিল এবং যেসব ট্রাকে করে এই দুর্ভাগা কয়েদিদের এখানে আনা হয়েছিল, সেগুলোর টায়ারের চিহ্নও বিদ্যমান ছিল। নাভু টাইমসে প্রকাশিত এক রিপোর্টে পিএইচআরের ডেপুটি ডাইরেক্টরের উদ্ধৃতি দিয়ে দাবি করা হয়, মার্কিন জোট বাহিনীর একটি ছোট বাহিনী গণকবর এলাকা অবরোধ করে রেখেছিল। যখনই তারা অবরোধ খতম করল এবং তারা ওখান থেকে চলে গেল, তখন ওই সংস্থা এই গণকবর আবিষ্কার করে। রিপোর্টে বলা হয়, বিভিন্ন গোত্রীয় দলের আফগান সৈন্য ও মার্কিন সংস্থার মতে এটি ওই সময় ছিল, যখন মার্কিন বিমান আকাশ থেকে 'কিয়ামত' বর্ষণ করছিল, আর তাদের সৈন্যরা জমিনে সরগরম ছিল। আমেরিকা জানে, তারা এই কয়েদিদের সঙ্গে কী আচরণ করেছে! মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ একটি প্রতিবাদমূলক বিবৃতি প্রকাশ করে। যাতে বলা হয়, তারা পিএইচআরের এ দাবি সম্পর্কে অবহিত নয় যে মার্কিনরা তালেবান কয়েদিদের গণহত্যা পরিচালনা করেছিল। সামরিক ভাষ্যকাররা বলেন, আমরা আমাদের কর্মকাণ্ডগুলো রেকর্ড করেছি। এই অভিযোগগুলোর উদ্ধৃতিতে আমাদের কাছে কোনো রেকর্ড নেই। কিন্তু কতই চিত্তাকর্ষক কথা যে, মার্কিন সৈন্যদের যে বিষয়ের জ্ঞান নেই, জাতিসংঘ সে সম্পর্কে অবগত হওয়ার কথা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করেছে!

জাতিসংঘ তার প্রেস রিলিজে বলেছে, তাদের মানবাধিকার বিষয়ক অভিজ্ঞদের টিম উত্তর আফগানিস্তানের শহর মাজার শরিফের পশ্চিমে একটি বিশাল গণকবর সফর করেছে। জাতিসংঘের ভাষ্যকার এনানুইল ডি আলমাইড বুসলোয়া বলেন, এ লাশগুলোকে ভারী মেশিনের সাহায্যে দাফন করা হয়েছে। জাতিসংঘ এ কথা বলতে অস্বীকৃতি জানায় যে এই ভারী মেশিনারি কারা এখানে এনেছে? আইপি সংবাদের সত্যায়ন করতে গিয়ে বলেছে, এটিই ওই গণকবর, যেটি পিএইচআর আবিষ্কার করেছিল। কিন্তু এটি জানা সম্ভব হয়নি যে, এই কবরে কতজন লোক দাফন হয়েছে। তার পরও এটি স্পষ্ট, এই দুর্ভাগা মানুষগুলোকে অপ্রতিরোধ্য শক্তি দিয়ে প্রাণসংহারি যন্ত্রাদির মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছিল। জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী হেমন্তের পর এদের এখানে দাফন বা শহীদ করা হয়। আর এটি হচ্ছে আফগানিস্তানের ওপর মার্কিন বিজয়ের সময়। এক আফগান সৈন্য ডোরানকে তার বর্ণনা রেকর্ড করাতে গিয়ে বলেছে, মার্কিনরা যাচ্ছেতাই করে

বেড়াত। তাদেরকে রোখার সাহস কারো ছিল না। সানডে মিররের ভাষায়, কয়েদিদের নিয়ে আসা ট্রাক ড্রাইভার বলেছে, অনেক অনেক কয়েদি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় এবং তাদের একটি বৃহদাংশ দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে শহীদ হয়ে যায়। ফিল্মে ছয়টি সাক্ষ্য পেশ করা হয়। তার মধ্যে উত্তরাঞ্চলীয় জোটের এক জেনারেল আমির জানও শামিল ছিল। সব সাক্ষী এ কথার ওপর স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্মত হয় যে, তারা যুদ্ধাপরাধের আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনালে উপস্থিত হতে প্রস্তুত। ফিল্মে পিএইচআরের পক্ষ থেকে সন্ধানকৃত গণকবরে দাফন হওয়া সদস্য ও সেসব হত্যাকারীর সম্পর্কে পরিপূর্ণ সাক্ষীদের পেশ করা হয়। ফিল্ম এটি প্রমাণ করেছে যে, দাফনকৃত সদস্যরা হচ্ছে তালেবান ও আল-কায়েদার কয়েদি, যাদের কুন্দুজ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাদের অক্সিজেনরোধক সামুদ্রিক কন্টেইনারে করে বধ্যভূমি পর্যন্ত আনা হয় এবং মার্কিন সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে হত্যা করা হয়। ফিল্ম দেখার পর ইউরোপীয় পার্লামেন্টের জার্মান সদস্যরা বলেছে, জুলাইয়ে অনুষ্ঠিতব্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের পার্লামেন্ট অধিবেশনে এ মামলা উত্থাপন করা হবে। ইউরোপীয় পার্লামেন্টের অপর কয়েকজন সদস্য রেডক্রসের ইন্টারন্যাশনাল কমিটির কাছে দাবি করেন যে তাঁরা এই ফিল্মে ধারণকৃত সব অভিযোগের নিরপেক্ষ নিষ্পত্তি ও প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটন করুক।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনের খ্যাতিমান আইনজীবি অ্যান্ডর ইউ এম কি এন টি ফিল্মে প্রদর্শিত ঘটনাবলির ওপর মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, এটি মার্কিন ও আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে যুদ্ধাপরাধ। তিনি নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি করে বলেন, দুনিয়ার কোনো আইনই এসব সাক্ষ্য বিস্মৃত হতে পারে না। নভেম্বরে নিউ ইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত একটি রিপোর্টও এই গণকবরবাসীকে তালেবান কয়েদি হিসেবে প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট। রিপোর্টে বলা হয়, কুন্দুজ থেকে আগত তালেবান কয়েদিতে পূর্ণ কন্টেইনারগুলোকে উত্তরাঞ্চলীয় জোট কমান্ডার এবং মার্কিন মিত্র আবদুর রশিদ দোস্তাম সাহারায় নিয়ে গিয়েছিল। কারণ সে তাদেরকে মার্কিন বোমাবর্ষণের কারণে জেলে নিতে পারছিল না। অথচ এই বোমাবর্ষণ উত্তরাঞ্চলীয় জোটের গোয়েন্দাগিরিতে করা হচ্ছিল। প্রতিটি কন্টেইনারে প্রায় দুই থেকে তিনশ তালেবান কয়েদি ছিল।

কোনো কোনো পর্যবেক্ষকের ধারণা, সেসব কয়েদির মধ্যে অধিকাংশ পাকিস্তানি, আরব ও অন্যান্য বিদেশি মুজাহিদীন ছিল। জাতিসংঘের মানবাধিকার টিম কয়েকটি লাশকে গোত্রীয় দিক থেকে পশতুন বলে চিহ্নিত করেছিল। কিন্তু এ রিপোর্ট বাস্তবতার সঙ্গে সামাঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কারণ স্থানীয় তালেবান কয়েদিদের কুন্দুজে অনুষ্ঠিত চুক্তিমাফিক ঘরে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দেওয়া

হয়েছিল। জাতিসংঘের টিম মার্কিন চাপের মুখে পরিদর্শিত লাশগুলোকে পশতুন হিসেবে চিহ্নিত করেছিল।

১৯ এপ্রিল ওয়াশিংটন পোস্টে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী শাবারগান জেলে ১৫ থেকে ৩০ জন কয়েদি পৌঁছে, এ সময় জেলে বিদ্যমান কয়েদিদের সংখ্যা ছিল ২৭৭০ জন, যাদের মধ্যে আটজন পাকিস্তানি। যদি কেল্লা-ই জঙ্গিতে পাঠিয়ে দেওয়া কয়েদিদের এতে শামিল করা হয়, তাহলে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬০০ জনে। আবদুর রশীদ দোস্তামের নেতৃত্বে শাবারগান নিয়ে যাওয়া প্রায় ৪৪০০ কয়েদির ভাগ্য সম্পর্কে আন্তর্জাতিক প্রেসকে নীরব মনে হচ্ছে। ১৪ কন্টেইনারে করে নিয়ে যাওয়া এই ৪৪০০ তালেবান কয়েদিই ছিল। আর এই গণকবর সেই হাজার হাজার শহীদ মুজাহিদদের, যাদের সংখ্যা ছিল ৩৪,০০০-এর কাছাকাছি। ১৪৭ অ্যাক্টর ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট এই কবরে আফগান তালেবান, পাকিস্তানি, আরব ও অন্যান্য দেশ থেকে আগত ওইসব মুজাহিদীন দাফন হয়েছে, যারা ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখার দুঃসাহস করেছিল।

পরদেশে বে-গোর ও বে-কাফন দাফন হওয়া হে শহীদরা! তোমাদের অসহায় অবস্থায় মৃত্যুম্মুখ বংশধরদের জন্য নতুন আকাশ আলোকিত করেছ। আমরা কি বিশ্ব বিবেকের কাছে জিজ্ঞেস করার সাহস করতে পারি যে, আন্তর্জাতিক আদালত মানবতাবিরোধী এই যুদ্ধাপরাধের কথা শোনার সাহস করতে পারবে? একবিংশ শতাব্দির প্রথম ক্রুসেডের এরা প্রথম যুদ্ধবন্দি অবস্থায় শহীদ করেছে। কোনো কোনো মুসলমান বিশ্লেষক তো এটিকে ক্রুশ বীরদের হাতে মুসলমানদের গণহত্যা আখ্যা দিয়ে থাকে। কেননা, একাদশ শতাব্দির ক্রুসেডযুদ্ধের সময় ক্রুসেড-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা ও চুক্তির ধ্বজা উড়িয়ে মুসলমানদের ওপর গণহত্যা পরিচালনার বড় দুর্নাম ছিল। স্পেনে মুসলমানদের পতন ও পরিসমাপ্তি ক্রুসেডীয় বীরদের গণহত্যার জীবন্ত উদাহরণ। *দৈনিক পাকিস্তান, লাহোর।*

The Martyrs in Reality

Allah Subhanuhu Wa Ta-ala said-

"Think not of those who are killed in the Way of Allah as dead. Nay, they are alive, with their Lord, *and they have provision. They rejoice in what Allah has bestowed upon them of his Bounty, rejoicing for the sake of those who have not yet joined them, but are left behind (not yet martyred) that on them no fear shall come, nor shall they grieve.*

They rejoice in a Grace and a Bounty from Allah, and that Allah will not waste the reward of the believers. Those who answered (the Call of) Allah and the Messenger (Muhammad, Peace be upon him) after being wounded; for those of them who did good deeds and feared Allah, there is a great reward. Those (i.e. believers) unto whom the people (hypocrites) said, 'Verily, the people (pagans) have gathered against you (a great army), therefore, fear them.' But it (only) increased them in Faith, and they said: 'Allah (Alone)is Sufficient for us, and He is the Best Disposer of affairs (for us).

So they returned with Grace and Bounty from Allah. No harm touched them; and they followed the Good Pleasure of Allah. And Allah is the Owner of Great Bounty." [Quran 3:169-174]

Allah– the Mighty and Majestic– has ordained that men should die in different manners, but that their status after death would depend on their intentions. He ordained that this Religion of His be built by the efforts of men and communities, be raised by their skulls and bodies, and according to the efforts which are exercised on the Path of this *Deen*. That it be raised by pains which are borne on its Way, and by sustaining the hardships of the Path. The result of all of this, then, would be

the prosperity of the Friends of Allah . The *Deen* of Allah – the Mighty and Majestic – cannot be victorious by a miracle from the sky, rat her man must exercise his effort s and und ergo hardships.

The *Deen* of Allah will be victorious according to however much man strives, however much he sheds blood on the way, and however much his limbs fall from his side. The people will bear witness for the blood of the martyrs on the Day of Judgement – blood, the colour of which will be the colour of blood, but the smell of which will be smell of musk(On the authority of Abu Hurairah (RA), the Messenger of Allah (SAWS) said: *"No-one is wounded in the Path of Allah, and Allah knows best who is wounded in His Path, except that he will come on the Day of Resurrection with his wounds spurting blood. Its colour will be like the colour of blood and its smell will be that of musk." Reported by Al-Bukhari, Book 7, No. 441). The angels will bear witness for them at the seizing of their souls.*

It is on these people that Islam was first raised, and it will not be raised again except by that way which the Prophet (SAWS), the choicest noble Companions, and their helpers from the individuals of this *Ummah* under took. Whoever thinks that the *Deen* of Allah can be victorious by culture and teaching only, or by political information and analysis, or observing events, or only speeches on the pulpit and guidance and sermons, then these people do not know the nature of this *Deen,* nor do they know the method of the final Messenger (SAWS).

Kingdoms are not built like the mornings
Nor are truths adopted or enforced
For the killed ones are centuries of lives
And for the prisoners are ransoms and growing old
For the red freedom is a door
Which hammers in every bloodstained hand

And before the words of poetry are the words of the Lord of Might:

"Do you think that you will enter Paradise before Allah tests those of you who fought (in His Cause) and (also) tests those who are patient?" [Quran 3:142]

The best man in life, as the Prophet (SAWS) said, is he who stays up when the people are sleeping, and he who cries when the people are happy. They rise up if the people spend the night in frivolous entertainment. These are the knights of this *Ummah,* its virtuous fortifications and its solid structure, who turn to Allah Alone whenever anguishes or misfortunes increase. Thus, as was narrated in the authentic *hadeeth (*On the authority of Abu Hurairah (RA), a man came to Allah's Apostle (SAWS) and said, *"Instruct me as to such a deed as equals Jihad (in reward)."* He replied, *"I do not find such a deed."* Then he added, *"Can you, while the Muslim fighter is in the battle-field, enter your mosque to perform prayers without cease and fast and never break your fast?"* The man said, *"But who can do that?"* Abu Hurairah added, *"The Mujahid (i.e. Muslim fighter) is rewarded even for the footsteps of his horse while it wanders about (for grazing) tied in a long rope."* Reported by Al-Bukhari, Vol. 4, Book 52, No. 44.*)*, whoever protects the land of the Muslims will receive the reward of the prayer of one who constantly prays, the fasting of one who constantly fasts, and the remembrance of one who constantly remembers Allah. This is because without these guards, nobody would be able to even grow a beard, or rise at night to pray, or secure their religion, their honour, or their wealth.

"Permission to fight is given to those (i.e. believers against disbelievers) who are fighting them, (and) because they (believers) have been wronged, and surely, Allah is Able to give them (believers) victory.

Those who have been expelled from their homes unjustly only because they said, 'Our Lord is Allah.' – For had it not been that Allah checks one set of people by means of another, monasteries, churches, synagogues, and mosques, wherein the Name of Allah is mentioned much would surely have been

pulled down. Verily Allah will help those who help His (Cause). Truly, Allah is All-Strong, All-Mighty." [Quran 22:39-40]

Therefore, it is with the defence of these people, and the fighting of Muslims against the enemies of Allah, that the mosques with their minarets are protected, and that these places of worship will remain. And if you doubt this, then ask Bucharest, and Yugoslavia , and Bulgaria and Czechoslovakia and Germany and others – what has happened to their mosques? Where are their worshippers whose recitation used to resound in the mosques like the buzzing of bees? Where are their Qurans and their scholars?

Allah, the Mighty and Majestic, chose people to partake in the Jihad. If their intention was pure and they were firm on the Path, they would be of those whom Allah has chosen to carry the message to reach the World.

They prepared you for a decree, if you understood it

For you are deemed far above being left to graze with cattle

As I mentioned previously, the Prophet of Allah (SAWS) described that the best life of man is the horseman who takes the reins of his horse and rushes to the thick of the battlefield: *"Of the men who lives the best life is he who holds the reins of his horse (ever ready to march) in the Way of Allah. He flies on its back whenever he hears a fearful shriek or a call for help, he flies to it seeking death at places where it can be expected."(Reported by Muslim, No. 4655)*

Allah decreed for me to undertake the journey of the *Ansar (Ansar:* literally 'helpers', used in reference to Foreign Mujahideen) who came to Afghanistan to assist this blessed Jihad: this Jihad, through which Allah rescued the Islamic *Ummah* and shook it out of its coma. He also blessed me with the acquaintance of the individuals of this *Ummah* who came to present their souls, hoping for the favour of Allah and asking for the Paradise. I call these people *Ushaaq-ulHoor (Hoor:* Virgins or maidens of Paradise) (Lovers of the Paradise Maidens). I witnessed the battles of the Lovers, the battles of

the Lovers of the *Hoor*. I found through my observations that our Lord chooses those who we think of as the best in this life, for Martyrdom. I also saw that the martyrs had common characteristics, the main ones of which are: little speech but plenty of action, thinking well of the Muslims, and racing to serve them. You will see that the martyr's actions teach more than his words. This is as Umar (may Allah be pleased with him) said to the

Companions, while he was saying that Allah entrusted him with them, and that he is not the best of them: *"I am not your teacher except by actions, so I will leave my actions to teach you more than my words."*

The Fine Examples

People are moved by living examples which reside amongst them: fine examples whose hearts are attached to the Highest Place, but their bodies live between the people, eating like the people eat and drinking like the people drink. They are unique amongst the masses by their attachment to Allah and their love of meeting their Lord. And whoever loves to meet his Lord, his Lord loves to meet him [(On the authority of Ubadah bin As-Samit (RA), the Messenger of All ah (SAWS) said: *"Whoever loves to meet Allah, Allah (too) loves to meet him and whoever hates* to meet Allah, Allah (too) hates to meet him." Aisha, or some of the wives of the Prophet said, "But we dislike death." He said: "It is not like this, but it is meant that when the time of the death *of a believer approaches, he receives the good news of Allah's Pleasure with him and His blessings upon him, and so at that time nothing is dearer to him than what is in front of him. He therefore loves the meeting with Allah, and Allah (too) loves the meeting with him. But when the time of the death of a disbeliever approaches, he receives the evil news of Allah's*

Torment and His Requital, whereupon nothing is more hateful to him than what is before him. Therefore, he hates the meeting with Allah, and Allah too, hates the meeting with him. ["Reported by Al- Bukhari, Book 8, No. 514].

Death began to choose the cream of the crop from amongst us. The events became so difficult upon us that it came to a point that whenever I bade fare well to one of the martyrs, it was as if I was bidding farewell to a piece of my heart , or parting with one of my children. And with every one of them who was killed, I was be littled in front of these giants, and I felt that I was less than them, for why had Allah not chosen me just as He chose them? But Martyrdom is a choice and a selection, and is not on par with the station s in this life, nor is it on par with the paper certificates which societies are now raise d on. Whenever I remembered those who preceded me on the Path, for example, Sad Ar-Rasheed, Abdul- Wahab Al-Ghamidi, Abu Duja nah Al -Misri, Abdul -Jab bar, I realised that in those times Martyrdom did not suddenly come like the gleaming of an active sword, but for some reason, in this year, the amount of examples whose souls Allah bought, increased.

"And so that He may take martyrs from amongst you." [Quran 3:140]

Many men were taken this year. I do not know many of their names, and I only came to know them after they were taken to the eternal and beautiful Abode, with the Permission of the Lord of the Worlds. As Sad bin Abi Waqqas (may Allah be pleased with him) wrote after the Battle of Al-Qadisiyyah to Umar (may Allah be pleased with him), *"O Amirul- Mumineen, Sad bin Ubaid Al-Qari was martyred, as was so-and-so... We do not know many of them, but Allah Alone knows them. If the night darkened around them, they produced a sound like the sound of bees, whilst they were reciting the Quran. But if*

they appeared in the field of battle, they were like lions, nay they were braver than lions."

Those who emigrated in the Way of All ah are those who would achieve Martyrdom if their intentions were pure, as the Prophet (SAWS) said in the authentic *Hadeeth:* Abu Malik Al-Ashar i heard the Messenger of Allah (SAWS) say, *"He who goes forth in Allah 's Path and dies or is killed, is a martyr, or has his neck broken through being thrown by his horse or by his camel, or is stung by a poisonous creature, or dies on his bed by any kind of death Allah wishes, is a martyr and will go to Paradise."[Reported by Abu Dawud, Book 14, No. 2493, Al-Haakim. Declared Saheeh by Al-Albani.]*

This *hadeeth* is *Saheeh,* and there are many transmissions to this effect.

Whoever emigrated to assist this Jihad or emigrated with his faith to assist the *Deen,* to any countr/ in the World, whoever left his family and Worldly comforts for the sake of Allah's *Deen,* and came to a life of hardships and difficulties and tribulations, he is considered an emigrator in the Way of Allah. And whoever emigrates in His Way is a martyr no matter how he dies, and for him is the Paradise. In this last month Allah – the Mighty and Majestic – chose as martyrs men whom I knew and lived with: Abdullah An- Nuhami, Abu Muslim As-Sana'ani, Ali Abdul-Fattah, Awad Al-Arada and others. But He also chose three men whom I used to secretly think of as the best of people: Dr Salih Al-Libi, Ahmad Al-Mubarak As-Somali, and Sheikh Tameem Al-Adnani – may Allah have Mercy on them. As for two of them, Allah chose them on the battlefield, these being Dr. Salih and Ahmad Al-Mubarak As-Somali. Whilst observing them externally, I used to feel that what was inside their souls was purer than what was outside, and that what they hid was more superior than they made known.

Dr. Salih was the first doctor who came to Afghanistan before the Arabs had a central base. He left his studies in London and entered Ghazni, where he stayed with the Mujahideen for eight months, eating as they ate and drinking as they drank, despite the vast difference between a luxurious, fine life in London and a life of hardships and trials, which most of the Mujahideen used to, and still do, live. Dr. Salih continued to return to Afghanistan from London, so he became known to us. A brother from Mazar-i-Shareef came to us because he had seen a crew of nine Christian, French medical staff opening up a hospital in Balkh. Balkh was once the land of Scholars and Litterateurs, but they were expelled from the area. Dr. Salih reproached the inhabitants there, saying, *"How can you accept these French amongst you?"*

The answer was immediately silencing, *"We are only beginning to see the Arabs now. The French came four years before you. They live amongst us like we live, with biting hunger. They endure it as we endure it. In fact, they burden themselves with more severities and hardships and do not accept any of our own medicine. They bring us present s and sweets to our houses, where they sit on the bare floor just as we sit. And you want us to not like them after they have done all of this for us?"* Then they added, *"Bring us a single Arab doctor and we will dispense of these people."*

Therefore, brother Abdullah came to us from Mazar-i-Shareef and said, *"We need only one Arab doctor to expel the French team from there."* We chose Dr. Salih as this doctor. Before he reached Mazar-i-Shareef, three Arabs arrived there. This was the first event of its kind in Mazar -i- Shareef. When the Arab s arrived, it was as if a miracle had happened which shook the whole area! All the people of Mazar left their homes in excitement and walked for days in the snow to meet these people. Even a very old man, carrying a stick which he leant on in his

right hand, and his grandson in his left hand, went to meet them. He wanted to show the Arabs to his grandson, because he himself was never before blessed with seeing an Arab. So as soon as Dr Salih arrived in Mazar -i-Shareef, the front-line Commander there, Abdullah, who was in charge of over 1000 Mujahideen, issued a *fatwa* saying that it was no longer permissible for a Muslim to sit with the French, speak to them or be treated by them, for now the Arabs had arrived. Thus, all of a sudden, the land shunned the French and it became a different land. Before, the French had been welcomed with the hearts of the Afghans, but now they were discarded and distanced like the distanced camels. They began to sense the tension so they said to the locals, *"Are we right in thinking you no longer want us?"* The reply they received was, *"Yes, you are right, we do not want you."* Therefore, the French decided to leave and take their hospital equipment with them. The Afghans were indifferent to their departure.

Before Dr Salih came to the area, there was a particular young man who had been hit by shrapnel in his spinal cord, thus paralysing half of his body and rendering him unable to move even from his bed. He was presented to these French doctors, and when they saw him they said - and Allah is far Exalted above what they say–*'Even if the Lord of Power came, He would not be able to cure him.'*

From the speeches of Dr. Abdullah Azzam (Rah.) ...

** 'Blood is more valuable than tears.'*

** 'Islamic history is not written except with the blood of the martyrs.'*

** 'I feel that I am nine years old: seven-and-a-half years in the Afghan Jihad,*

one-and-a-half years in the Jihad in Palestine, and the rest of the years have

no value.'

**'Never shall I leave the Land of Jihad, except in three cases. Either I shall*

be killed in Afghanistan . Either I shall be killed in Peshawar. Or either I

shall be handcuffed and expelled from Pakistan.'

**'Jihad and the rifle alone. NO negotiations, NO conferences and NO*

Dialogue.'

শহীদ ড. আবদুল্লাহ আয্যাম রহ.-এর রক্তাক্ষরে লিখিত ঐতিহাসিক অসিয়তনামা

ভূমিকা: শহীদ ড. আবদুল্লাহ আয্যাম রহ.। বিপ্লবী অনুপ্রেরণার আধার, সফল বিপ্লবের মূর্তপ্রতীক, জিহাদি জজবায় প্রজ্বলিত এক অগ্নিমশাল। এক অমর ইতিহাসের নাম আবদুল্লাহ আয্যাম। তাঁর জন্ম ফিলিস্তিনে। উচ্চশিক্ষা লাভ করেন মিসরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে।

সোভিয়েত রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের দীর্ঘ মুক্তিসংগ্রাম, অস্বাভাবিক খোদায়ী মদদ এবং সবশেষে বিজয় অর্জন– অত্র শতাব্দির ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়। এ জিহাদ ও মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের বহু নওজোয়ান মর্দে মুজাহিদ। তবে আফগান জিহাদে আরব নওজোয়ানদের আত্মত্যাগ ও কোরবানি বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় ফেলে আসা সেই পেছনের ইতিহাসের কথা। আরব মুজাহিদদের এই অসামান্য কৃতিত্বের অন্যতম হকদার এই আবদুল্লাহ আয্যাম। অবশেষে আফগান জিহাদের তিনি আর কেবল আরব মুজাহিদদের নেতা রইলেন না, নিজ যোগ্যতায় তিনি প্রতিষ্ঠিত হলেন সমগ্র আফগান জিহাদের অবিসংবাদিত নেতারূপে।

তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতা, অসাধারণ বাগ্মিতা, সৃষ্টিধর্মী লেখা তাঁকে সমাসীন করে আরো এক ধাপ ওপরের আসনে। এবার তিনি পরিচিত হন আফগান জিহাদের প্রাণপুরুষরূপে। আফগান জিহাদের ওপর তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতার ৪৪টি ভিডিও ক্যাসেট ও ৩০০টি অডিও ক্যাসেট পৌঁছে দেওয়া হয় আরবি ভাষাভাষীদের ঘরে ঘরে। তাঁর বক্তৃতা শুনে অসংখ্য নওজোয়ান ছুটে আসে আফগান জিহাদের পবিত্র রণাঙ্গনে। তিনি তাঁর দাওয়াতি মিশন নিয়ে উল্কার মতো ছুটে বেড়ান এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকার বহু দেশে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এতে প্রমাদ গোনে। এবার তাঁকে দুনিয়া থেকে বিদায় করিয়ে দিতে তৈরি করা হয় ষড়যন্ত্রের ফাঁদ। সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তি এ মহান মুজাহিদকে শহীদ করেই তবে ক্ষান্ত হয়।

শহীদ আয্যাম আজ বেঁচে নেই, কিন্তু তাঁর মিশন থেমে নেই। তাঁরই প্রেরণা ও চেষ্টার ফসল হিসেবে এখন দেশে দেশে গড়ে উঠেছে জিহাদি সংগঠন। তাঁর

বক্তৃতার ক্যাসেটগুলো বই আকারে বেরিয়েছে। এ ছাড়া তাঁর নিজ হাতে লিখিত সাতটি মূল্যবান বই মুদ্রিত হয়েছে।

এই বিশ্ববিখ্যাত মুজাহিদ নেতা ১৯৮৬ সালের ২০ এপ্রিল সোমবার বাদ আসর খ্যাতনামা আফগান মুজাহিদ কমান্ডার মাওলানা জালালুদ্দিন হাক্কানির বাড়িতে বসে লিখেছিলেন তাঁর এই অমর অসিয়তনামা। নিচে তাঁর সেই অসিয়তনামার সরল বঙ্গানুবাদ উপস্থাপিত হল।

আমার হৃদয়ানুভূতি ও সমগ্র জীবনজুড়ে রয়েছে জিহাদ, পবিত্র জিহাদ

আমার মন ও সমগ্র জীবনজুড়ে রয়েছে জিহাদ, জিহাদ প্রেমের আধিপত্য। এই কারণ সুরা তওবা, যা জিহাদের সর্বশেষ চূড়ান্ত বিধান, যা পাঠ করে আমার হৃদয়ে সৃষ্টি হয় রক্তক্ষরণ, অনুভূত হয় অশেষ বেদনা ও আফসোস। কারণ তখন আমার সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে 'কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ'র ব্যাপারে আমার ও উম্মাহর অমার্জনীয় উদাসীনতা।

'কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ' সম্পর্কিত আয়াতসমূহের বিকৃত ব্যাখ্যা অথবা তার অকাট্য বিধানাবলি থেকে অন্যত্র দৃষ্টি সরানোর দুঃসাহস যারা প্রদর্শন করে, তাদের দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছে সুরা তাওবার 'আয়াতুস সাইফ', যে আয়াতে আল্লাহ সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন–

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ○

> আর মুশরিকদের সঙ্গে তোমরা যুদ্ধ করো সমবেতভাবে, যেমন তারাও যুদ্ধ করেছে তোমাদের সঙ্গে সমবেতভাবে। আর মনে রেখো, আল্লাহ মুত্তাকিদের সঙ্গে রয়েছেন। *[তাওবা ৯:৩৬]*

এই সেই আয়াত, যা দ্বারা আগে অবতীর্ণ জিহাদ বিষয়ক বাইশ বা ততোধিক আয়াত রহিত হয়েছে এবং রুদ্ধ হয়েছে কিতাল নিয়ে ভিন্ন ব্যাখ্যার সমূহ-অবকাশ। পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে–

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ
وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا

الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ○

> অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দি করো এবং অবরোধ করো। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁত পেতে থাকো। কিন্তু যদি তারা তাওবা করে, নামাজ কায়েম করে এবং জাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *[তাওবা ৯:৫]*

আল্লাহর পথে জিহাদে বের না হয়ে অজুহাত দেখিয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করা আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া কিছুই নয়; বরং তা আল্লাহর দীনের সঙ্গে বিদ্রূপ করার শামিল। এ জাতীয় কর্মকাণ্ডে যারা লিপ্ত, তাদের থেকে দূরে থাকাই কুরআনের নির্দেশ। আল্লাহ তায়ালা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন–

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

> তাদের পরিত্যাগ করো, যারা নিজেদের ধর্মকে ক্রীড়া ও কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদের ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। *[আনআম ৬:৭০]*

আমাদের মর্যাদার সুউচ্চ স্থানে আসীন হওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা অপরিহার্য। নিরেট আশা-আকাঙ্ক্ষা দ্বারা কখনো মর্যাদা অর্জিত হয়নি এবং হবেও না। মর্যাদাশীল আত্মার অধিকারী হতে হলে আরামপ্রিয়তা ও বিলাসিতা ত্যাগ করতে হবে অবশ্যই।

মনে রাখা উচিত, সবচেয়ে বেশি মর্যাদাশীল ইবাদত হচ্ছে জিহাদ। অন্য কোনো ইবাদত এর সমান মর্যাদার নয়। এমনকি মসজিদুল হারাম নির্মাণ ও তথায় নিয়মিত অবস্থানেও জিহাদের সমপরিমাণ পুণ্যের আশা করা যায় না।

মুসলিম শরিফে বর্ণিত হয়েছে: একদিন সাহাবিদের মধ্যে বাদনুবাদ শুরু হয়। একজন বললেন, ইসলাম ও ঈমানের পর আমার দৃষ্টিতে হাজিদের পানি সরবরাহের মতো আর মর্যাদাসম্পন্ন আমল নেই। অপরজন মসজিদুল হারাম নির্মাণকে সর্বোচ্চ মর্যাদাবান আমল বলে দাবি করেন। তাঁর উক্তি খণ্ডন করে তৃতীয়জন বললেন, আমার দৃষ্টিতে আল্লাহর রাহে জিহাদই বড় আমল। অতঃপর সাহাবিদের এই ভিন্ন ভিন্ন মতামত অবসানের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয় এই আয়াত–

أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ○ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ○ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ

তোমরা কি হাজিদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল হারাম আবাদকরণকে সেই লোকের সমান মনে করো, যে ঈমান রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি এবং যুদ্ধ করে আল্লাহ রাহে, এরা আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান নয়। আর আল্লাহ জালেম লোকদের হেদায়েত করেন না। যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করেছে, তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে, আর তারাই সফলকাম। তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন স্বয়ং তাঁদের পরওয়ারদিগার দয়া, সন্তোষ ও জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী শান্তি। *[তাওবা ৯:১৯-২১]*

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের নির্বিচারে জবাই করা হচ্ছে আর আমরা দূর থেকে 'লা হাওলা' এবং 'ইন্নালিল্লাহ' পাঠ করেই আপন দায়িত্ব পালন করছি বলে আত্মতৃপ্ত হচ্ছি। জুলুম প্রতিরোধে এক পা-ও এগোতে আমরা প্রস্তুত নই। এটি আল্লাহর বিধানের সঙ্গে বিদ্রূপ ছাড়া আর কী? এ আত্মপ্রবঞ্চনা আমাদের ঈমানি দায়িত্ব পালন থেকে যুগ যুগ ধরে গাফেল করে রেখেছে।

কবির ভাষায়: পাপিষ্ঠ শত্রুর কবলে মুসলিম নারীর আর্তচিৎকারে ধরণী প্রকম্পিত আর মুসলমান নিদ্রার কোলে শায়িত। এটি কী করে সম্ভব, আশ্চর্য!

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া বলেন, 'ঈমানের পরে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব দায়িত্ব হচ্ছে আক্রমণকারী শত্রুকে প্রতিরোধ করা, যার হাতে আমাদের ইহকালীন ও পরকালীন স্বার্থ বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ইবনে তাইমিয়ার এ বক্তব্য আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। আমি আমার 'আদদিফা আন আরাদিল মুসলিমীন' গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এ প্রসঙ্গে আমার অভিমত হচ্ছে–

- সালাত, জাকাত ও সিয়াম পরিত্যাগকারী ও কিতাল পরিত্যাগকারীর মধ্যে পার্থক্য নেই।

- জিহাদ থেকে বিরত থাকার অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য; তালিম, তারবিয়াত, দাওয়াত ও গ্রন্থ রচনাসহ কোনো কাজই জিহাদের দায়িত্ব পালন থেকে অব্যাহতি দেয় না।
- দুনিয়ার প্রায় সব মুসলিম আজ জিহাদ পরিত্যাগের অভিযোগে অভিযুক্ত, তারা বন্দুক বহন না করার অপরাধে অপরাধী। নিতান্ত অক্ষম লোক ছাড়া যারাই আজ বন্দুক ছাড়া আল্লাহর সান্নিধ্যে যাবে, তারা পাপী হিসেবেই আল্লাহর সম্মুখে নীত হবে। কারণ এরা কিতাল করেনি। কিতাল এখন ফরজে আইন। রোগাক্রান্ত ও অক্ষম ব্যক্তিরা ব্যতীত সব মুসলিম এ ফরজ আদায়ে বাধ্য।
- আমার বিশ্বাস, আল্লাহর কাছে জিহাদ হতে অব্যাহতি পাবে শুধু চার প্রকারের মানুষ ১. অন্ধ ২. বিকলাঙ্গ ৩. অসুস্থ এবং ৪. যারা ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ। এরা ছড়া বাকি সব মুসলমানকে জিহাদ ত্যাগের কারণে আল্লাহর কাছে জবাবদিহির সম্মুখীন হতে হবে। চাই এ জিহাদ আফগানিস্তানে বা ফিলিস্তিনে (বা আরাকানে) হোক, অথবা পৃথিবীর যেকোনো ভূমিতে হোক, যা কাফের দ্বারা অপবিত্র হচ্ছে।
- আমি মনে করি, জিহাদে যোগদান করতে আজ পিতা, স্ত্রী কিংবা কর্জদাতার অনুমতির প্রয়োজন নেই। এমনিভাবে কোনো উস্তাদ বা নেতার সম্মতি নেওয়াও ওয়াজিব নয়। অতীত ইতিহাসের প্রতিটি ক্রান্তিলগ্নে উপরিউক্ত বিষয়ে উলামায়ে উম্মতের ইজমা বা ঐকমত্য রয়েছে। আজ যদি এ বিষয়ে কেউ ভুল বোঝানোর অপচেষ্টায় মেতে ওঠে, তবে তা হবে জুলুম এবং তা হবে আল্লাহর নির্দেশিত পথ ছেড়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং একে গুরুত্বহীন মনে করা কিংবা ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির কোনো সুযোগ এখানে নেই।
- আফগানিস্তানে নির্যাতিত প্রতিটি মুসলিমের রক্ত ও লাঞ্ছিতা নারীর ইজ্জত লুণ্ঠনের জন্য আমরাই দায়ী। শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমরা তাদের সাহায্যে অগ্রসর হইনি। আমাদের উচিত ছিল, তাদের জন্য অস্ত্র, অন্ন ও চিকিৎসা সামগ্রী প্রেরণ করা এবং যাবতীয় যুদ্ধোপকরণ সববরাহ করা।

দাসুকি-শরহুল কাবিরের টীকায় লিখিত হয়েছে, 'যদি কারো কাছে অতিরিক্ত খাদ্য থাকে এবং কোনো অভুক্ত ব্যক্তিকে দেখা সত্ত্বেও সে তাকে খেতে না দেয় এবং সে যদি অনাহারে মৃত্যুবরণ করে তবে ওই ব্যক্তি শাস্তির যোগ্য হবে। যদি খাদ্যের মালিক এ কথা মনে করে অনাহারি ব্যক্তিকে খাদ্য না দিয়ে থাকে যে

আমি আমার এ খাদ্য না দিলে সে ক্ষুধার যন্ত্রণায় মৃত্যুবরণ করবে না। অতঃপর যদি অনাহারি ব্যক্তি এ কারণেই মৃত্যুবরণ করে, তবে কি তার কোনো শাস্তি হবে? এ প্রসঙ্গে আলেমরা দুটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন: ১. ওই ব্যক্তি তার সম্পদ থেকে মৃত ব্যক্তির দিয়াত আদায়ে বাধ্য থাকবে। ২. আর কারো মতে, ওই ব্যক্তির শাস্তি 'কিসাস', তাকে হত্যা করা হবে। কারণ সে খাদ্য না দেওয়ার কারণে লোকটি ক্ষুধার যন্ত্রণায় মৃত্যুবরণ করেছে। হায়, পরকালে কী পরিণাম অপেক্ষা করছে সম্পদশালী ও বিত্তবানদের জন্য, যারা নিজেদের মনোবৃত্তির জন্য অর্থের অপচয় করছে অথচ অনাহারি মুসলমানদের জন্য তারা সামান্য অনুদান দিতেও কুণ্ঠিত।

ও হে মুসলমান, তোমাদের জীবন মানেই জিহাদ, তোমাদের সম্মান মানেই জিহাদ। জিহাদের সঙ্গেই জড়িত তোমাদের অস্তিত্ব।

হে দাওয়াত কর্মীগণ, তোমাদের অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে এবং কাফের, অত্যাচারী ও তাগুতের জনপদ বিরান করে দিতে হবে। নতুবা এ আকাশের ছায়ায় তোমাদের কানাকড়ি মূল্যও থাকবে না।

যাদের ধারণা কিতাল, জিহাদ ও রক্ত দেওয়া ছাড়াই দীন প্রতিষ্ঠিত হবে, তারা বোকার স্বর্গে বাস করে। দীনের মর্ম ও প্রকৃতি সম্পর্কে তারা অবগত নয়। কিতাল ব্যতীত দাওয়াত কর্মীর প্রতাপ, দাওয়াতের প্রভাব ও মুসলমানের গৌরব অক্ষুণ্ন থাকতে পারে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "আল্লাহ শত্রুর হৃদয় থেকে তোমাদের প্রভাব দূরীভূত করে দেবেন। আর তোমাদের হৃদয়ে প্রবিষ্ঠ করিয়ে দেবেন 'ওয়াহান'। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, 'ওয়াহান' কী? তিনি বললেন, দুনিয়াপ্রীতি ও মৃত্যু-ঘৃণা।" অন্য বর্ণনামতে, ওয়াহান মানে কিতালের প্রতি অনীহা ও ঘৃণা পোষণ করা। কুরআনের ঘোষণা–

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ
يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ○

হে রাসুল, আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ের জিম্মাদার নন। আর আপনি মুমিনদের উৎসাহিত করতে থাকুন, শিগগিরই আল্লাহ কাফিরের শক্তি-সমর্থ খর্ব করে দেবেন। আর আল্লাহ শক্তি সামর্থ্যের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর ও কঠিন শাস্তিদাতা। *[নিসা ৫:৮৪]*

কিতালের অনুপস্থিতিতে শিরক ও ফিতনার সয়লাব বয়ে যাবে এবং প্রতিষ্ঠিত হবে শিরকের বিজয় পতাকা। এ জন্যই আল্লাহ বলেছেন–

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ

> আর তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফিতনা দূর হয়ে যায় এবং আল্লাহর সব হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। *[আনফাল ৮:৩৯]*

জিহাদই পৃথিবীর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার একমাত্র গ্যারান্টি। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ

> আল্লাহ যদি একে অন্যের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেত। *[বাকারা ২:২৫১ আয়াতাংশ]*

জিহাদই ইবাদতখানা ও পবিত্র স্থানসমূহের সম্মান নিশ্চিত করতে পারে এবং এর অবমাননা রোধ করতে পারে। আল্লাহ ইরশাদ করেছেন–

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ
وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

> আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রিস্টানদের) নির্জন গির্জা, ইবাদতখানা, (ইহুদিদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলোয় আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। *[হজ ২২:৪০]*

অতএব, হে মুসলিম, মসজিদসমূহের পবিত্রতা ও আপন অস্তিত্বের স্বার্থেই তোমাদের জিহাদ করতে হবে।

হে ইসলামের মহান দায়ী! মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষী হও, পাবে তুমি অমর জীবন, আশা ও বিলাস প্রতারণার শিকার হয়ো না, আর আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারক শয়তানের প্রবঞ্চনা হতে বেঁচে থাক। নফল ইবাদত ও কিতাব অধ্যয়ন যেন কিতাল সম্পর্কে তোমাকে ধোঁকায় না ফেলে। সাবধান! বিলাসিতা যেন তোমাকে এ মহান দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত করতে না পারে। আল্লাহ বলেছেন–

وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ

আর তোমরা কামনা করছিলে তা, যাতে কোনো রকম কন্টক নেই। *[আনফাল ৮ : ৭]*

জিহাদের ব্যাপারে কারো অন্যায়-অনুসরণ করো না। জিহাদের সার্বজনীন আহ্বানে সাড়া দিতে নেতার অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হয় না। নিশ্চয়ই জিহাদ দাওয়াতি মিশনের স্তম্ভ, তোমার ধর্মের মজবুত আশ্রয় কেন্দ্র ও তোমার শরীয়তের অতন্দ্র প্রহরী।

উলামায়ে ইসলামকে বলছি–

আপন প্রভুর পানে ফিরে আসতে চায় এ প্রজন্ম। এদের নেতৃত্বদানে এগিয়ে আসুন। দুনিয়ার আসক্তি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখুন। সাবধান! তাগুত ও খোদাদ্রোহী শক্তির পৃষ্ঠপোষকতা করবেন না। তাহলে আপনার হৃদয়লোক ছেঁয়ে যাবে অমানিশায়, আপনার আত্মার ঘটবে অপমৃত্যু এবং জনগণ ও আপনার মাঝে সৃষ্টি হবে বিচ্ছিন্নতার বিশাল প্রাচীর।

হে মুসলমান, অলসনিদ্রায় কেটেছে তোমাদের বহু যুগ। তোমাদের জন্মভূমিতে আজ পাপিষ্ঠদের পদচারণা, তারা আবৃত্তি করছে বিজয়ের গান।

কবি কত সুন্দর উক্তি করেছেন–

> গ্লানির নিদ্রা অতি দীর্ঘ হয়ে গেছে, কিন্তু কোথায় বাঘের হুংকার? খোদাদ্রোহী গোষ্ঠী গাইছে বিজয়ের সংগীত আর আমরা করছি দাসত্ব। হায়, কবে ভাঙব বন্দিশালা, কবে পাব মুক্তির রাজপথ!

আমি শুনতে পাই, মানবতার কারাগারে বন্দি নির্যাতিত মুসলিম উম্মাহ কবির সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলছে, মুক্তি চাই, মুক্তি চাই।

হে মহীয়সী নারীসমাজ! তোমরা বিলাসপ্রিয় হবে না, যা একান্ত প্রয়োজন তাই করো। অল্পে তুষ্ট থাকো। তোমার সন্তানকে নির্ভীক, দুর্জয়, সাহসী মুজাহিদরূপে গড়ে তোলো। তোমার ঘর যেন হয় সিংহ-শাবকের লালনভূমি। তাকে ভীরু মুরগির চারণ ক্ষেত্রে পরিণত করবে না, যারা তাজা ও পুষ্ট হয় অন্য জীবের উদরপূর্তির জন্য। তোমার সন্তানের মাঝে সৃষ্টি করো জিহাদপ্রেম, তারুণ্যের তেজ ও দিগ্বিজয়ের দূরন্ত নেশা। মুসলমানের সমস্যা সম্পর্কে সজাগ থাকো, তোমার জীবনে সপ্তাহের একটি দিন অন্তত এমনভাবে কাটাও, যা মুহাজিরীন ও মুজাহিদীনের জীবনাচারের পরিচয় বহন করে। তাদের মতো শুকনো রুটি ও সামান্য তরকারি তুমি আহার করো। এভাবে ঘরে বসেও তুমি লালন করতে পারো জিহাদি চিন্তা, বিজয়ীর চেতনা।

ওহে শিশু-কিশোরের দল! তোমরাই আগামী দিনের তরুণ যুবক, মিল্লাতের

আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, আজ থেকে সামরিক প্রশিক্ষণ নাও। রপ্ত করো যাবতীয় সমর-কৌশল। ট্যাংক ও অস্ত্রই হোক তোমার খেলনা। বিলাসবহুল জীবন নয়, তোমার প্রয়োজন কষ্টসহিষ্ণু মুক্ত বিহঙ্গের জীবন। এড়িয়ে চলো ফুলশয্যা, বরণ করো কন্টকপূর্ণ গৃহাঙ্গন। সংগীতের সুরের চেয়ে তরবারির ঝংকার হোক তোমার প্রিয় বিষয়। তবেই ছুড়তে পারবে শত্রুর প্রতি চ্যালেঞ্জ। একদিন তোমার দ্বারা সূচিত হবে মুসলিম মিল্লাতের ঐতিহাসিক বিজয়।

সুপ্রিয়া, *হে আমার সহধর্মিণী!*

১৯৬৯-এর সে কষ্টকর সময়ের কথা আমার আজও মনে পড়ে। আমাদের ঘরে ছিল দুই কিশোর ও এক শিশুসন্তান, কাঁচা ইটের তৈরি ছিল আমাদের আবাসঘর। ছিল না কোনো আলাদা রান্নাঘর। তোমার ওপরই ন্যস্ত করেছিলাম পুরো সংসার। একদিন সন্তানরা বড় হলো, আমাদের পরিচিতিও বৃদ্ধি পেল, অতিথিতে সরগরম হয়ে উঠল আমাদের ঘর। আর তুমি ছিলে তখন সন্তান-সম্ভবা। তোমার কষ্ট ও পরিশ্রমের অন্ত ছিল না। কিন্তু সব কিছুই তুমি হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছিলে। তোমার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি, লক্ষ্য ছিল আমার সহায়তা করা। আল্লাহ তোমাকে সর্বোত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন। সত্যিই আল্লাহর দয়া ও তোমার ধৈর্য না হলে আমার একার পক্ষে এ বিরাট বোঝা ওঠানো সম্ভব ছিল না ।

হে প্রিয় আমার,

এ জীবনে তোমাকে দেখেছি দুনিয়াবিমুখ, পার্থিব বস্তুর প্রতি ছিল না তোমার কোনো অনুরাগ, দারিদ্র্যের ব্যাপারে ছিল না তোমার কোনো অভিযোগ। আর সচ্ছল সময়েও দেখিনি তোমাকে বিলাসিতায় ডুবে থাকতে। দুনিয়াকে সব সময় তুমি রেখেছিলে হাতের মুঠোয়, হৃদয়ে ছিল না দুনিয়ার কোনো স্থান।

মনে রাখবে, জিহাদি জীবনই আনন্দ ও সুখের জীবন। জীবনকে বিলাসিতার গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসিয়ে দেওয়ায় কোনো সুখ নেই। কষ্ট-ক্লেশে ধৈর্য ধারণ করা মহত্ত্বের পরিচয়। তাই দুনিয়ার মোহ বর্জন করো, আল্লাহর ভালোবাসা পাবে। মানুষের সম্পদ দেখে লোভ করো না, তারা তোমায় ভালোবাসবে।

আল-কুরআন মানবজীবনের সেরা সঙ্গী ও সর্বশ্রেষ্ঠ পাথেয়। রাতের নামাজ, নফল রোজা ও গভীর রজনীর ইস্তিগফার অন্তরলোকে আনে স্বচ্ছতা, সৃষ্টি করে ইবাদতের অনুরাগ এবং পুণ্যবানদের সৎসঙ্গ, স্বল্প সম্পদ, দুনিয়াদারদের থেকে দূরে থাকা এবং ভণিতা থেকে বিরত থাকলে হৃদয়ে প্রশান্তি অনুভূত হয়।

হে প্রিয়া,

আল্লাহর কাছে একান্ত কামনা, জান্নাতুল ফিরদাউসে পুনঃ আমাদের মিলন হোক, যেমনিভাবে দুনিয়াতে মিলিত হয়েছিলাম আমরা দুটি প্রাণ!

> *হে আমার কলিজার টুকরা সন্তানসন্ততি!*
>
> *মন ভরে কোনো দিন তোমাদের সঙ্গ দিতে পারিনি। আমার শিক্ষা ও তারবিয়াত তোমাদের ভাগ্যে কমই জুটেছে। অধিকাংশ সময় আমি তোমাদের থেকে বহু দূরে থেকেছি, কিন্তু আমি ছিলাম নিরুপায়। তোমরা জান, মুসলমানদের ওপর বিপদের কালো মেঘ ছেয়ে আছে, যার গর্জনে দুগ্ধদানকারী মায়ের কোল থেকে তার দুগ্ধপোষ্য শিশু ভয়ে ছিটকে পড়ে যাচ্ছে। উম্মতের সংকটের এই ব্যাপকতা চিন্তা করলে কিশোর ললাটেও ভেসে উঠছে বার্ধক্যের বলীরেখা। মুরগির মতো তোমাদের নিয়ে আমি খাঁচায় বাস করিনি। মুসলমানদের অন্তর বেদনায় জ্বলবে, আর আমি আরামে বিশ্রাম নেব, সংসারসুখ উপভোগ করব? দুর্দশায় মুসলমানদের হৃদয় বিদীর্ণ হবে, নির্যাতনে জ্ঞান বিলুপ্ত হবে, আর আমি ঘরে বসে থাকব? তা আমার পছন্দ নয়। কোনো দিন আমি কামনা করিনি বিলাসী জীবন, সুস্বাদু ভুনা গোশত এবং স্ত্রী সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে সংসার-সুখ উপভোগ।*

তোমাদের প্রতি আমার অসিয়াত–

(ক) আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা আঁকড়ে থাকবে।

(খ) নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করবে ও কুরআন হিফজ্ করার চেষ্টা করবে।

(গ) জিহবার হিফাজত করবে, সংযত কথা থাকবে।

(ঘ) নিয়মিত সালাত ও সিয়াম পালনসহ সৎসঙ্গ গ্রহণ করবে।

(ঙ) জিহাদি আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকবে। মনে রাখবে, কোনো নেতার অধিকার নেই তোমাকে জিহাদ থেকে বিরত রাখার অথবা দাওয়াত ও ইরশাদের সঙ্গে জড়িত রেখে তোমাকে ভীরু কাপুরুষ ও জিহাদবিমুখ করার। জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর ব্যাপারে কারো অনুমতির অপেক্ষা করবে না। হাতে অস্ত্র তুলে

নাও। ঘোড়সওয়ার হও। তবে ঘোড়সওয়ারির চেয়ে তীরন্দাজি আমার অধিক প্রিয়।

(চ) শরিয়তের উপকারী ইলম অর্জন করবে।

(ছ) তোমরা সদা তোমাদের বড় ভাই মুহাম্মদকে মান্য করবে, তাকে সম্মান করবে, পরস্পর পোষণ করবে গভীর প্রীতি, শ্রদ্ধা ও ঐকান্তিক ভালোবাসা।

(জ) তোমরা তোমাদের দাদা-দাদির সঙ্গে উত্তম আচরণ করবে, তোমাদের দুই ফুফু উম্মে ফাইজ ও উম্মে মুহাম্মদকে শ্রদ্ধা করবে। আল্লাহর পরে তাদের অনুগ্রহ আমার ওপর অনেক।

(ঝ) আমার রক্ত সম্পর্ক বজায় রাখবে। আমার পরিবারের সঙ্গে নেক আচরণ করবে এবং আমার বন্ধুবান্ধবদের হক আদায় করবে। আবার দেখা হবে বেহেশতের পুষ্পকাননে, ইনশা আল্লাহ।

–আবদুল্লাহ আয্যাম

এক নজরে শহীদ শায়খ
ড. আবদুল্লাহ আযযাম রহ.

জন্ম : ১৯৪১ সালে ফিলিস্তিনে।

শিক্ষা-দীক্ষা: গ্রামের স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন। তুলকারামের খুদুরিয়া কলেজ থেকে ডিপ্লোমা এবং দামেশক বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়াহ বিভাগ থেকে লেসান্স ডিগ্রি অর্জন। আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়াহ বিভাগ থেকে মাষ্টার্স ডিগ্রি অর্জন। ১৯৭৩ সালে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উসূলে ফিকহর উপর ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন। সিরিয়ার বিখ্যাত আলেম মোল্লা রামাযান ও বিখ্যাত মুজাহিদ শহীদ মারওয়ান হাদীসের সাহচর্য লাভ এবং তাদের তাকওয়া ও তাগুত বিরোধী জিহাদ দ্বারা প্রভাবিত হওয়া।

শিক্ষকতা: ১৯৭০-১৯৮০ সাল পর্যন্ত জর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ে শরীয়াহ বিভাগে অধ্যাপনা। ১৯৮১ সালে পবিত্র মক্কার বাদশাহ আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর অধ্যাপনা এবং সেখান থেকে পাকিস্তানের ইসলামাবাদ আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিথি প্রসেফর হিসেবে যোগদান। ১৯৮৩ সালে বাদশাহ আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরিয়ে নিতে চাইলে শিক্ষকতার পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে প্রত্যক্ষ ভাবে আফগান মুজাহিদদের পাশে দাঁড়ান।

ইসলামী আন্দোলনে সম্পৃক্ততা: স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পদার্পণের সময় থেকে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের কাজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া। মেধা ও সততায় আকৃষ্ট হয়ে জর্দান ও ফিলিস্তিন অঞ্চলের ইখওয়ানুল মুসলিমীনের মুরাকিবে আম (প্রধান জিম্মাদার) শায়খ আবু মাজেদের ওই সময় থেকে তার (শহীদ আযযাম) গ্রামে একাধিকবার গমন করা।

জিহাদে অংশগ্রহণ: ১৯৬৭ সালে ইয়াহুদীদের হাতে পশ্চিম তীর ও গাজার পতনকাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ফিলিস্তিনের জিহাদে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব দেন। ১৯৮৩ সাল থেকে ১৯৮৯ সালে শাহাদাতের পূর্ব পর্যন্ত আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ, দিকনির্দেশনা প্রদান, মুজাহিদদের সার্বিক সহযোগিতা দানের জন্য

পেশোয়ারে মাকতাবু খিদমাতিল মুজাহিদীন (মুজাহিদদের সেবা কেন্দ্র) প্রতিষ্ঠা এবং আফগান জিহাদের পক্ষে বিশ্ব মুসলমানের বিশেষত আরবদের অংশগ্রহণ, সমর্থন ও আর্থিক সহযোগিতা লাভের জন্য বিরামহীন চেষ্টা চালিয়ে আফগান ইসলামী জিহাদকে আঞ্চলিক জিহাদ থেকে আন্তর্জাতিক ইসলামী জিহাদে রূপান্তরিত করা।

মুজাহিদ তৈরি: ১৯৬৮ সালে উত্তর জর্দানে ফিলিস্তিনের জিহাদের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, শিক্ষকতাকালে উম্মাহর মর্যাদা ফিরিয়ে আনার একমাত্র পথ জিহাদের প্রতি ছাত্রদেরকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং আফগান জিহাদে অংশগ্রহণের পর থেকে শাহাদাতের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত লিখনী ও চিত্তাকর্ষক বক্তব্যের মাধ্যমে বিশ্ব মুসলমানকে বিশেষত আরবদেরকে আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করানোর জন্য তৎপরতা চালানো, তাদের অন্তরকে ইসলাম ও জিহাদের সেবার জন্য উন্মুক্ত করা ও তাদের মাঝে জিহাদ ও প্রতিরোধের অগ্নিশিখা ছড়িয়ে দেয়া। তার প্রচেষ্টায় বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্ব শহীদ তামীম আল-আদনানী (ফিলিস্তন), ড. আইমান আল-জাওয়াহেরী (মিসর), শায়খ উসামা বিন লাদেন (সৌদিআরব), শহীদ আবু হাফস আতেফ আল-মিসরী, শায়খ আবু মুহাম্মদ আল-মাকদেসী (জর্দান), শায়খ আবু কাতাদা আল-ফিলিস্তিনী, শায়খ আবদুল মুনইম মোস্তফা হালিম (সিরিয়া), শায়খ ড. আবদুল কাদির বিন আবদুল আজিজ (মিশর), শহীদ ইউসুফ আল-ইরী (সৌদিআরব), শহীদ আবদুল আজিজ আল-মুকরিন (সৌদিআরব)সহ অসংখ্য আরব আলেম, ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ও সাধারণ মুসলমানের আফগান জিহাদে বিভিন্ন ভাবে অংশগ্রহণ।

রচনাবলি: তাঁর লিখিত ও ভাষণের সংকলনসহ মোট বই সংখ্যা পঞ্চাশটি। তন্মধ্যে একটি ১৯ খণ্ড, একটি ৫ খণ্ড, দুটি ৪ খণ্ড, তিনটি ৩ খণ্ড ও একটি ২ খণ্ড।

শাহাদাত: আবদুল্লাহ আযযাম রহ. আফগান জিহাদ নিয়ে ইসলামের ভিতর-বাইরের শত্রুদের, বিশেষত আমেরিকার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের পর তাকেও পৃথিবী থেকে বিদায় করার সিদ্ধান্ত নেয় আমেরিকা-বৃটেনের নেতৃত্বাধীন ইসলাম বিরোধী আন্তর্জাতিক শক্তি। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯৮৯ সালের নভেম্বরে তিনি কলিজার টুকরা দুই সন্তানসহ পেশোয়ারের মাটিতে শাহাদত বরণ করেন। পেশোয়ারের বারী এলাকার শুহাদা কবরস্থানে তাকে শায়িত করা হয়।

কারামত: শাহাদাতের সময় বিশ কেজি ওজনের মাইন বিস্ফোরণে শহীদ আযযামকে বহনকারী গাড়িটি কয়েক টুকরা হয়ে আকাশে উড়ে গেলেও শহীদ

আযযামের পবিত্র দেহ বিস্ফোরণস্থলের কাছে সামান্য জখম অবস্থায় পাওয়া যায়। শহীদ আযযামের জিহাদের সাথী ও জীবনী লিপিবদ্ধকারী ড. আবু মুজাহিদ বলেন, 'কবরে শায়িত করার পূর্ব পর্যন্ত তার রক্ত থেকে মেশকের চেয়ে আরো উন্নত সুগন্ধি বের হয়, যার তুলনা পৃথিবীর কোন সুগন্ধির সাথে চলে না আমিসহ উপস্থিত সকল লোক এ সুগন্ধি অনুভব করেছি। অন্য দিকে তার দুই সন্তান শহীদ মুহাম্মদ ও শহীদ ইব্রাহীমের রক্ত থেকে যে সুগন্ধি বের হয়, তা ছিল হাসনাহেনার সুগন্ধির মত। সুগন্ধির এ পার্থক্যটাও শহীদ আযযামের কারামত বৈ কিছু নয়।'

মূল্যায়নঃ শহীদ আযযামের জীবন ও কর্ম নিয়ে প্রকাশিত হওয়া বই ও লেখার সংখ্যা কয়েক শতাধিক। তার জীবন বিশ্লেষকরা তাকে আফগান জিহাদের প্রাণ পুরুষ, জিহাদের মুজাদ্দিদ, যুগের শ্রেষ্ঠ জাহেদ, হিজরি পনের শতকের ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ ও এ যুগের ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ব্যক্তিত্ব বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁরা আরো বলেছেন, ১৯২৪ সালে উম্মাহর মানসিক বিপর্যয় ও শত্রুদের দীর্ঘদিনের ষড়যন্ত্রে ইসলামী খেলাফতের প্রাসাদ পূর্ণরূপে ধ্বংস হওয়ার পর তাকে পুননির্মাণ আন্দোলনের ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা যে মহান ব্যক্তির দ্বারা সবচেয়ে বেশি কাজ নিয়েছেন, তিনি হচ্ছেন শহীদ আবদুল্লাহ আযযাম রহ.। ১৯৯৬ এর সেপ্টেম্বরে আফগানিস্তানে তালেবান মুজাহিদদের হাতে যে অভূতপূর্ব ইসলামী বিপ্লব সাধিত হয়, তার জন্য যিনি সবচেয়ে বেশি উপযোগি ও মূল্যবান রক্ত (আরব বিশ্বের ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের রক্ত) সংগ্রহ করেছেন তিনি হচ্ছেন শহীদ আবদুল্লাহ আযযাম রহ. এবং ওই বিপ্লবের জন্য বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে লোকটি শাহাদত বরণ করেছেন, তিনিই হচ্ছেন শহীদ শায়খ ড. আবদুল্লাহ আযযাম রহ.।

স মা প্ত